উৎসর্গ

পিতা প্রয়াত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
মাতা প্রয়াতা বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত।

নিবেদন

অবশেষে উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যান ছাপা হল। লেখার শুরু পঁচিশ বছর আগে। বছর দশেক হল লেখাও শেষ হয়েছে। কিন্তু প্রকাশের কোন প্রয়াস ছিল না। আরম্ভে আগ্রহ ছিল ডিগ্রির। কিন্তু লেখা যখন শেষ হল সে বয়সে সে আগ্রহ প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করেছি। তাই পড়েই ছিল। রচনা কালে বন্ধুবর ডঃ দেবব্রত সেন (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনের বিভাগীয় প্রধান) ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন উৎসাহ দিয়েছেন। এখন হয়ত ভুলেই গেছেন। কিন্তু ভোলে নাই আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান সুব্রত রায়চৌধুরি (অধ্যাপক, মৃণালিনী দেবী কলেজ)। বছরের পর বছর সে খুঁচিয়েছে। তার উৎসাহে অনেক সময় বিব্রত বোধ করেছি। কর্মজীবনের উপান্তে এসে এই বই প্রকাশ কালে তার কথা স্মরণ করছি।

এই বইতে আমি ঋগ্বেদ থেকে বিষ্ণু দে পর্যন্ত প্রায় চারহাজার বছর ধরে উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যান ভারতীয় সাহিত্যে যে বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তার ধারাবাহিক কালানুক্রমিক বিকাশ অনুসরণ এবং তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। একটি উপাখ্যানের এরূপ ঐতিহাসিক বিবর্তন অনুসন্ধান অভিনবত্বের দাবী রাখে। দ্বিতীয়ত এই বইতে আমি উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যান উদ্ভবের যে নূতন প্রকল্প উপস্থিত করেছি তার সমর্থনে যে তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তি দিয়েছি আশাকরি পাঠকেরা তা স্বীকার করবেন। ডিগ্রির মোহ দূর হওয়াতে চেষ্টা করেছি সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক করে তুলতে। তাত্ত্বিক আলোচনা সাধ্য মতো পরিহার করে তাই জোর দিয়েছি আখ্যায়িকার উপর। ফলে বইটি অনেকাংশে হয়ে উঠেছে গল্প সংকলন। অবশ্য প্রথমার্ধে অপরিহার্য বলেই তত্ত্ব এবং উদ্ধৃতি কিছু রয়ে গেল।

এই বই এর প্রধান ত্রুটি বোধ হয় পুনরাবৃত্তি। একই উপাখ্যান বিভিন্ন অধ্যায়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করতে গিয়ে পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আবার অনেক স্থানে পাঠককে বোঝাবার ব্যাগ্রতায় হয়ত অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে। আর একটা বড় ত্রুটি 'দণ্ডী উপাখ্যানের' সংস্কৃত মূল উপস্থিত করা গেল না। কারণ যোগাড় করা গেল না। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে নাই। এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরিতেও নাই। পুণের ভাণ্ডারকর ও ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট জানিয়েছে সেখানেও ওরকম কোন সংস্কৃত পুথি নাই। আমি যে সব ছাপা বই দেখেছি ও আলোচনা করেছি তার মধ্যে একমাত্র কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন তাঁর অনুবাদের ভূমিকায়

সংস্কৃত মূলের নির্দেশ করেছেন। লিখেছেন—'এই দণ্ডী পর্বের পুথি এদেশে অতি বিরল।' কয়েক বৎসর হইল আমার সহাধ্যায়ী কর্ণাট নিবাসী তারাচরণ বেদরত্ন মহাশয় একখানি অতি জীর্ণ গলিত প্রায় ভ্রম পূর্ণ পুথি সংগ্রহ করিয়া দেন। অতি কষ্টে ঐ একমাত্র পুথি অবলম্বনে যথামতি পাঠ সামঞ্জস্য করিয়া সাধ্যমতে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিলাম।' এই গ্রন্থটিই আমি আদর্শ বলে ধরেছি। আচার্য সুকুমার সেন অবশ্য তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের পাদটীকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় ও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারের দণ্ডী উপাখ্যানের কয়েকটি পুথির উল্লেখ করেছেন। তিনি সেগুলোর যে লিপিকাল উল্লেখ করেছেন তা সবই ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের। আমি যে সব ছাপা বই আলোচনা করেছি তা দ্বিতীয়ার্ধের। তাই সে সব পুথি আর টানাটানি করিনি।

এই গ্রন্থে ঋগ্বেদানুবাদের চিহ্নিত উদ্ধৃতি সবই রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী কৃত।

গ্রন্থ প্রকাশের সহায়তার জন্য বেদবিদ্যাবিদ অধ্যাপক নৃপেন্দ্র গোস্বামীর নিকট চিরঋণী। বেদবিদ্যার দুর্গম অরণ্যে প্রবেশের সাহসও তিনিই দিয়েছেন। বেদবিদ্যা আর আধুনিক নৃতত্ত্বে তাঁর মত যুগপৎ অধিকার খুব কমই দেখেছি। তিনি আগাগোড়া রচনা পড়েছেন এবং সংশোধনও পরিমার্জনের পরামর্শ দিয়ে রচনার উৎকর্ষ বিধান করেছেন। তাঁর সঙ্গে আবাল্য সম্পর্কের স্নেহঋণ অপরিশোধ্য।

নিউ এজ প্রকাশনীর শ্রদ্ধেয় জানকি নাথ সিংহ রায় মহাশয়ের আনুকূল্য ব্যতীত এ বই ছাপা হত না। বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে জ্ঞানানুশীলনের ধারাকে তিনি দীর্ঘকাল ধরেই পরিপুষ্ট করে এসেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিনীত—

যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হাতিয়ারা

২ জুন, ১৯৫৯

সূচীপত্র

বিষয়

বিষয়			পৃষ্ঠা

ভূমিকা

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ৯৫ নং সূক্তটি উর্বশী-পুরুরবা সংবাদ সূক্ত নামে সুপরিচিত। এটি সংলাপাত্মক—একটি আধুনিক নাট্যকাব্যের অনুরূপ। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এটিকে প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য বলে চিহ্নিত করা যায। একজন রাজা আর একজন অপ্সরী। একজন মর্ত্যমানব আর একজন দিব্যলোক দুহিতা—এই দুয়ের ভগ্ন প্রেমের আখ্যান। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় ঘনায়মান আঁধারে তৃষাতপ্ত প্রেমবেদনার আর্তির রাগরশ্মি বিচ্ছুরণে সূক্তটি চিরকালের এক শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা।

এই উপাখ্যানের আদি রূপের আভাস তথা উর্বশী ও পুরুরবা নাম দুটির প্রথম উল্লেখ রয়েছে যজুর্বেদের অগ্নিমন্থন মন্ত্রে। যদিও কালের বিচারে যজুর্বেদ ঋগ্বেদের পরে সংকলিত তথাপি এতে যে সব আদিম কৃত্যের বর্ণনা আছে তা প্রাচীনতর বলেই মনে হয়। ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তে বিধৃত কাহিনীর পূর্ণাঙ্গরূপ রয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে। অতঃপর বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রে যজুর্বেদোক্ত অরণিদ্বয়ের উর্বশীও পুরুরবা এরূপ নামকরণের ব্যাখ্যা রূপে উপাখ্যানের পুনর্নির্মাণ। কাত্যায়ন শ্রৌত-সূত্র, সর্বানুক্রমণী, বৃহদ্দেবতা ইত্যাদি বেদাস্ত্য সাহিত্যে দেখা যাবে কাহিনীটির পৌরাণিক রূপায়নের সূচনা। শুধু বৈদিক সাহিত্যেই নয় এই কাহিনীর অনুবৃত্তি রয়েছে রামায়ণে, মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণু, ভাগবত, বায়ু, মৎস্য, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণেও। পুরাণোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকটি এই কাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যরূপ। কাহিনী আছে গুণাঢ্যের বৃহৎকথায়, সোমদেবের কথাসরিৎ সাগরে। উল্লেখ আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতেও। মধ্যযুগের সাহিত্যে অবশ্য এই উপাখ্যানের বিশেষ প্রাদুর্ভাব নাই।

আধুনিক বাংলা কাব্যে অবশ্য সূচনা কাল থেকেই এই আখ্যায়িকা কেবল উপমান হিসেবে নয় পূর্ণাঙ্গ কাব্য রূপেও প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। মধুসূদনের কাব্যে তার সূচনা। রবীন্দ্রকাব্যে চিত্রার 'উর্বশী' একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। বস্তুত ঋগ্বেদ থেকে বিষ্ণু দে পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে এই উপাখ্যান ভারতীয় কবি মনকে যুগে যুগে অনুপ্রেরিত করে এসেছে। মনে হয় এর বিকাশের মধ্যে আদিম যুগ থেকে বিশ্বমানবের কাব্যভাবনার ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। স্বভাবত তাই এই উপাখ্যানের উদ্ভব, বিকাশ ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের কৌতূহল জাগে। দুই দশক ধরে ভারতীয় সাহিত্যে এই উপাখ্যানের অনুসন্ধান ও তার রহস্য

অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। এই অনুসন্ধানে সভ্যতার ইতিহাসে সাহিত্য বিকাশের ধারাও স্পষ্টতর হয়েছে বলে মনে করি।

এই ধারা তিনটি সূত্রে উপস্থিত করা যায় :—

১) আদিযুগে অস্তিত্বের প্রয়োজনে মানুষ অবলম্বন করেছে কিছু ক্রিয়া বা কৃত্য ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Ritual।

২) তারপর সেই ক্রিয়া বা আচার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছে কাহিনী যাকে বলা যায় 'মীথ' বা অতিকথা যার সঙ্গে এসে মিশেছে প্রাণবাদী (animism) ভাবনা প্রসূত প্রাকৃত দেববাদ। এই 'মীথোলজি' (mythology) বা অতিকথাই সাহিত্যের আদিরূপ।

৩) অবশেষে সাহিত্যযুগে এসে সে সব কাহিনীর উদ্ভবের প্রয়োজন ও তাৎপর্য বিস্মৃত হয়ে মানবিক কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্রমে সে সব কাহিনী বা রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছে দৃশ্যমান জগতের অন্তরালবর্তী অজ্ঞেয় অনন্তের রহস্য উদ্ঘাটনে।

এই গ্রন্থটি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে উপাখ্যানের উদ্ভব রহস্যের নৃতাত্ত্বিক ও মীথোলজিকাল বা অতিকথা-মূলক ভাষ্য। দ্বিতীয়ার্ধে এই উপাখ্যান ও এর পাত্রপাত্রীর মধ্য দিয়ে নরনারীর প্রেমের রহস্য এবং নারী রূপ ও স্বরূপের অনুসন্ধান।

আলোচনায় আমি কোন বিশেষ মতবাদ বা পূর্বকৃত সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হই নাই, কোন গোঁড়ামিরও প্রশ্রয় দেই নাই। যতদূর সম্ভব সব তথ্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। সকলের ও সব অভিমতই শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করেছি এবং পরবর্তীকালে উদ্ঘাটিত তথ্য ও তত্ত্বের সাথে সমীকরণ করে তা গ্রহণ বা বর্জন করেছি। যেখানে কোন নতুন সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেছি তাও উপযুক্ত সাক্ষ্য ও সমর্থনের উপর নির্ভর করে করেছি। এই সংকোচ হয়তো রচনাকে কথঞ্চিৎ আড়ষ্ট করে থাকবে। সংকোচের কারণ স্বল্প-বিদ্যা পাছে ভয়ঙ্করী না হয়ে ওঠে। বিশেষ বেদ যেখানে বিষয়।

প্রথমার্ধে প্রধানত বৈদিক সাহিত্য অবলম্বনে উপাখ্যানের উদ্ভব রহস্যের ব্যাখ্যা। বৈদিক সাহিত্যের সীমা আমি সূত্র সাহিত্য পর্যন্ত ধরেছি—যা প্রায় ১২/১৩ শ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম অধ্যায়ে আমি এই বৈদিক সাহিত্যের যেখানে যেখানে কাহিনীটি পাওয়া যায় তা বাংলায় লিপিবদ্ধ করেছি কেবল গল্পরস পরিতৃপ্তির জন্য নয় পাঠকেরা যাতে মূল বিষয় বস্তুর স্পষ্ট ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন। তাছাড়া এই অধ্যায়েই আমি ঋগ্বেদের উর্বশী-পুরূরবা সূক্তটির, আচার্য ম্যাক্সমূলর; স্যার জেমস ফ্রেজার; এ, বি, কীথ; দামোদর ধর্মেন্দ্র কোশাম্বী; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের নলিনী গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের ভাষ্য উদ্ধার করেছি। এই ব্যাখ্যাগুলি ত্রিবিধ (১) নৃতাত্ত্বিক (২) মীথোলজিকাল বা অতিকথা মূলক ও (৩) আধ্যাত্মিক।

অনধিকারী বলে শেষোক্ত ভাষ্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বিরত থেকেছি। প্রায় দুই দশক ধরে এই একটি উপাখ্যানেরই নানারূপ ও নানা উল্লেখ সংগ্রহ করেছি যার কালানুক্রমিক বিন্যাস লক্ষ্য করলে সব পাঠকের কাছেই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছি। এখানে প্রধানত বৈদিক সাহিত্যই আলোচিত। এই আলোচনায় উর্বশী ও পুরূরবা নাম দুটির উদ্ভব রহস্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে আমার প্রধান অবলম্বন স্যার জেমস' ফ্রেজার বিরচিত মহাগ্রন্থ 'Golden Bough' বা স্বর্ণশাখা। বলতে গেলে এই অধ্যায়েই আমার thesis বা মূল বক্তব্য উপস্থাপিত। কিন্তু এ উপাখ্যান কেবল আদিম মানুষের অস্তিত্ববাদী সমস্যা বা আচার প্রসূত নয়। বস্তুত কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে উঠেছে মানব সংস্কৃতির দ্বিতীয় স্তরের বিকাশে 'মীথোলজি' বা অতিকথার প্রভাবে। E. B. Tylor কথিত প্রাণবাদ বা animism থেকে জাত প্রাকৃত দেববাদও ছিল এই অতিকথার মূলে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমি তাই অতিকথা মূলক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি। এখানে প্রধানত ম্যাক্সমূলরের ভাষ্যের সমর্থনে দেশ বিদেশের সদৃশ অতিকথার উদ্ধার করেছি।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের সাধারণ নাম দেওয়া যেতে পারে—সাহিত্য বিচার। চতুর্থ অধ্যায় অবশ্য মধ্যবর্তী। ডান হাতে বৈদিক সাহিত্য এবং বাঁ হাতে সংস্কৃত সাহিত্য দুই হাতে ধরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পৌরাণিক সাহিত্য। রামায়ণ মহাভারত সঠিক অর্থে পুরাণ না হলেও পুরাণগুলির সঙ্গে এই অধ্যায়েই আলোচনা করেছি। পুরাণগুলি আলাদা আলাদা আলোচনা না করে সদৃশ কাহিনী যুক্ত পুরাণগুলি এক সঙ্গেই আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় ভাগের প্রধান লক্ষ্য নারীরূপ ও স্বরূপের অনুসন্ধান এবং নরনারী প্রেমের রহস্য উদ্‌ঘাটন তথা সাহিত্যোৎকর্ষ বিচার। এই পর্যায়ে বৈদিক উপাখ্যানের অপহ্নব আর কালিদাসীয় আখ্যায়িকার প্রাধান্য। অবশ্য ক্রমশ আখ্যায়িকা পিছনে ফেলে উর্বশী অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। উর্বশীর প্রতিমা ও প্রতীকের মধ্য দিয়েই আধুনিক কবিরা নারী সৌন্দর্য তথা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের স্বরূপ পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন—প্রেমের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত উল্লেখ সমূহ আলোচিত—বিশেষত রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতার ব্যাখ্যা যার বিস্তৃতি মন্মথ রায়ের 'উর্বশী নিরুদ্দেশ' একাঙ্কিকায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমি অন্যভাষা অর্থাৎ ইংরেজি ও হিন্দীতে রচিত দুটি রচনার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। ইংরেজিতে লেখা চমৎকার রোমান্টিক কাব্যে শ্রীঅরবিন্দ উর্বশীকে সৃষ্টির মূল সৃজনীশক্তি বা প্রেরণা শক্তি রূপে উপস্থিত করেছেন যা ধ্যানলব্ধ ব্রহ্মানন্দের সমতুল্য। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত হিন্দী কবি রামধারী সিংহ দিনকর তাঁর 'উর্বশী'

নাট্যকাব্যে নারী জীবনের জায়া ও জননীর মূল দ্বন্দ্বের বেদনা ফুটিয়ে তুলেছেন। ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও উর্বশী নিয়ে কাব্য আছে কিন্তু সে সব ভাষাতে আমার প্রবেশ নাই বলে সেদিকে হাত বাড়ালাম না বিশেষত আমার এই গ্রন্থেই বোধ হয় উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানের উদ্ভব ও বিকাশের পূর্ণবৃত্ত অঙ্কিত হয়েছে। আরো বাড়াতে গেলে তা তথ্যের বোঝা এবং পুনরাবৃত্তি হবে বলে শঙ্কা ছিল। বৈদিক সাহিত্যে আমার পথ প্রদর্শক সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র গোস্বামী আমার বক্তব্যের (thesis) সঙ্গে এক মত হন নাই। তিনি উর্বশী-পুরূরবাকে রাজবৃত্ত বলে মনে করেন এবং তার বিরাট ঈর্ষনীয় বেদবিদ্যা মন্থন করে প্রচুর তথ্য ও যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে তাঁর অভিমত উদ্ধার করা হল।

প্রথম অধ্যায়

বৈদিক আখ্যান পরিচয়

আলোচনায় প্রবেশের আগে বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত কাহিনী সমূহের পরিচয় বাংলায় লিপিবদ্ধ করা যাক্। উপস্থাপিত অনুবাদগুলি প্রধানত সায়ন ভাষ্য ও তদনুসারী রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে কৃত। ঝোঁকটা আক্ষরিক অনুবাদের দিকে হলেও যথার্থ আক্ষরিক অনুবাদ বোধহয় কোনটাই নয়। তার কারণ এমন কি ব্রাহ্মণ যুগেও ঋগ্বেদের শব্দগুলির যথার্থ অর্থের বিস্মরণ ঘটেছে। সুতরাং অনেক স্থানেই সঙ্গতির মুখ চেয়ে অনুবাদ করা হয়েছে।

প্রথমেই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ নং সূক্ত।

পুরূরবা[১]—হে নিষ্ঠুরা জায়া দাঁড়াও। আমাদের এখন কথাবার্তা বলা উচিত। দুজনের গোপন কথা এখন বলাবলি না করা হলে পরে তা সুখের হবে না॥ ১

উর্বশী—তোমার সঙ্গে কথা বলে কি হবে? আমি পূর্ববর্তী উষাদের মতো চলে এসেছি। পুরূরবা ঘরে ফিরে যাও, বাতাসের মতো দুষ্প্রাপ্যা আমি॥ ২

পুরূরবা—তূনীর থেকে বাণ নির্গত হয় নাই (শত্রুর কাছ থেকে) শতশত গো জিত হয় নাই। বীরতা শূন্য রাজকার্য। কোন শোভা নাই তার। সৈন্যেরা ভুলেছে সিংহনাদ॥ ৩

—সেই উষা যদি শ্বশুরকে অন্ন বস্ত্র দিতে চাইবে তবে অন্তঃপুরে

১। ঋগ্বেদে এই রূপ নামোল্লেখ নাই। সায়ন তাঁর টীকায় বক্তার নাম নির্দেশ করেছেন।

৪র্থ ঋকটি সায়ন বলেছেন উর্বশীর উক্তি, রমেশচন্দ্র দত্তের মতে পুরূরবার। রমেশচন্দ্রের অভিমতই সঠিক মনে হয়।

পাশের ঘরে যেত, দিনরাত যাকে কামনা করেন (তার সঙ্গে) রমণ ইচ্ছা করে ॥ ৪

উর্বশী—হে পুরূরবা তুমি দিনে তিনবার আমাকে রমণ করতে। সপত্নীদের পর্যায়ক্রমে আসার (পালা) থেকে আমাকে নিবৃত্ত করেছ। পুরূরবা তোমার ঘরে এসেছি। তুমি আমার রাজা ছিলে, বীর ছিলে, আমার শরীরেরও ॥ ৫

পুরূরবা—সুজূর্ণি, শ্রেণী, সুম্নআপি, হ্রদে চক্ষু, গ্রন্থিনীও চরেণ্যু (প্রভৃতি স্ত্রীরা বা অপ্সরারা) অরুণ বর্ণে আভূষিত হয়ে আগের মতো—গাভীরা যেমন আশ্রয়ের দিকে শব্দ করতে করতে যায় তেমন ভাবে—আর আসে না ॥ ৬

উর্বশী—ইনি জাত হলে দেবীরা তাঁকে সম্বর্ধনা করতে এসেছিল, স্বয়ং-গামিনী নদীরাও এসেছিল। হে পুরূরবা তোমাকে দেবতারা দস্যু হত্যার জন্য, যুদ্ধে পাঠাবার জন্য সম্বর্ধনা করেছিলেন ॥ ৭

পুরূরবা—সে (পুরূরবা) যখন মানুষ হয়েও অমানুষীদের (অপ্সরাদের) অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল তখন তারা ত্রস্তা মৃগীর মতো অথবা রথে নিযুক্ত ঘোড়ার মতো দ্রুত পালিয়েছিল ॥ ৮

উর্বশী—যখন সে (পুরূরবা) মর্ত্যজন হয়েও অমৃত লোকবাসিনীদের (অপ্সরাদের) স্পর্শ করতে এগিয়েছিল। তারা শরীর দেখাল-না, ক্রীড়াশীল ঘোড়াদের মতো পালিয়েছিল ॥ ৯

পুরূরবা—উর্বশী আকাশ থেকে পতনশীল বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল হয়েছিল, আমার কামনা সমূহ পূরণ করেছিল। তার গর্ভে মানুষের ঔরসে সুপুত্র জন্মাবে। উর্বশী তাকে দীর্ঘায়ু করুন ॥ ১০

উর্বশী—এই ভাবে পৃথিবী পালনের জন্য সেই পুরূরবা আমাতে বীর্যপাত করেছিল। আমি তোমাকে প্রতিদিন জানিয়েছি কী হলে আমি থাকব না, তুমি শুনলে না, (প্রতিজ্ঞা) পালন না করে কেন বৃথা বলছ ॥ ১১

পুরূরবা—কবে (তোমার) পুত্র পিতাকে ভালোবাসবে। (আমার) কাছে থাকলে সে কি কাঁদবে না ? কে বা সমমনা দম্পতীকে বিচ্ছিন্ন করে ? এখন যে তোমার শ্বশুরের ঘরে আগুন জ্বলছে ॥ ১২

উর্বশী—উত্তর বলছি, তোমার কাছে থাকলে সে অশ্রুপাত করবে না। আমি তার কল্যাণ কামনা করব। আমার গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করেছ তাকে তোমার কাছে পাঠাব। হে নির্বোধ ঘরে ফিরে যাও। আমাকে পাবে না॥ ১৩

পুরূরবা—তোমার প্রণয়ী আজ পতিত হোক, যেন আর না ওঠে। সে যেন বহুদূরে চলে যায়, নিঋতির কোলে শায়ীত হয়। তীক্ষ্ণদন্ত নেকড়েরা তাকে খেয়ে ফেলুক॥ ১৪

উর্বশী—পুরূরবা এরকম মৃত্যু কামনা কর না, পতিত হয়ো না। ভয়ঙ্কর নেকড়েরা যেন তোমাকে খেয়ে না ফেলে। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না, তাদের হৃদয় নেকড়ে বাঘের মতো॥ ১৫

—আমি বিভিন্ন রূপে ঘুরেছি। মর্তে চার বছর রাত্রি বাস করেছি। দিনে একবার মাত্র অল্প ঘি খেয়ে তৃপ্ত হয়ে বিচরণ করেছি॥ ১৬

পুরূরবা—আমি বসিষ্ঠ, অন্তরীক্ষ পূর্ণকারিণী, আকাশ প্রিয়া উর্বশীকে আলিঙ্গন করেছি। তোমার সুকৃতির ফল তোমাতেই থাক। হে উর্বশী ফিরে এসো, আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে॥ ১৭

উর্বশী—হে ঐড় (পুরূববা) তোমাকে এই সব দেবতারা বলছেন যে তুমি মৃত্যুঞ্জয় হবে। প্রজ্জ্বলিত আগুনে হবিদ্বারা যজ্ঞ করে তুমিও স্বর্গে গিয়ে আনন্দ করবে॥ ১৮

যজুর্বেদের বিভিন্ন সংকলনে কোথাও উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যান নাই। তবে যজ্ঞাগ্নি মন্থনের জন্য ব্যবহৃত অরণিদ্বয়কে এই দুই নামে অভিহিত কবা হয়েছে। এই কৃত্যের সঙ্গে জড়িত বলে যজুর্বেদের এই উল্লেখই বোধ হয় প্রাচীনতম। নিচের অরণি বা অধরারণির নাম উর্বশী আর উত্তরারণির নাম পুরূরবা এবং তাদের পুত্র অরণিদ্বয়ের মন্থনে জাত অগ্নির নাম আয়ু। অগ্নি মন্থনকে তুলনা করা হয়েছে মৈথুনের সঙ্গে।

শুক্লযজুর্বেদের মন্ত্রটি এই রকম—

অগ্নির জন্মস্থান হও। মুষ্কদ্বয় হও। উর্বশীর আয়ু হও—'পুরূরবা হও।

গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা তোমাকে মন্থন করি, ত্রিষ্টুভ ছন্দের দ্বারা তোমাকে মন্থন করি, জগতী ছন্দের দ্বারা তোমাকে মন্থন করি।'[২]

যজুর্বেদের কাঠক সংহিতায় ঈষৎ পৃথকরূপে মন্ত্রটি দেখা যায়।—প্রজা প্রজননের জন্য আয়ুর প্রজননের জন্য উর্বশী হও, পুরূরবা হও ইত্যাদি। আয়ুর গর্ভধারিণী বা মাতা উর্বশী, পিতা পুরূরবা, ঘি হচ্ছে রেতঃ। ঘিতে অরণি লিপ্ত হয়, যেমন মিথুনে রেতঃ সিঞ্চিত হয়। গায়ত্রী মন্ত্রকে প্রজননের জন্য, ত্রিষ্টুভ, জগতী ইত্যাদি মন্ত্রগুলির দ্বারাও প্রজননের জন্য, রেতের হিতের জন্য।[৩]

শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে ঋগ্বেদীয় আখ্যানের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী আছে।[৪] সেই কাহিনীর মোটামুটি বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল—

উর্বশী ছিলেন অপ্সরা। ঐল পুরূরবাকে ভালোবেসে তাকে বরণ করার সময় বলেছিলেন—'দিনে তিনবার তুমি আমাকে রমণ করতে পারবে, কিন্তু কাম রহিত আমাতে উপগত হবেনা এবং তোমাকে যেন নগ্ন না দেখি। এই হচ্ছে মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহারের রীতি।' তিনি তাঁর সঙ্গে অনেকদিন বসবাস করেছিলেন তাঁর দ্বারা গর্ভিনীও হয়েছিলেন। তখন গন্ধর্বেরা পরামর্শ করেছিল—এই উর্বশী অনেকদিন যাবৎ মানুষের মধ্যে বাস করেছে, কি করে আবার তাকে ফিরিয়ে আনা যায় তার উপায় ঠিক করা যাক।

উর্বশীর খাটের কাছে বাঁধা থাকত তাঁর দুটি প্রিয় মেষ। গন্ধর্বেরা তার একটি মেষ চুরি করে নিয়েছিল। উর্বশী কেঁদে উঠেছিলেন—

—আমি বীর শূন্য জনহীন বাস করছি। আমার পুত্র হরণ করে নিয়ে গেল।

তারা দ্বিতীয়টিকেও হরণ করে নিয়ে গেলে তিনি আবার অনুরূপ আর্তনাদ করেছিলেন।

পুরূরবা তখন মনে মনে ভাবলেন—যতক্ষণ আমি এখানে আছি

২। শু, য ৫।২

৩। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কাঠক সংহিতা ২৬।৭।২০
তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও অনুরূপ মন্ত্র দেখা যায়

৪। শত ১১,৫।৩

ততক্ষণ এ স্থান কি করে বীরহীন জনহীন হবে।—এইভেবে তিনি নগ্ন অবস্থাতেই তাদের পিছনে লাফিয়ে পড়লেন, কারণ কাপড় পরতে গেলে দেরি হবে। তখন গন্ধর্বেরা বিদ্যুৎ চমকাল। দিনের মতো সেই আলোয় উর্বশী তাঁকে নগ্ন দেখতে পেলেন তাই তিনি অন্তর্ধান করলেন। পুরূরবা এসে বললেন—'আমি ফিরে এসেছি'; কিন্তু ততক্ষণে তিনি তিরোভূতা হয়েছেন। কেঁদে কেঁদে সারা কুরুক্ষেত্র খুঁজে বেড়ালেন পুরূরবা। সেখানে ছিল এক পদ্ম সরোবর নাম তার অন্যতঃপ্লক্ষ। তার পাড়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সেখানে অপ্সরারা হাঁস হয়ে চরছিল।[৫] তাঁকে চিনতে পেরে উর্বশী সখীদের বললেন—

—'এই সেই মানুষ যাঁর সঙ্গে আমি বাস করেছিলাম।' তারা বলল—"এস আমরা তাঁর সামনে উপস্থিত হই।"

—'তাই হোক'—উর্বশী উত্তর দিলেন। তখন তারা তাঁর সামনে আবির্ভূতা হল। তাঁকে (উর্বশীকে) চিনতে পেরে পুরূরবা তাঁর কাছে কাতর অনুনয় করলেন।

—হে নিষ্ঠুরমনা জায়া দাঁড়াও, পরস্পর কথা বলা যাক। সে গোপন কথা এখন বলা না হলে পরে তা সুখের হবে না।[৬]

দাঁড়াও দুজনে কথা বলি একথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। উর্বশী তাঁকে এই উত্তর দিয়েছিলেন—তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার কী হবে? আমি প্রথম উষার মতো চলে এসেছি। পুরূরবা ঘরে ফিরে যাও, অথবা বায়ুর মতো আমি অপ্রাপ্যা।[৭]

আমি তোমাকে যা বলেছিলাম তুমি তা কর নাই, তোমার পক্ষে আমাকে ধরা দুঃসাধ্য ঘরে ফিরে যাও ইত্যাদি কথা তিনি বলেছিলেন। তখন পুরূরবা দুঃখিত মনে বললেন,—তোমার প্রণয়ী আজ পতিত হোক, দূরে চলে যাক, আর যেন না ফেরে, সে যেন নির্ঋতির কোলে শয়ন করে, ভয়ঙ্কর বৃকেরা যেন তাকে খেয়ে ফেলে॥[৮]

৫। আতযোভূত্বা পরিপুপ্লুবিরে। শত ১১।৫।৩।৪, অতি জলচর পক্ষিবিশেষ—সায়ন

৬। ঋ ১০।৯৫।১ শত পথে পাঁচটি ঋক উদ্ধৃত

৭। ঋ ১০।৯৫।৩; শত ১১।৫।৩।৭

৮। ঋ ১০।৯৫।১৪; শত ১১।৫।৩।৮

তোমার প্রণয়ী হয়ে হয় আজ উদ্বন্ধনে মরব না হয় পড়ে মরব, অথবা বাঘ বা নেকড়ে খেয়ে ফেলবে। এই কথা তিনি বললে অপরা (উর্বশী) উত্তর দিলেন—'পুরূরবা এইরূপ মৃত্যু কামনা করো না, ভেঙে পড়ো না, নেকড়েরা যেন তোমাকে না খায়। স্ত্রীলোকের সখ্য থাকে না, ঘরে ফিরে যাও।[৯]

—আমি পরিবর্তিত রূপে ভ্রমণ করেছি, চার বছর মর্তে বাস করেছি। দিনে একবার মাত্র ঘি খেয়ে ক্ষুধা তৃপ্ত করে ঘুরেছি।[১০]

এই রকম উত্তর প্রত্যুত্তরে পনেরটি ঋক বলে তাঁর জন্য হৃদর ব্যথা প্রকাশ করেছিলেন।

উর্বশী তখন বললেন—বছর শেষে শেষ রাতে এসো তখন এক রাত আমার সঙ্গে শোবে। তোমার এক পুত্র জন্মাবে।

তিনি বর্ষশেষের শেষরাতে এলেন এবং সেখানে এক সোনার প্রাসাদ দেখতে পেলেন। তখন তাদের একজন (গন্ধর্ব) বললেন। 'প্রবেশ কর' এবং তারা উর্বশীকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। উর্বশী পুরূরবাকে বললেন—সকালবেলা গন্ধর্বরা তোমাকে বর দিতে চাইলে, তোমাকে তা বেছে নিতে হবে।

—তুমিই আমার জন্য বেছে দাও।

—বলবে আমাকে তোমাদের একজন কর—উর্বশী বললেন। সকালবেলা গন্ধর্বরা তাঁকে বর দিতে চাইলেন। পুরূরবা বললেন—আমাকে আপনাদের একজন করুন।

তাঁরা উত্তর দিলেন—মানুষের মধ্যে সেই পবিত্র অগ্নি নাই যা দিয়ে যজ্ঞ করে আমাদের একজন হতে পারবে।' তাঁরা একটি থালায় আগুন রেখে পুরূরবাকে দিয়ে বললেন এর দ্বারা যজ্ঞ করে আমাদের একজন হবে।

তিনি আগুনের থালা এবং ছেলেকে নিয়ে রওনা হলেন। পথে বনে আগুনের থালা রেখে ছেলেকে নিয়ে গ্রামে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন সেগুলো নেই। যে আগুন ছিল তা হয়েছে অশ্বত্থ আর যে থালা ছিল

৯। ঋ ১০।৯৫।১৫ ; শত ১১।৫।৩।৯
১০। ঋ ১০।৯৫।১৬ ; শত ১১।৫।৩।১০

সেখানে হয়েছে এক শমী গাছ। তখন তিনি আবার গন্ধর্বদের কাছে গেলেন। তাঁরা বললেন—'এক বছর ধরে চার জনের উপযুক্ত অন্ন পাক কর। এর জন্য প্রতিবারে অশ্বত্থ গাছ থেকে তিনটি করে সমিধ নিয়ে ঘি মাখিয়ে ঋক সহযোগে আহুতি দাও তাতে যে আগুন জ্বলবে তাই হবে সেই আগুন।' তাঁরা আরো বললেন—এ গুহ্য বলে পারবেনা, কাজেই এই অশ্বত্থ কাঠ থেকে উত্তরারণি কর আর শমী কাঠ থেকে কর অধরারণি। তার থেকে যে আগুন উৎপন্ন হবে তাই সেই। কিন্তু তাও যেহেতু গূহ্য অতএব সেই অশ্বত্থ থেকেই একটি উত্তরারণি কর এবং সেই অশ্বত্থ থেকেই অধরারণি কর। তার থেকে যে আগুন জ্বলবে তাই হবে সেই আগুন।' তিনি অশ্বত্থ থেকেই উত্তরারণি করেছিলেন, অশ্বত্থ থেকেই অধরারণিও করেছিলেন। তা থেকে যে আগুন জ্বলেছিল তাই ছিল সেই আগুন। তাতে যজ্ঞ করে তিনি গন্ধর্বদের একজন হয়েছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণকার এই উপদেশ দিয়েছেন।

এরপর বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রে[১১] বিধৃত কাহিনী বিবৃত করা যাক্।

পুরূরবা নামে এক মহান রাজা ছিলেন। তাঁকে উর্বশী অপ্সরা ভালো বেসেছিলেন। তাঁকে কামনা করে উর্বশী এক বছর ধরে অনুসরণ করেছিলেন। তা অতি দীর্ঘ মনে হয়েছিল। রথে করে যাবার সময় রাজা কাউকে রথের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁকে দেখে রাজা থামলেন। কিন্তু কাউকে আর দেখতে পেলেন না। পুনরায় চলা আরম্ভ করলেন, কাউকে দাঁড়ান দেখতে পেয়ে সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সারথি কী দেখছ?'

—ভগবান আপনাকে, রথ, অশ্ব আর পথ—সে মনে মনে ভাবল সত্যই কি কিছু দেখছি? পরে রাজাকে কথায় বলল—আপনাকে ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।

১১। বৌধায়ন শ্রৌত সূত্র ১৮।৪৪,৪৫ Dr. W. Caland সম্পাদিত Vol. I Asiatic Society 1904
এর কোন অনুবাদ দেখিনি সুতরাং ত্রুটি থাকতে পারে

—আপনি কে ? রাজা জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর হল

—আমি উর্বশী, অপ্সরা ; যে আপনাকে একবছর ধরে অনুসরণ করছে।

—তাঁকে আমার জায়া করা হোক

—দেবতারা তুরূপচার হন'

—আপনার উপচর্যা কী ?

—আমার জন্য একশত উপসদ[১২] প্রয়োজন। আমার জন্য শতশত কলসী ঘৃত দরকার। আমি বারে বারে প্রতিদিন এসে তা থেকে আহার করব। আপনাকে যেন নগ্ন না দেখতে হয়।

—হে ভগবতী এ সবই সহজ হবে কিন্তু আপনি স্ত্রী হয়ে স্বামীকে নগ্ন দেখবেন না তা কি করে হবে ?

—অন্তর্বাস পরে অনগ্ন হবেন।

রাজা উর্বশীর সঙ্গে অন্তর্বাস পরে সহবাস করেছিলেন। উর্বশী জন্মানো মাত্রই পুত্রদের হত্যা করতেন। তাঁকে রাজা বললেন,—হে ভগবতী আমরা মানুষেরা পুত্রকামী আর আপনি জন্মানো মাত্রই পুত্রদের হত্যা করছেন।

—রাত্রি শেষে জাত এরা ক্ষীণায়ু হবে, আমি আপনার বহু প্রিয় কাজ করব।—উর্বশী উত্তর দিলেন।

উর্বশী আয়ু ও অমাবসুর জন্ম দিলেন। বললেন—

—এরা তুজনে দীর্ঘায়ু হবে।

আয়ু গিয়েছিল পূর্বদিকে। তাই কুরু, পাঞ্চাল, কাশী বিদেহ—এই সব রাজ্য আয়ুর হয়েছিল। অমাবসু গিয়েছিল পশ্চিমে—তাই গান্ধার, স্পর্শু, অরাট্ট এই সব অমাবসুর হয়েছিল।

তাঁর (উর্বশীর) পূর্বচিত্তি নামে এক অপ্সরা বোন ছিল। সে ভেবে দেখল যে আমার বোন (উর্বশী) বহুদিন মানুষের মধ্যে বসবাস করেছে। এ তাদের ইচ্ছা নয় কেননা তাদের সঙ্গে তাঁর মিলন হচ্ছে না। (তাই ঠিক করল) অতএব তাঁকে বিচ্ছিন্ন করব। প্রথমে সে মহিষীর

১২। উপসদ—যজ্ঞ বিশেষ। সুত্যাযাগ বা সোমাভিষবের পূর্বে কৃত এক প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান। জ্যোতিষ্টোমের অংশ বিশেষ।

রূপ ধারণ করল তারপর হল নেকড়ে এবং উর্বশীর খাটের সঙ্গে বাঁধা দুগ্ধপায়ী মেষদ্বয়কে ভয় দেখিয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়েছিল। তাদের ছুটাছুটি করতে এবং হরণ করে নিয়ে যেতে দেখে ইনি বীরপুত্র নন বলে উর্বশী কেঁদে উঠেছিলেন। তাই শুনে তাদের রক্ষা করতে রাজা সেদিকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। তখন পূর্বচিত্তি নকুলী হয়ে রাজার অন্তর্বাস হরণ করেছিল, তারপর সে বিদ্যুৎ চমকাল।

—এখনি মেষ জয় করে এনে দিচ্ছি—বলে রাজা গিয়েছিলেন। সেই বিদ্যুতের আলোকে উর্বশী রাজাকে নগ্ন দেখতে পেলেন।—কী হল?—আপনাকে নগ্ন দেখতে পেলাম—বলে উর্বশী অন্তর্হিতা হয়েছিলেন। উর্বশীর অন্তর্ধানে অপ্রিয়বিদ্ধ রাজা শোক করেছিলেন। বৃহস্পতি আঙ্গিরস তাঁকে বললেন—শদ[১৩] যজ্ঞের দ্বারা তাকে জয় করে আপনাকে পাইয়ে দেব। বৃহস্পতি আঙ্গিরস শদ যজ্ঞ করিয়েছিলেন। অবভৃত[১৪] স্নানের পর দেবযজনে[১৫] ফেরার সময় পরস্পরের দেখা হয়েছিল।

উর্বশী বলেছিলেন—পুত্রদ্বয়ের জন্মের জন্য আমি তাঁর সঙ্গে তিন রাত বাস করব। ব্রাহ্মণের কথা ব্যর্থ হতে পারে না। উর্বশীর সঙ্গে রাজা তিন রাত অন্তর্বাস পরে বাস করেছিলেন। উর্বশীতে রেত সেচন করলে উর্বশী বলে উঠলেন—এ কি হল?—কেন? এ তো আমিই।—রাজা উত্তর দিয়েছিলেন। উর্বশী বললেন—নতুন কলসী আনুন, তাতে এই রেত সেচন করে কুরুক্ষেত্রের বিসবতী নামক পুষ্করিণীর উত্তর দিকে যে সুবর্ণ সরণী আছে সেখানে পুঁতে ফেলুন।

সেখানে শমী পরিবেষ্টিত অশ্বত্থ গাছ জন্মেছিল। রেত থেকে অশ্বত্থ গাছ আর আধার থেকে জন্মেছিল শমীগাছ। এই শমীগর্ভ অশ্বত্থই সৃষ্টির

১৩। শদ—যজ্ঞ বিশেষ। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের যজ্ঞ। প্রজা বা সন্তান জন্মের জন্য এই যজ্ঞ—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৯।৩।২

১৪। অবভৃত—সোমযাগের শেষে সপত্নীক যজমান পুরোডাশ আহুতি অন্তে স্নান করেন। এই স্নানই অবভৃত; স্নানান্তে বস্ত্রপরিবর্তন করে উদয়নীয় ইষ্টি সম্পাদনের জন্য দেবযজন দেশে ফিরে আসেন। ঐ, আ

১৫। দেবযজন—যজ্ঞস্থল।

নিদান হয়েছিল। তারপর থেকেই দেবতা ও স্বর্গ সকলের কাছে সহজায়ত্ত হয়েছিল। দেবতাদের উদ্দেশ্যে মানুষের যজ্ঞ অশ্বত্থ থেকেই লব্ধ। তারই অরণি করা হয়েছিল। এই যে যজ্ঞ তা নিশ্চয়ই কোন শমীগর্ভ অশ্বত্থ থেকে। যাকে তাই বলা হয় উর্বশীর আয়ু হও পুরূরবা হও ইত্যাদি। তার থেকেই এদের পিতা পুত্রের নামগুলি গৃহীত। অনন্তর এগুলি সাধারণভাবে সকল যজ্ঞেই ব্যবহৃত হত।

উর্বশী চলে যাবার পর রাজা আবার অপ্রিয়তাবিদ্ধ হয়ে শোক করেছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি রাজাকে বললেন—'আপনার জন্য উপশদ যজ্ঞ করব যাতে আপনার অপ্রিয়তা দূর হতে পারে।' বৃহস্পতি আঙ্গিরস উপশদ যজ্ঞ করেছিলেন। অপ্রিয়তা দূর করার জন্য এই দুই শদ ও উপশদ পুরূরবার নামাঙ্কিত। যে বিত্ত কামনা করে এই শদ যজ্ঞ করে তার দশটি বহিষ্পবমান[১৬] এক এক করে স্থাপনা করবে। তারপর অপ্রিয় দূর করার জন্য উপশদ যজ্ঞ করবে, তার একুশটি বহিষ্পবমান এক এক করে দশটি স্থাপন করবে। তারপর প্রাজাপত্যৌ নামক শদও উপশদ। তার তিনটি বহিষ্পবমান, তিনটি তিনটি করে তিন পর্যন্ত স্থাপন করবে। তারপর নৈধ্রুব ও কশ্যপের শদ উপশদ দ্বয় তার চারটি করে বহিষ্পবমান। চারটি চারটি করে আটচল্লিশটি স্থাপন করবে। ৪৮টি বহিষ্পবমানের চারটি চারটি উচ্চারণ করবে।

বৃহদ্দেবতার[১৭] কাহিনী—

শৌনক বিরচিত বলে প্রচলিত 'বৃহদ্দেবতা' হচ্ছে ঋগ্বেদের দেবকোষ। ঋগ্বেদে যে সব দেবদেবীর উল্লেখ আছে তাদের স্বরূপ নির্ণয়ই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলেও প্রসঙ্গত বহু উপাখ্যানও বর্ণিত আছে। উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যান তাদের অন্যতম। বৃহদ্দেবতা নিরুক্তের পরবর্তী এবং কাত্যায়ন

১৬। বহিষ্পবমান—বিশিষ্ট স্তোম বা স্তোত্র। ৩. ত্রিকের স্তোত্র প্রাতঃ সবনের সময় বেদির বাইরে গাওয়া হয়। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞকালে তিন সবনের সময় গাওয়া স্তোত্রের নাম বহিষ্পবমান, মাধ্যন্দিন তৃতীয় বা অর্ভব।

১৭। বৃহদ্দেবতা edited by A A Macdonell 7/147—153

সর্বানুক্রমণীর পূর্ববর্তী সম্ভবত খৃঃ পূঃ পঞ্চমশতাব্দীর রচনা। এখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র এবং কিছুটা পৌরাণিক।

'পুরাকালে পুরূরবা নামে এক রাজর্ষির সঙ্গে অপ্সরা উর্বশী বাস করেছিলেন। উর্বশী তাঁর সঙ্গে সর্ত করে বিবাহিত জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে উর্বশীর সহবাস এবং পুরূরবার প্রতি ব্রহ্মার অনুরাগ দর্শনে পাকশাসন (ইন্দ্র) ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। ইন্দ্র তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য পার্শ্বস্থ বজ্রকে বললেন—'হে বজ্র যদি তুমি আমাব প্রিয় ইচ্ছা কর, তাহলে তাদের প্রীতি বিনাশ কর।'

—'তাই হোক' এই বলে বজ্র নিজের মায়ার দ্বারা তাদের বিচ্ছিন্ন করেছিল। তারপর উর্বশীর বিবহে রাজা পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুবতে তিনি এক সরোবরে পাঁচজন সখী পরিবৃতা সুন্দরী উর্বশীকে দেখতে পেলেন।

তাঁকে রাজা বললেন—'ফিরে এসো।'

উর্বশী দুঃখের সঙ্গে রাজাকে বললেন—এখানে আমি তোমাব অপ্রাপ্য, স্বর্গে আবার আমাকে ফিরে পাবে।'

এই পারস্পরিক আহ্বানের আখ্যান নানা জনে জানে। যাস্ক একে সংবাদ (সংবাদ সূক্ত) মনে করেন এবং শৌনক মনে করেন ইতিহাস।

কাত্যায়নেব সর্বানুক্রমণীর[১৮] কাহিনী :—

কাত্যায়ন কৃত ঋগ্বেদের সর্বানুক্রণীতে পাই উপাখ্যানের পরবর্তীরূপ। কাহিনী এখানে সম্পূর্ণ পৌরাণিক রূপ লাভ করেছে। প্রথমে ঋগ্বেদেব দশম মণ্ডলের ৯৫ নং সূক্তের প্রসঙ্গ উপলক্ষে কাহিনীর সংক্ষিপ্তরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

উর্বশী নামে অপ্সরা। মনুর পুত্র ঐলের প্রতি বছর ছ'মাসের স্ত্রীত্বকালে বুধের দ্বাবা জন্মেছিল পুরূরবা নামে পুত্র—মহারাজ। বরুণের অভিশাপে উর্বশী পুরূরবার সঙ্গে রাজধানী প্রতিষ্ঠানে চার বছর বাস করেছিলেন। পূর্বে কৃত সর্ত ভঙ্গ করার জন্য উর্বশী তাকে ত্যাগ করেন।

১৮। Katyayan's Sarvanukramani—A. A Macdonell সম্পাদিত- Oxford 1866

কামনার অভিলাষে পুরূরবা খুঁজতে খুঁজতে একদিন মানস সরোবরের তীরে তাঁকে দেখলেন। রাজার ইচ্ছা উর্বশীকে আবার প্রাসাদে অবরুদ্ধ করে একসঙ্গে বাস করার। ইচ্ছাসত্ত্বেও উর্বশী পুরূরবার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন।

সর্বানুক্রমণীর রচনা কাল[১৯] সম্ভবত খৃঃ পূ ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি। সর্বানুক্রমণীর ভাষ্য ষটগুরু শিষ্য বিরচিত 'বেদার্থ দীপিকা।' এ ভাষ্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লেখা বলে প্রচলিত হলেও কারো কারো মতে এটি ঋগ্বেদের প্রতিশাখ্যকার শৌনক রচিত। বেদার্থদীপিকায় সংকলিত সর্বানুক্রমণীর কাহিনীর বিস্তৃত রূপ এখানে উদ্ধার করা গেল। কাহিনী এখানে সম্পূর্ণ পৌরাণিক।

মিত্র ও বরুণ উভয়েই দীক্ষাকালে উর্বশীকে দেখে চঞ্চল হয়ে কুম্ভে তাদের শুক্রপাত করেন। তাঁরা উর্বশীকে শাপ দিয়েছিলেন—'মনুষ্য ভোগ্যা হয়ে পৃথিবীতে বাস কর।' তারপর মনুপুত্র ইলার কাহিনী। মৃগয়া কালে ইলা দৈবাৎ দেবীর বিহার বনে প্রবেশ করে। সেখানে গিরিসুতা মহাদেবকে তৃপ্ত করতে নানা ক্রীড়ায় রত, যেখানে প্রবেশ করলে পুরুষ স্ত্রী হয়ে যায়। সেখানে প্রবেশ করার ফলে ইলা নারী হয়ে মনোদুঃখে শাপ মোচনের জন্য শিবের শরণ নেন। শিব তাকে পাঠালেন দেবীর কাছে। রাজা দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন নিজের পুরুষত্ব ফিরে পাবার জন্য। দেবী তাঁকে বছরে ছমাস পুরুষ হবার বর দিলেন। একবার যখন তিনি স্ত্রী ছিলেন তখন সোম পুত্র বুধ তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালোবেসেছিলেন। সেই ইলার গর্ভে সোম পুত্র বুধের পুরূরবা নামে পুত্র জন্মেছিল। তাঁকে ভালোবেসে উর্বশী প্রতিষ্ঠানপুরে তাঁর সঙ্গে বাস করেছিলেন! 'শয্যার বাইরে তোমাকে নগ্ন দেখলে যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে চলে যাব, পুত্র মেষ দুটিকে সর্বদা আমার কাছে রক্ষা করতে হবে।' উর্বশীর এই সব সর্ত মেনে রাজা তাকে উপভোগ করেছিলেন। চার বছর বাদে দেবতাদের দ্বারা মেষদ্বয় অপহৃত

১৯। The date of Sarvanukramani would thus be about the middle of the 4th century B. C. তদেব পৃঃ VII

হয়েছিল। শব্দ শুনে নগ্ন রাজা উঠে যখন তাদের জয় করে শয্যার দিকে আসছিলেন তখন বিদ্যুতের আলোকে উর্বশী রাজাকে অনাবৃত্ত নগ্ন দেখে সর্ত্ত ভঙ্গ হল বলে স্বর্গে ফিরে চলে গেলেন। পাগলের মতো রাজা এখানে ওখানে খুঁজতে খুঁজতে মানস সরোবরের তীরে অপ্সরাদের সঙ্গে তাঁকে দেখতে পেয়ে আগের মতো ভোগ করার জন্য তাঁকে কামনা করেন। নিজে শাপমুক্ত হওয়ায় উর্বশী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন।

আমাদের আলোচনায় প্রবেশের আগে 'উর্বশী-পুরূরবা' সংবাদ সূক্ত সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের ভাষ্য কিছু কিছু উদ্ধার করছি। বৈদিক সাহিত্যে 'উর্বশী-পুরূরবা' উপাখ্যানের সমস্ত পাঠ উদ্ধার করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু গ্রন্থবৃদ্ধির ভয়ে বাদ দিতে হল।

আচার্য ম্যাক্সম্যুলরের (1823—1900) ভাষ্য :

য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ম্যাক্সমূলবকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারততত্ত্ববিদ বলা হয়। এই জার্মান পণ্ডিত তাঁর সমস্ত জীবনই ব্যয় করেছেন ভারত-সংস্কৃতি বিশেষত বেদবিদ্যার মাহাত্ম্য প্রচারে। বাঙালিরা তাই আদর করে তাঁর নাম দিয়েছেন ভট্ট মোক্ষম্যূলর। উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানটি তিনি প্রকৃতিমূলক বলে মনে করেছেন। তাঁর মত সমর্থন করেছেন Albrecht Weber, Sir George William Cox প্রভৃতি পণ্ডিতেরা। ম্যূলর বলেছেন—বেদের একটি অন্যতম অতিকথা যা সূর্য ও উষার সম্পর্কের প্রকাশক, মর্ত্য ও অমর্ত্যের প্রেম এবং উষা ও সন্ধ্যার একাত্মতা জ্ঞাপক তা হচ্ছে উর্বশী ও পুরূরবা উপাখ্যান।[২০] আচার্য ম্যাক্সম্যূলর উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানটিকে একটি সৌর অতিকথা বলে ব্যাখ্যা করেছেন —One of the myths of the Vedas, which expresses this correlation of the Dawn and the Sun, this love between the immortal and the mortal, and the identity of the Morning Dawn and the Evening Twilight is the story of Urvasi and Pururavas.[২১]

২০। Comparative Mythology by F. M. Muller. pp 126 George Routlidge & Sons., London

২১। তদেব পৃঃ 126

নগ্ন দেখে কুমারী উষা লজ্জায় তার মুখ ফিরিয়ে নিল স্বামীর দিক থেকে। তবু সে বললে আবার ফিরে আসবে। তারপর সূর্য যখন সারা পৃথিবী ঘুরে প্রিয়ার অন্বেষণ করে একাকী ক্লান্ত জীবনের প্রান্তে মৃত্যুর দ্বারে সমুপস্থিত তখন আবার দেখা দিল উষা। (আরক্ত সন্ধ্যা)।[২২] উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানের মূল হচ্ছে এই উষা সূর্যের প্রণয় কাহিনী, যা কালক্রমে বহু বিস্তৃত বনস্পতির আকার ধারণ করেছে। এই ভাবে উর্বশী পুরূরবাকে ভালোবাসে মানে হল সূর্যের উদয়। উর্বশী পুরূরবাকে নগ্ন দেখল মানে সূর্যোদয়ে উষার অন্তর্ধান। উর্বশী আবার পুরূরবাকে পেল মানে সূর্যের অস্তগমন।[২৩]

আচার্য ম্যূলর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও প্রতিতুলনার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে পুরূরবা শব্দের অর্থ সূর্য, ও উর্বশী শব্দের অর্থ উষা। তাঁর এই ব্যাখ্যা স্বীকার করেছেন Weber এবং William Cox এবং আরো অনেকে।

Sir James Frazer (1854—1941)

ফ্রেজার এই কাহিনীতে দেখেছেন টোটেমবাদের অবক্ষয়ের নিদর্শন। তাঁর মতে যখন বহির্বিবাহ বিধি যুক্ত এক টোটেমাবলম্বী কৌমের লোক অপর টোটেমাবলম্বী কৌমে বিয়ে করে তখনও স্বামী এবং স্ত্রী বিয়ের পরও নিজ নিজ টোটেমের প্রতি আনুগত্য দেখাতে এবং স্বীয় গোষ্ঠীর টাবু ও অপর রীতি নীতি মানতে বাধ্য থাকত এবং দম্পতির একজন অপরের টোটেম জন্তু বা গাছের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কার্পণ্য ঘটলে কলহ এবং তার ফলে বিচ্ছেদ দেখা দিত। স্বামী এবং স্ত্রী ফিরে যেত আপন আপন গোষ্ঠীতে। টোটেমবাদ এইভাবে আদিম যুগে বহু বিচ্ছেদের হৃদয়-বেদনার কারণ হত। সে সব কাহিনী-ধারার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যান।[২৪]

২২। তদেব পৃঃ 134 ২৩। তদেব পৃঃ 161

২৪। The Golden Bough by J. G. Frazer 3rd. ed. Part III pp 130-131 MacMillan

উর্বশী যে সহচরীদের সঙ্গে হাঁস হয়ে কুরুক্ষেত্রের অন্যতাপ্লক্ষ নামক পদ্ম সরোবরে চরছিল[২৫] তার থেকেই তিনি উর্বশীর কৌমের বা গোষ্ঠীর টোটেম হাঁস ধরে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত করেছেন। যেমন জার্মান হংস কুমারী কাহিনী।

Arthur Berriedale Keith (1879–1940)

কীথস, ম্যাক্সম্যুলর ও বেবের কথিত সূর্য-উষা অতিকথার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে এই উপাখ্যানেব কোন গভীব তাৎপর্য নাই। সূক্তটি তাঁর মতে স্পষ্টত নর-অপ্সরীর প্রণয়বিষয়ক যেমন সব সাহিত্যে আছে— যথা থেটিস কাহিনী এবং জার্মান হংসকুমারী কাহিনী। যে দীর্ঘ সাত বছর মানব প্রেমিকের সঙ্গে বসবাস করেছিল। নগ্ন দেখার টাবু আদিম ধরণের। পুরূরবা একজন নায়ক মাত্র, বাস্তব মানুষ না হতেও পারে অবশ্য পরবর্তী পুরাণে তাকে চন্দ্রবংশের প্রবর্তক গণ্য করা হয়েছে।[২৬]

দামোদর ধর্মেন্দ্র কৌশাম্বী

কৌশাম্বী মনে করেন যে কীথের এই ধারণা থেকে উপাখ্যানের কোনই ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর মতে কাহিনীটির কোন সুগভীর তাৎপর্য আছে বলেই এতকাল ধরে জীবিত রয়েছে। এই কাহিনীর ম্যাক্সম্যুলর ভাষ্যও কৌশাম্বী অতি সরলীকরণ বলে মনে করেন। এই ব্যাখ্যা কেবল মাত্র 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বিধৃত কাহিনীর একটি ব্যাখ্যা মাত্র। পরবর্তী পরিবর্তন বিশেষত কালিদাসীয়[২৭] কাহিনীর ব্যাখ্যায় এই ভাষ্য সমর্থিত নয়।[২৮] কৌশাম্বী এই উপাখ্যানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করে সাক্ষ্য

২৫। শ, ব্রা ১১।৫।৩।৪

২৬। The Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishada by A. B. Keith.

২৭। The Myth and Reality by D. D. Kosambi; Popular Prakasani Bombay 1962 pp 44

২৮। Kosambi-র প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃঃ 55

প্রমাণের দ্বারা মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, উর্বশী-পুরূরবার সংলাপ দুই নীতির দ্যোতক দুই ব্যক্তির দ্বারা কৃত কোন কৃত্যের রূপ—যা প্রাচীন কোন পুরুষমেধের রূপান্তর।[২৯]

—পুরূরবা হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালের একটি চরিত্র যখন পিতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ, হয়ে উঠেছে অর্থাৎ যখন পিতৃধারার সমাজ পূর্ববর্তী মাতৃধারার সমাজের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।[৩০] উর্বশীতে একটি পুত্র তথা উত্তরাধিকারী জন্মদানের পর পুরূরবাকে বলি দেওয়া হবে। তিনি উর্বশীর এই দৃঢ় ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃথাই অনুনয় করেন। এ হচ্ছে নৃতত্ত্বে কথিত এক আদিম বিবাহ বিধির পরিণতি।[৩১]

কৌশাম্বীর মতে উর্বশী এক জলদেবী বা অপ্সরা।[৩২] একটু পরেই তিনি লিখেছেন—'যে ব্যাখ্যা আমি দিতে চাই তা হচ্ছে—উর্বশী এক উষসের মর্যাদা লাভ করেছেন। এ পদ হচ্ছে মাতৃদেবতার নিছক উষা দেবীর নয়া ব্যাখ্যা'। জার্মান পণ্ডিত গ্রাছম্যান (Grassman) মনে করেন যে, কাহিনীটি আসলে এক ধর্মকৃত্য থেকে জাত যা পরবর্তীকালে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কাহিনীর রূপ লাভ করেছে। পুরূরবা বা বহুরবকারী ইলার (বা যজ্ঞাগ্নির) পুত্র। আর উর্বশী হচ্ছে কামনার স্বরূপ। গেল্ডনার (Geldner) এই কাহিনীতে দেখেছেন হেতেরাবাদ বা দেবদাসীবাদ। শ্রীঅরবিন্দও অপ্সরাদের হেতেরার সমপর্যায়ের বলে মনে করেছেন।[৩৩]

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ঋগ্বেদের ১০/৯৫ সূক্তের অনুবাদে প্রধানত সায়নের ধারা অনুসরণ করলেও প্রায়শ এক আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছেন।

২৯। The dialogue of Urvashi and Pururavas is likewise meant to be part of a ritual act performed by two characters representing the principles and is thus a substitute for an earlier sacrifice of the male—কৌশাম্বী তদেব পৃঃ 55

৩০। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম

৩১। কৌশাম্বীর প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃঃ 59। ৩২। তদেব পৃঃ 62

৩৩। K. F. Geldner—Vedische Studien Vol I Stuttgart 1889 pp 243-295

"উর্বশী হইতেছে বৃহতের ভোগ (উরু+অশ)। দেহ, প্রাণ, মনের উপর রহিয়াছে যে অতিমানস বা তুরীয় জ্যোতির প্রতিষ্ঠান যাহা 'সত্যং ঋতং বৃহৎ' যাহারই নাম মহর্লোক বা স্বর্লোক—দেব বৃন্দের ধাম, তাহাদের স্বরূপ ও স্বধর্ম যেখানে সেই দিব্য চেতনার দিব্য আনন্দই উর্বশীতে মূর্ত। মানুষের প্রাকৃত জীবনে যে আনন্দ তাহা ক্ষুদ্র, ক্ষণিক বিক্ষিপ্ত, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত—দভ্রা ঃ বহব ঃ ঋ ৪।২৫।৫। কিন্তু অদিতির অর্থাৎ অখণ্ড অসীম সত্তা উদার অবাধ চেতনাব যে 'অচ্ছিদ্রশর্ম' যে আনন্দং অমৃতং তাহাবই প্রকাশ হইতেছে উর্বশী—উরু অস্মৈ অদিতি শর্ম যং সৎ (ঋ ৪।২৫।৫)।

"পুরূববা কে ? বহুল কণ্ঠের ধ্বনি যাহার। কে সে ? সে হইতেছে মানুষ--মনু মনোময় জীব। মনবেত্থামবাশয়ঃ পুরূরবসে (ঋ ১।৩১।৪) পুরূরবা যে মনোময় জীব তাহারই জন্য অগ্নিদেবতা অর্থাৎ চিন্ময় তপঃ শক্তি (কবি ক্রতু) আপন উর্ধ্বায়নের গর্জনে দ্যুলোক অর্থাৎ জ্যোতির্ময় মানস লোক, দিব্যমন (দেবং মনঃ) প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের কণ্ঠে কেন এই ধ্বনি, এই আরাব ? এই রবেরই অন্য নাম 'হুতি' স্তুতি, উকথ্যশংস—অন্তবাত্মার সেই মন্ত্র, সেই বাক, যাহা দেবত্বকে আহ্বান করিতেছে, রূপ দিতেছে, প্রকাশ করিতেছে। ইহাই বৃহস্পতিব দেহ, প্রাণ, মন এই ত্রিভূমির যিনি অন্তরস্থ অধিপতি তাহার রব—বৃহস্পাতি স্ত্রিষাধস্থো রবেন (ঋ ৪।৫০।১)। মানুষের সাধনা দেবত্ব লাভ করা, দেবত্ব সৃষ্টি করা, মনোময় জীবের লক্ষ্য শুভ্রা দীপ্তা দিব্য মণীষাব সহায়ে।"[৩৪]

"উর্বশী উষা হইতে পাবে। কিন্তু সে উষা মানুষেব চেতনার বৃহতের প্রকাশ ; তাহার জ্যোতি আসিতেছে ওপার হইতে। পবম পরার্ধ হইতে —পরমে পরাকাৎ। প্রাকৃত উষা এই অতি প্রাকৃত দিব্য উষার—স্বর্গ দুহিতার প্রতীক (ঋ ১।৪৬।১৩)। পুরূরবা যখন উর্বশীর আনন্দময় বৃহৎ চেতনায় পূর্ণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে তখনই তাহাব নাম বসিষ্ঠ অর্থাৎ পরম জ্যোতির্ময়।"[৩৫]

৩৪। বেদমন্ত্র—নলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম পণ্ডিচেরী ১৯৬০ পৃঃ ৩৪ ৩৫

৩৫। তদেব পৃঃ ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য

বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞের পূর্বকৃত্য অগ্নিমন্থন ক্রিয়ার সঙ্গে উর্বশী ও পুরূরবা নামের সংযোগ দেখা যায়। সুতরাং এই বিষয়টির উপর অভিনিবেশ আবশ্যক। যজ্ঞ হচ্ছে প্রজ্বলিত আগুনে অলৌকিক দেব-শক্তির উদ্দেশে আহুতি প্রদানের উপাসনা এবং অথবা যজ্ঞক্রিয়ার দ্বারা অভীষ্ট প্রদানেব জন্য দেবতাকে বাধ্য করার যাদুক্রিয়া। আদিম মানব সমাজের এ এক প্রাচীন কৃত্য। আগুন আবিষ্কারের পর থেকেই সারা পৃথিবীতে অগ্নি উপাসনার প্রচলন হয়। মানব সমাজের বন্যদশার কোন স্তরে আগুন আবিষ্কার হয়! প্রথমে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা দাবানল থেকে আগুন সংগ্রহ করে তা অনির্বাণ রক্ষা করা হত। তারপর তাদের কেউ কেউ পাথরের অস্ত্র শস্ত্র বানাতে গিয়ে অথবা কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানোর কৌশল শিখে থাকবে। এই শেষোক্ত পদ্ধতিতে আগুন জ্বালাবার কৌশলই আদিম সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এখনো যে সব মানব গোষ্ঠী সভ্যতার আদিম স্তরে রয়ে গেছে তাদের অধিকাংশের মধ্যেই কাঠে কাঠে ঘষে আগুন তৈবি করার রীতি দেখা যায়। এইভাবে যারা আগুন জ্বালাতে পারত তারা ওঝা বা পুরোহিত রূপে গোষ্ঠীপতির প্রতিপত্তি আদায় করেছিল। আদিম সমাজে অনির্বাণ আগুন অত্যন্ত পবিত্রতার সঙ্গে গোষ্ঠীপতি গৃহে রক্ষা করা হত। নতুন করে আগুন জ্বালানো অত্যন্ত দুরূহ ছিল বলেই সম্ভবত এই নিয়ম হয়েছিল। কৌমের সকলেই গোষ্ঠীপতির ঘর থেকেই প্রয়োজনে আগুন সংগ্রহ করত বিনিময়ে তারা পেত কৌমের আনুগত্য।[১]

Sir J. G. Frazer তাঁর Golden Bough গ্রন্থে নিম্ন মিসিসিপি

১। Hence the maintenance of a perpetual fire came to be associated with chiefly or royal dignity—G. B. by J. G. Frazer, Part I Vol II pp 211

অঞ্চলের Natchez Indian-দের মধ্যে প্রচলিত যে রীতির বর্ণনা দিয়েছেন তাকে এই বিষয়ের আদর্শ দৃষ্টান্ত বলা চলে। এই রেড ইণ্ডিয়ান কৌমের লোকেরা মনে করে যে মর্ত্যের এই আগুন সূর্য থেকে আনীত। গোষ্ঠী-পতির কুটিরের পাশে এক চতুষ্কোণ মন্দিরে এই আগুন রাখা হয়। গোষ্ঠীপতির উপাধি বৃহৎ সূর্য।[২] প্রতিদিন সকাল বেলা পুব দিকে তাকিয়ে সে তিনবার বাঁশী বাজিয়ে সূর্যের যাত্রা শুরু করে দেয় এবং মাথার উপর পুব থেকে পশ্চিমে হাত ঘুরিয়ে সূর্যের যাত্রা পথ ঠিক করে দেয়।[৩] ওয়ালনাট আর ওক কাঠ জ্বালিয়ে আগুন রক্ষা করা এবং যাতে নিভে না যায় তার জন্য অত্যন্ত সাবধানতা নেওয়া হত। এজন্য ৮ জন রক্ষী নিযুক্ত থাকে, যাদের দুজন করে সব সময় পাহাড়া দেয়। কর্তব্যে ত্রুটি ঘটলে শাস্তি মৃত্যু। গোষ্ঠীপতি মারা গেলে তার হাড়গুলো শ্বাসরোধ করে হত্যা করা রক্ষীদের হাড়ের সঙ্গে অগ্নিমন্দিরে রাখা হত। গোষ্ঠীপতির আগুন নিভে গেলে সারা দেশের সবাই অগুন নিভিয়ে ফেলে। প্রত্যেক গ্রামেই মন্দির ছিল। এই সব মন্দিরের রক্ষকেরাও নিজেদের সূর্য বলত তবে তারা প্রধান সূর্যের আনুগত্য মেনে নিত।

দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার 'হেরেরা' বা বান্টু বংশের 'ডামারা'রা পশুপালক স্তরের কৌম। পশুই তাদেব সম্পদ। তারা যেখানে বসতি বা গ্রাম স্থাপন করে সেখানে ১০ ফিট ব্যাসের বৃত্তেব পরিসীমায় ঘন করে গাছের ডাল পুতে তাব ডগাগুলো শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘর বানায়। এক বৃহত্তব বৃত্তের পরিসীমায় স্থাপিত এরকম বহু ঘর নিয়ে তাদের গ্রাম। এই বৃহত্তব বৃত্তেব মাঝের খোলা জায়গা তাদের গোয়াল বা পশুশালা। পুব দিকের বড় সুসজ্জিত ঘরটি গোষ্ঠীপতির প্রধান স্ত্রীর। গোয়াল আর প্রধান স্ত্রীর ঘরের অন্তর্বর্তী স্থানে ছাই গাদায় আগুন থাকে। 'ওকুরুও' হচ্ছে পবিত্র চুল্লি আর 'ওমুরাঙ্গেরে' হচ্ছে পবিত্র আগুন। রাতে বা বৃষ্টির

২। ভারতের রাজারাও মনে করতেন তারা সূর্যবংশীয়। জাপানের মিকাডোরাও।

৩। When Dinosaurs rule1 the earth নামক একটি চলচ্চিত্রে এই অনুষ্ঠানটি প্রদর্শিত।

সময় প্রধানা স্ত্রীর ঘরে আগুন রাখা হয়। এই পবিত্র আগুন থেকেই গ্রামবাসীরা নিজেদের আগুন জ্বালিয়ে নেয়।[৪]

বৃষ্টিতে বা অন্য কারণে আগুন নিভে গেলে 'হেরেরা'রা তাকে বিশেষ দুর্লক্ষণ বলে মনে করে এবং কৌমের সকলে মিলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে, গোরু বলি দেয়, তারপর তারা কাঠে কাঠে ঘষে আবার নতুন আগুন জ্বালায়।

প্রাচীন রোমেও এই অগ্নি সংরক্ষণের ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ডায়না মন্দিরে গোলাকার বেদিতে 'ভেস্তা' নামে এক পবিত্র আগুন অনির্বাণ রক্ষা করা হত।[৫] পুরোহিত ছাড়াও চার বা ৬ জন ভেস্তা কুমারী দেবদাসীর মতো নিযুক্ত থাকত অগ্নি সংরক্ষণে। সমস্ত লাতিন জাতির মধ্যেই 'ভেস্তা' অগ্নি সংরক্ষণের ধর্মীয় কৃত্য প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনির্বাণ অগ্নিরক্ষার পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখে একে একটি সার্বজনীন আচার বলে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ করে আর্য ভাষাভাষী সকল শাখার মধ্যেই এই রীতির প্রচলন ছিল। ঈরাণীয় এবং ভারতীয় আর্যরা আগুন অবলম্বন করেই তাদের ধর্মাচার তথা যজ্ঞ গড়ে তোলে। বৈদিক আর্যদের পক্ষে অনির্বাণ অগ্নি রক্ষা ছিল অবশ্য কর্তব্য। তারা ব্রহ্মচর্যকালে গুরুগৃহে আচার্যের অগ্নিতে সমিৎ নিক্ষেপ করে হোম করতেন। বিবাহান্তে অগ্নিশালায় নিজস্ব গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করে আজীবন প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাতে হোম করতেন—একে বলে অগ্নিহোত্র। আজও জরথুস্ত্রবাদী ভারতীয় পার্শীরা 'আতর' বা অগ্নির মন্দির স্থাপন করে। ঐ অগ্নির রক্ষকদের বলা হয় আথ্রবান। বেশ বোঝা যায় আগুন জ্বালানো যখন দুঃসাধ্য বা অজানা ছিল তখনকার আগুন রক্ষার নিয়মই এই আচারে এসে পরিণতি লাভ করেছে।

য়ুরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রাচীন

৪। G. B. Part I Vol II pp 216-17

৫। ভেস্তা রোমক পুরাণের অগ্নি বা চুল্লির দেবী। শনির কন্যা ডায়না দেবীও ভেস্তা বলে অভিহিত।

যন্ত্রদশায় আগুন জ্বালানোর পদ্ধতি ছিল এক রকমই—কাঠে কাঠে ঘষে। Tylor যার আখ্যা দিয়েছেন Fire drill[৬] ঋগ্বেদের ভাষায় অগ্নিমন্থন।[৭]

ফ্রেজারের 'স্বর্ণশাখা' গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত অগ্নিমন্থন পদ্ধতির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাক।

বৃটিশ কলম্বিয়ার 'টমসন ইণ্ডিয়ান'-রা আগুন জ্বালানোর জন্য এক ফুটের বেশি লম্বা, এক ইঞ্চি ব্যাসের গোলাকৃতি দুটি শুকনো কাঠের যষ্টি ব্যবহার করে। তার একটির ডগার দিক ছুঁচলো। অপরটিতে পাশাপাশি দুটি ছিদ্র থাকে—একটি পাশের দিকে আর একটি মাথার দিকে। প্রথম যষ্টির ছুঁচলো দিকটা সছিদ্র যষ্টির উপরের ছিদ্রে ঢুকিয়ে দুই প্রসারিত করতলের মধ্যে ধারণ করে দ্রুত ঘোরানো হয়। ফলে যে তাপ জন্মে তা থেকে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়ে পাশের ছিদ্রে রক্ষিত দাহ্য ইন্ধনে পড়ে ধূমায়িত হয়। তারপর হাতে নিয়ে যতক্ষণ না জ্বলে ওঠে ততক্ষণ ফুঁ দেওয়া হয়। শুকনো ঘাস বা শুকনো গাছের বাকল রাখা হয় আগুন ধারণের জন্য। ছুঁচলো যষ্টিটিকে বলা হয় নর আর সছিদ্র যষ্টিকে বলা হয়—নারী। সেটি তৈরি হয় পপলার মূল থেকে আর অন্যটি হয় পাইন গাছ থেকে। অবশ্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কাঠও ব্যবহৃত হয়। যখন একটা স্ফুলিঙ্গ শুকনো ঘাস বা ইন্ধনের উপর পড়ে তখন তারা বলে নারী প্রসব করছে।[৮] বৈদিক ভাষায় আগুন জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত কাঠ দুটিকে বলা হয় অরণি আর ক্রিয়াটিকে বলা হয় 'অগ্নিমন্থন'।

হোপি ইণ্ডিয়ানরাও অরণি মন্থন করে আগুন জ্বালায় এবং অরণি দুটিকে বলে নর আর নারী।[৯] মধ্য অস্ট্রেলিয়ার উরাবুন্না (Urabunna)

৬। The Origin of Culture by E. B. Tylor pp 15

৭। ঋ 3/29/1

৮। ফ্রেজার এর Golden Bough Part I Vol II 204 পৃষ্ঠায় J. Teit বিরচিত The Thompson Indian of British Columbia গ্রন্থের 203-205 পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত বিবরণ।

৯। G. B. Part I Vol II পৃঃ 209

কৌমও অরণি মন্থন করে আগুন জ্বালে। তারা উপরের অরণিটিকে বলে শিশু অরণি আর নিচের অরণিটিকে বলে মাতৃ অরণি।[১০]

টরেস প্রণালীর মুরারে দ্বীপে উত্তরারণিকে বলা হয় শিশু (বেরেম) আর শায়িত অরণিকে বলা হয় মাতা (অপু)। টরেস প্রণালীরই মাবুইআগ-এ (Mabuiag) উত্তরারণি লিঙ্গ (ইনি) এবং অধরারণি গর্ত (সাকাই) নামে পরিচিত। প্রাচীন বেত্নইনেরাও অরণি মন্থন করে আগুন জ্বালাত। তারা শায়িত অরণিকে যোনি বা জেন্দা (Zenda) বলত এবং উত্তান অরণিকে লিঙ্গ বা জন্দ। জন্দের প্রান্ত জান্দার ফর্দে (গর্তে) ঢুকিয়ে দ্রুত ঘুরিয়ে আগুন জ্বালত। পশ্চিম আফ্রিকার দক্ষিণ কামেরুণের ন্‌গুম্‌বুরা উত্তরারণিকে বলে পুরুষ এবং অধরারণিকে বলে স্ত্রী। পূর্ব আফ্রিকার মাসাইরা, মধ্য আফ্রিকার বাগাণ্ডারা, দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার বান্টু বংশের 'ডামারা' বা হেরেরা-রা অরণি দুটিকে বলে পুরুষ (অনতুম্যা) ও নারী (আত্যিয়া) এবং অরণি দুটির ঘর্ষণে আগুন জ্বালানোকে মৈথুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়।[১১] কালাহারি মরুভূমির নিকটবর্তী আজসন (Ajsan) বুশম্যানরা উত্তান অরণিকে বলে 'তাও দোরো' (Taw doro) এবং শয়ান অরণিকে বলে গাই দোরো (gai doro)। তাও হচ্ছে পুংবাচক এবং গাই হচ্ছে স্ত্রীবাচক উপসর্গ।

ফ্রেজার সংকলিত সারা পৃথিবীতে অদ্যাপি অবশিষ্ট আদিম মানব গোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি সংগৃহীত বিবরণ থেকে অগ্নিমন্থন পদ্ধতি ও তৎসম্পর্কিত কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার বিশ্বগত সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন—

(১) অগ্নির পবিত্রতায় বিশ্বাস ও আগুন অনির্বাণ সংরক্ষণের আচার

(২) পবিত্র অগ্নি পুরোহিত বা গোষ্ঠীপতি গৃহে রাখা হত।

(৩) দুই টুকরো কাঠ বা বৈদিকভাষায় অরণি মন্থন করে আগুন জ্বালানো হত।

৪) একটি সছিদ্র কাঠ শায়িত রেখে (অধরারণি) অপর একটি

১০। তদেব পৃঃ 209—Spencer and Gillen বিরচিত Northern Tribes of Central Australia পৃঃ 621 থেকে

১১। G. B. Part I Vol II পৃঃ 208, 218

একদিক ছুঁচল কাঠ (উত্তরারণি) সেই ছিদ্রে ঢুকিয়ে প্রসারিত দুই যুক্ত করতলের মধ্যে ধারণ করে দ্রুত ঘোরানো হত।

৫) সাধারণত উত্তরাবণি বা উত্তান কাঠটিকে পুরুষ বা স্বামী এবং শয়ানটিকে স্ত্রী বলা হত। কোথাও কোথাও বা শিশু ও নারী বলা হত।

৬) এই অগ্নি মন্থন ক্রিয়াকে নারী ও পুরুষের মৈথুনের সঙ্গে তুলনা কবা হয়।

৭) এই আগুনে পিতৃপুরুষের সংস্পর্শ বিশ্বাস করা হয় এবং এর কাছে কৌম ও ব্যক্তির কল্যাণ ও অপশক্তিব হাত থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনাও করা হত অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিব অবস্থিতি অনুভব করা হত।

ঋগ্বেদের অনেক ঋকে অরণি মন্থনের দ্বারা আগুন জ্বালানোর বর্ণনা ও উল্লেখ আছে। বিস্তারিত বর্ণনা আছে তৃতীয় মণ্ডলের ২৯নং সূক্তে।

অস্তি ইদম্ অধিমন্থনম্ অস্তি প্রজননং কৃতম্।
এতাং বিশ্‌পত্নীমা ভরাগ্নিং মন্থাম পূর্বথা॥

"এই মন্থনেব উপকবণ, এই অগ্নি উৎপত্তিব উপকবণ, লোকের পালয়িত্রী অবণিকে আহবণ কর, আমরা পূর্বকালের ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করিব।"

"গর্ভিনীতে সুসংস্থাপিত গর্ভেব ন্যায় জাতবেদা অগ্নি অবণিদ্বয়ে নিহিত আছেন।"[১২]

"হে জ্ঞানবান অধ্বর্যু, তুমি উর্ধ্ব মুখ অবণি অধোমুখ অরণিতে ধারণ কব। তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী অরণি অভীষ্টবর্ষী অগ্নিকে উৎপন্ন করিল। অগ্নিবদাহক তাহাতে রহিল উজ্জ্বল তেজোবিশিষ্ট ইলার পুত্র অগ্নি অরণিতে উৎপন্ন হইলেন।"[১৩]

"যখন হস্ত দ্বারা মন্থন করা যায় তখন কাষ্ঠ হইতে অগ্নি অশ্বের ন্যায় শোভমান হইয়া ও দ্রুতগামী অশ্বিদ্বয়েব বিচিত্র বথেব ন্যায় শীঘ্র গমনশীল হইয়া শোভাপান।"[১৪]

এই সূক্তের ত্রয়োদশ ঋকে বলা হয়েছে—'পুমাংসং জাতমভি সং-

১২। অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুধিতোগর্ভিণীষু॥ ঋ ৩।২৯।২

১৩। উত্তানায়ামব ভরা চিকিত্বান্ত সদ্যঃ প্রবীতা বৃষণং জজান।
অরুষ স্তুপো রুশদস্য পাজ ইলাযাস্পুত্রো বয়ুনেঽজনিষ্ট॥ ৩।২৯।৩

১৪। যদীমন্থন্তি বাহুভির্বি রোচতেঽশ্বো ন বাজ্যরুষো বনেষ্বা। ঋ ৩।২৯।৬

রন্তস্তে ॥"—অর্থাৎ 'পুত্র সন্তানের ন্যায় উৎপন্ন অগ্নি' "ঋত্বিকগণ হব্যভোজী শোভন যাগ নিষ্পাদক যে অগ্নিকে সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় হস্তে ধারণ করেন।"[১৫] ১।৬০।১ ঋকে দুটি অরণি থেকে উৎপন্ন বলে অগ্নিকে বলা হয়েছে দ্বিজন্মানং। (দ্বয়োররণ্যেরুৎপন্ন ঃ—সা ১।৩১।২)।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অগ্নিমন্থনের যে রীতি পাওয়া যায় তা নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

শমীগর্ভ[১৬] অশ্বত্থের শাখা থেকে অরণি তৈরি করা হয়। ২৪ আঙ্গুল দীর্ঘ, ৬ আঙ্গুল প্রশস্ত এবং ৪ আঙ্গুল উচ্চ কাষ্ঠ খণ্ডই অরণি।[১৭]। অধরারণি অর্থাৎ যে কাঠটি নিচে পাতা হয় তার একদিক থেকে ১২ আঙ্গুল এবং অন্যদিক থেকে ৮ আঙ্গুল ছেড়ে দুপাশ থেকে মাঝামাঝি জায়গায় একটি ছিদ্র করা হয় তার পাশেই থাকে আর একটি ছিদ্র।[১৮]। এই ছিদ্রে ঘুটের গুঁড়ো শুকনো ঘাস ইত্যাদি ইন্ধন রাখা হয়। উত্তরারণির একদিকে আট আঙ্গুল সূক্ষ্মাগ্র প্রমন্থ[১৯] এবং অন্যদিকে ১২ আঙ্গুল দীর্ঘ একটুকরো কাঠ আড়াআড়ি ভাবে লাগানো থাকে এর নাম ওবিলী। দুপায়ে চেপে ধরা শায়িত অধরারণির ছিদ্রে প্রমন্থটি ঢুকিয়ে ওবিলী ধরে দ্রুত ঘোরানো হয় অথবা যজমান অধরারণি ধরে থাকেন এবং অধ্বর্যু অপরটির সাহায্যে মন্থন করেন। ফলে জাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাশের ছিদ্রে রাখা ইন্ধনে লাগে। তখন তা দুহাতে তুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুন শিখায়িত করা হয়। অবশ্য দড়ির সাহায্যেও মন্থন করা হত তারও পরিচয় কোথাও কোথাও আছে। আর একটি ঋকে অরণিদ্বয় ও জাত অগ্নির সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের পরিচয় আছে "রেতঃ সেক প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধা গাভী প্রসব করিলে যে রূপ হয়, অরণি অর্থাৎ অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ

১৫। আ যং হস্তেন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রাতি। ঋ ৬।১৬।৪০

১৬। সংসক্ত মূলো যঃ শম্যা শমীগর্ভঃ স উচ্যতে।—কর্মপ্রদীপ ১০।৭।৩

১৭। চতুর্বিংশতিরঙ্গুষ্ঠা দৈর্ঘং ষড়পি পার্থবং।
চত্বার উচ্ছ্রয়োমানমরণ্যোঃ পরিকীর্তিতম। ঐ ১০।৭।৪

১৮। মূলাদষ্টাঙ্গুলং তক্ত্বা অগ্রাৎ তু দ্বাদশাঙ্গুলম্।
দেবযোনিঃ স বিজ্ঞেয় স্তত্র মথ্য হুতাশনঃ ॥ গোভিল গৃহ্য সূত্র ১।৭৮।৮২

১৯। অষ্টাঙ্গুলঃ প্রমন্থঃ স্যাৎ। গোভিল গৃহ্যসূত্র ১।৭৮।

সেইরূপ অগ্নিকে প্রসব করে।···অগ্নি অরণিদ্বয়ের পুত্রস্বরূপ, তিনি পূর্বকালে তুই অরণি স্বরূপ মাতা-পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে অরণি স্বরূপ গাভী, সে শমীবৃক্ষে জন্মগ্রহণ করে। তাহারই অন্বেষণ করা হইয়া থাকে।”[২০] অরণিদ্বয় এখানে মাতাপিতা এবং মন্থন জাত অগ্নি তাদেব পুত্র।

ঋগ্বেদের তুটি ঋকে অগ্নিমন্থনের সঙ্গে পুরূরবা নামেব সম্পর্ক দেখা যায়।

ত্বমগ্নে মনবেদ্যামবাশয়ঃ পুরূরবসে সুকৃতে সুকৃত্তবঃ।

শ্বাত্রেণ যৎ পিত্রোর্মুচ্যসে পর্য ত্বা পূর্বমনয়ন্নাপরং পুনঃ।[২১]

“অগ্নি তুমি মনুকে স্বর্গলাভের কথা বলিয়াছিলে, পুরূরবা রাজা সুকৃতি করিলে তুমি তাহার প্রতি অধিকতর ফলদান করিয়াছিলে; যখন তোমার পিতৃরূপ কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন হও।” ইত্যাদি

পিত্রোঃ শব্দটি ষষ্ঠীব দ্বিবচন। রমেশচন্দ্র এর অর্থ করেছেন ‘পিতৃরূপ কাষ্ঠ দ্বয়।’ পিতৃশব্দ দ্বিবচনে পিতা ও মাতা যুগ্ম অর্থেও প্রযুক্ত হয়।[২২] এই অর্থই সুপ্রযুক্ত। তৃতীয় মণ্ডলের একটি ঋকে বলা হয়েছে ‘ইলার পুত্র অগ্নি অরণিতে উৎপন্ন হইলেন।[২৩] পুরাণ মতে ইলার পুত্র পুরূরবা। যজুর্বেদে আছে উত্তরারণির নাম পুরূরবা এখানেও বোধ হয় সেই ইঙ্গিত। আবার উর্বশী পুরূরবা সংবাদ সূক্তের ১৮ নং ঋকে পুরূরবাকে ঐল বা ইলার পুত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং ঋগ্বেদের কালেও যে অগ্নিমন্থন ও অরণির সঙ্গে পুরূরবা ও উর্বশীর সংযোগ ছিল তা বোঝা যায়।

ঋগ্বেদেব আর একটি মন্ত্রেও[২৪] যজুর্বেদেব অরণি মন্থনের সঙ্গে উর্বশী ও

২০। ত্বরীষৎ সুত সম্মো অজ্যমানা ব্যাথরব্যথীঃ কৃমুতে অগোপাঃ
পুত্রো যৎপূর্বঃ পিত্রোর্জনিষ্ট শম্যাং গৌর্জগার যদ্ধ পৃচ্ছান্॥ ঋ ১০।৩১।১০

২১। ঋ ১।৩১।৪

২২। তু জগৎ পিতরৌ বন্দে—কালিদাস, রঘুবংশ ১।১

২৩। ঋ ৩।২৯।৩

২৪। আ যূথেব ক্ষুমতি পশ্বো অখ্যদ্দেবানাং যজ্জনিমান্ত্যগ্র। মর্তানাং চিদুর্বশীঃ অকৃপ্রণ্ বৃধে চিৎ অর্য উপরস্য আয়োঃ। ঋ ৪।২।১৮

পুরূরবার যে সংযোগ আছে তার আভাস দেখা যায়। মন্ত্রটি অথর্ব বেদেও[২৫] আছে অবশ্য এর অর্থ নিয়ে সংশয় আছে। রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদ করেছেন—'হে তেজস্বী অগ্নি, যেমন অন্নবিশিষ্ট গৃহে পশু সমূহ থাকে, সেইরূপ অঙ্গিরাগণ দেবগণকে, গো সমূহ সন্নিকটে আছে তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। মর্ত্যগণের জন্য উর্বশীগণ সমর্থ হইয়াছিলেন, আর্য অপত্যবৃদ্ধি ও মনুষ্য পোষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।'—কিন্তু এ অর্থ দুর্বোধ্য। অথর্ব বেদে উদ্ধৃত এই মন্ত্রটির অনুবাদ W. D. Whitney করেছেন। আরম্ভে বলেছেন—এই মন্ত্র প্রজ্বলন্ত অগ্নির উদ্দেশে।—যেমন গোযূথ খাদ্যের (ক্ষুম) প্রতি, তেমনি বলযুক্ত জন গোযূথের প্রতি লক্ষ্য করে নিকটে দেবতাদের জন্ম দেখে। মর্ত্যবাসীরা উর্বশীর জন্য দুঃখ করেছে পরের লোকটির পুণ্য বৃদ্ধিতে।[২৬] অর্থাৎ দেবতাদের জন্ম দেখে,—যেমন পশু যূথ দেখে। তার নিকটে আলোকে দেবতারা আসে। ব্লুম ফিল্ড লিখেছেন—এমনকি মর্ত্য মানুষের জন্যও উর্বশীরা পরিবর্তিত হয়, নিম্নস্থ আয়ুর উৎপাদনের জন্য।[২৭] সায়ন ভাষ্য অনুসারে উর্বশীর মতো মেঘ দেবী স্বর্গীয় অগ্নি উৎপাদন করে। তেমনি অরণি (উর্বশী নামক) মর্ত্যদের জন্য উৎপন্ন করে পার্থিব অগ্নি।'[২৮] অর্থ এখানেও স্পষ্ট নয়। বিশ্ববন্ধু সম্পাদিত অথর্ব বেদের ভাষ্যে মনে হয় শ্লকটির প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয়েছে। মন্ত্রটির তিনি অন্বয় করেছেন এরূপ—উগ্র দেবানাম জনিম অস্তি আ অখ্যৎ যূথেব ক্ষুমতি পশ্বঃ মর্ত্যাসঃ চিৎ উর্বশীঃ অকৃপ্রণ অর্যঃ উপবস্য আয়োঃ বৃধেচিৎ। —(যজ্ঞের) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলে আহুত (ইন্দ্রাদি) দেবতাদের জন্ম

২৫। অ—১৮।৩।২৩

২৬। As herd at food (Ksum) the formidable one hath looked over ('ate') the cattle, the births of the gods, nearly mortals have lamented the Urvacis, unto the increase of the pious of the next man.

—Atharva Veda Samhita, Harvard Oriental Series Vol.—VIII tr. by W. D. Whitney pp 855

২৭। প্রাগুক্ত গ্রন্থে Whitney কর্তৃক JAOSXX P 183 থেকে উদ্ধৃত।

২৮। হুইটনি কর্তৃক উদ্ধৃত সায়ন ভাষ্য প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা 856

(আবির্ভাব) কাছে দেখতে পায়। যেমন কোলাহলকারী গো যূথের স্বামী (আপন) পশুদের দেখে। মানুষ হয়েও (তোমার প্রসাদে) উর্বশী উপভোগে সমর্থ হয় (তোমার প্রসাদে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়) স্বামী হয়ে গর্ভে নিষিক্তের আয়ুর (মানুষের) বর্ধন করে।[২৯] অর্থাৎ অরণি মন্থনে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলে সেখানে আহুতি দিয়ে আহ্বান করায় ইন্দ্রাদি দেবতার আবির্ভাব ঘটে। অরণিদ্বয়ের নিচেরটির নাম উর্বশী উপরেরটির নাম পুরূরবা (এই মন্ত্রে অনুল্লিখিত)। উর্বশীর স্বামী (অর্থঃ) অরণি মন্থনে নিচের অরণিতে ঘর্ষণ জাত যে আগুন জ্বলে তাই তাদের পুত্র আয়ু।

যদিও পুরূরবার উল্লেখ নাই অগ্নিমন্থনে নিচের অরণির নাম উর্বশী এবং উপরের অরণি তার স্বামী এবং মন্থন জাত আগুন তাদের পুত্র আয়ু —এই পরিচয় স্পষ্ট হচ্ছে যা যজুর্বেদে স্পষ্টতব।[৩০] শুক্ল যজুর্বেদেব মাধ্যন্দিন শাখার বাজমনেয়ি সংহিতায় আছে—

অগ্নের্জনিত্রমসি বৃষণৌস্থ উর্বশ্যায়ুরসি পুরূরবা অসি। গায়ত্রেণ ত্বা-ছন্দসা মন্থামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি জাগতেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি।

—অগ্নির জন্মস্থান হও, মুষ্কদ্বয় হও, উর্বশীর আয়ু হও, পুরূরবা হও। গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা তোমাকে মন্থন করি, ত্রিষ্টুভ ছন্দের দ্বারা তোমাকে মন্থন করি, জগতী ছন্দের দ্বারা তোমাকে মন্থন করি।

মন্ত্রের 'বৃষণৌস্থ'-এব অনুবাদ কেউ কেউ করেছেন অভীষ্টবর্ষী হও। বৃষণৌ শব্দ বৃষ্ ধাতুর উত্তর কনিন প্রত্যয় নিষ্পন্ন। সাধারণত ভ্বাদি গণীয় বৃষ্ ধাতুর অর্থ বর্ষণ বা জল ঢালা। তদনুযায়ী এমনকি আচার্য-উবটও ভাষ্য করেছেন "বৃষু সেচনে, বৃষণৌ বর্ষিতারৌ সেক্তারৌ ভবথঃ—বর্ষণকারী হও। অধ্যাপক Riffith ও অর্থ করেছেন বর্ষণকারী।[৩১] কিন্তু বৃষ ধাতু নিষ্পন্ন বৃষণ শব্দের অর্থ অণ্ডকোষ ও তার দ্বিবচনে বৃষণৌ অর্থ

২৯। অথর্ব বেদঃ (শৌনকীয়) বিশ্ববন্ধুনা সম্পাদিতা। হোশিয়ারপুর তৃতীয় ভাগ ১১-১৮ কাণ্ড

৩০। শু, য ৫।২

৩১ Birth place art thow of Agni ye, are sprinklers etc.—Text of the White Yajurveda translated by Ralph T. H. Riffith

অণ্ডকোষদ্বয় বা মুষ্কদ্বয় হওয়াই উচিত। শুক্রাধার অণ্ডকোষ থেকে প্রাণবীজ শুক্রে সিঞ্চিত হয়। কাজেই সেচনকারী বর্ষণকারী অর্থও করা যায়। কিন্তু যেহেতু শব্দটির দ্বিবচনের রূপ ব্যবহৃত সুতরাং মুষ্কদ্বয় বা অণ্ডকোষদ্বয়ই বোধ হয় অভিপ্রেত অর্থ। A. B. Keith ও অনুবাদ করেছেন Thow art the two male ones।[৩২] আচার্য ম্যাক্সমূলারও অর্থ করেছেন মুষ্কদ্বয়।[৩৩]

কৃষ্ণযজুর্বেদের কাঠক সংহিতার ষড়বিংশ স্থানক সপ্তম অনুবচনের বিংশতি মন্ত্রে এবং কপিষ্ঠাল সংহিতায় মন্ত্রটির বিস্তৃততর রূপ দেখা যায়।

অগ্নের্জনিত্রমসীতি। অগ্নের্হ্যেতজ্জনিত্রম। বৃষণৌ স্থ ইতি নহ্যমুষ্কাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে প্রজননায় উর্বশ্যায়ুরসি পুরূরবা অসীতি। মাতা বা উর্বশ্যায়ুগর্ভঃ পিতা পুরূরবা রেতো ঘৃতম্। ঘৃতেনারণী যৎ সমানক্তি মিথুন এব রেতো দধাতি। গায়ত্রং ছন্দোঽনু প্রজায়স্ব ইত্যাদি!

—অগ্নির জন্মস্থান হও। আগুনের এই জন্মস্থান। অণ্ডকোষদ্বয় হও মুষ্কদ্বয়ের মতো। প্রজা প্রজননের জন্য উর্বশীর আয়ু হও, পুরূরবা হও। মাতা বা আয়ুব গর্ভধারিনী উর্বশী, পিতা পুরূরবা, রেতঃ ঘৃত। ঘৃতের দ্বারা অরণি মাখিয়ে মিথুনের মতো রেত ধারণ করে। গায়ত্রী ছন্দ অনুযায়ী উৎপন্ন কর।

শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রের[৩৪] বিস্তৃত পদ্ধতি এবং কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রের বিস্তৃততর বিনিয়োগ ব্যাখ্যান থেকে মন্ত্রের অর্থ স্পষ্ট হয়। শুক্লযজুর্বেদের পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রটি অগ্নিমন্থন কালে অধ্বর্যুর উচ্চার্য। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র অবলম্বনে অগ্নিমন্থন অনুষ্ঠানটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া গেল।

৩২। The Veda of the Black Yajus school entitled Taittiriya Samhita, tr. by A. B. Keith, Harvard Oriental Series Vol 18, 1942

৩৩। 'the two testicles are ye'—S. B. E. Vol 26 Part I & II পৃঃ 389, পা

৩৪। শ, ব ৫।২

আসাদ্যাহগ্নি মন্থনম্[৩৫]

চাতুর্মাস্য যাগের আতিথ্যেষ্টি এবং অপর যাগ উপলক্ষে এই মন্থন রীতি বর্ণনা করা হয়েছে।

'সোহগ্নি মন্থনং শকলমাদত্তে অগ্নের্জনিত্রমসীত্যত্রহ্যগ্নির্জায়তে।[৩৬] —এক টুকরো সমিধ[৩৭] স্থাপন করে অধ্বর্যু বলবেন 'অগ্নির জন্মস্থান হও' অর্থাৎ এখানেই আগুন উৎপন্ন হবে।

'অথ দর্ভতরুণকে নিদধাতি বৃষনৌ স্থইতি।'

তদ্যাবেবেমৌ স্ত্রিয়ৈ সাকং জাবেতা বেবেতৌ ॥[৩৮]

—'তোমরা দুই অণ্ডকোষ' এই মন্ত্র পাঠ করে ঐ শকল বা কাঠের টুকরো বা পলাশী সমিধের উপর দুই গাছি কুশ রাখবে। এই দুটি যেন দুটি ছেলে এখানে একসঙ্গে এক স্ত্রী থেকে জাত।

উর্বশ্যসীত্যধরারণি তয়োঃ।[৩৯]

—'উর্বশী হও' এই বলে কুশ দুটির উপর অধরারণিটি রাখবে। তথোত্তরারণ্যাজ্য বিলাপনীমুপস্পৃশ্যত্যায়ুরসীতি।[৪০]

—আয়ু হও এই মন্ত্রের দ্বারা উত্তরারণির প্রমন্থমূলের (উত্তরারণির সূচীমুখ) দ্বারা ঘৃত পাত্র (অর্থাৎ ঘি) স্পর্শ করে—তামভিনিদধাতি পুরূরবা অসি।[৪১]

পুরূরবা হও এই মন্ত্র দ্বারা উত্তবারণিকে অধরারণির ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করাবে।

উর্বশীব্যহ অপ্সরাঃ পুরূরবাঃ পতিরথ যত্তস্মান্মিথুনাদ জায়ত তদায়ুরেবমেবৈষ এতস্মান মিথুনাদ্যজ্ঞং জনয়ত্যথাহাগ্নয়ে মথ্যমানাম্নু-ব্রূহীতি।[৪২]

—উর্বশী ছিলেন অপ্সরা, পুরূরবা ছিলেন তার পতি, যেমন তাদের

৩৫। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৫।১।২১ চৌখাম্বা 1927

৩৬। শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৩।২।২০ চৌখাম্বা, চিন্নস্বামীসং

৩৭। শকল শব্দের অর্থ ম্যাক্সম্যুলর করেছেন a piece of wood, কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন শকলং পলাশীসমিৎ

৩৮। শ, ব্রা ৩।৩।২।২১ ৩৯। কা, শ্রৌ ৫।১।২৪

৪০। শ, ব্রা ৩।৩।২।২২ ৪১। তদেব ৪২। শ, ব্রা ৩।৩।২।২২

মিথুন থেকে জন্মেছিলেন আয়ু তেমনি এই মন্থন থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হোক। তখন অধ্বর্যু হোতাকে বলবেন অগ্নিকে মন্থন করবার অনুজ্ঞা বলুন।... ইত্যাদি।

শতপথ ব্রাহ্মণের শেষভাগে যজ্ঞের মাহাত্ম্য এবং অরণি উদ্ভবের কাহিনী ও মর্তে যজ্ঞাগ্নি আনার কথা বলা হয়েছে। উর্বশীর পরামর্শে পুরূরবা গন্ধর্বদের একজন হতে চাইলে গন্ধর্বেরা বললেন—মানুষের যজ্ঞের আগুন নাই যার দ্বারা তারা আমাদের মতো হতে পারে।[৪৩] শেষ পর্যন্ত গন্ধর্বেরা অশ্বত্থের দুই অরণি নির্মাণ করে আগুন জ্বালাতে বললেন, যা সেই যজ্ঞের আগুন। তাতে যজ্ঞ করে পুরূরবা গন্ধর্বদের একজন হয়েছিলেন।[৪৪] শতপথের কাহিনীতেও অরণি দুটির সঙ্গে উর্বশী ও পুরূরবার সম্পর্ক দেখা গেল। শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদে উত্তরারণির নাম পুরূরবা এবং অধরারণি নাম উর্বশী দেখা যায়। এই নামকরণের একটা ব্যাখ্যা আছে বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রে।

উর্বশীর বিরহে পুরূরবা যখন শোকার্ত চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি এসে রাজাকে বললেন—আমি যজ্ঞ করব যাতে তুমি তাঁকে ফিরে পাও। তিন রাতের জন্য রাজা উর্বশীকে ফিরে পেলেন। সহবাস কালে রেত সেচনের সময় উর্বশী আপত্তি জানালেন। নতুন কলসী এনে তাতে রেত সেচন করতে এবং কলসীটি কুরুক্ষেত্রে বিসবতী অর্থাৎ পদ্মপুকুরের উত্তর দিকে সুবর্ণ সরণীতে পুতে ফেলতে বললেন। সেখানে শমী পরিবৃত অশ্বত্থ গাছ জন্মেছিল রেতের স্থানে অশ্বত্থ এবং পাত্রের স্থানে শমী। এর থেকে যজ্ঞ আয়ত্ত হয়েছিল। মানুষের কাছে সুলভ হয়েছিল দেবতা ও স্বর্গ। এই যজ্ঞের জন্য শমীগর্ভ অশ্বত্থ শাখা থেকে অরণি প্রস্তুত করা হয়। তাই যে বলা হয় 'উর্বশীর আয়ু হও', 'পুরূরবা হও' ইত্যাদি। তার থেকেই এই পিতা পুত্রদের নাম সমূহ সাধারণ ভাবে যজ্ঞের জন্য গৃহীত।[৪৫]

৪৩। তদেব ১১।৫।৩।১৩ ৪৪। তদেব ১১।৫।৩।১৭

৪৫। তস্যারণি চক্রিরে অয়ং বাব স যজ্ঞ ইত্যথো খলু য এব কশ্চাশ্বত্থঃ স শমীগর্ভঃ স যদাহোর্বশ্যস্যায়ুরসি পুরূরবা ইত্যেতেষামেবৈতৎ পিতাপুত্রাণাং নামানি গৃহ্নাত্যথো সামান্যমেবৈতদ্বহেন।—বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ১৮।৪৫

এই সব উল্লেখ থেকে আদিম সমাজের কাঠে কাঠ ঘষে (Fire drill) আগুন জ্বালানোর পদ্ধতিই বৈদিক যজ্ঞাগ্নি জ্বালানোর অনুষ্ঠানে অনুসৃত দেখা যায়, আরো দেখা গেল যে অরণি দুটি নারী পুরুষ বা স্বামী স্ত্রী রূপে উর্বশী ও পুরূরবা নামাঙ্কিত। অরণি মন্থনকে স্ত্রী পুরুষের মৈথুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্ত্রী পুরুষের মৈথুনে বীর্য নিষেকের ফলে সন্তান জন্মে তেমনি উত্তরারণি পুরূরবা, অধরারণি উর্বশী এবং ঘৃত হচ্ছে রেত। যে অগ্নি জন্ম নেয় সে উর্বশী ও পুরূরবার পুত্র আয়ু।[৪৬]

আগুন আবিষ্কারের পর অগ্নি সংরক্ষণ সকল আদিম জাতির এক পবিত্র কৃত্য ছিল। এই পবিত্রতার ধারণা অস্তিত্বের প্রয়োজনে গুরুত্ব লাভ করে অগ্নিকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বলে মনে করা হয়েছে। আদিম মানুষের কাছে প্রজনন ছিল এক অলৌকিক বিস্ময়। তাই মৈথুন জাত রেত থেকে উৎপন্ন শমীগর্ভ অশ্বত্থ[৪৭] শাখার অরণি মন্থনে—যা মৈথুন সদৃশ—জাত অগ্নিও সেই প্রজননাত্মক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। ঋগ্বেদে তাই দেখা যায় যজ্ঞাগ্নির কাছে বারে বারে প্রজা ও পশু কামনা করা হয়েছে। সম্ভবত পশু পালক যুগের প্রথম দিকে প্রজননাত্মক ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করে তা পূর্ববর্তী অগ্নি মন্থন পদ্ধতিতে জাত আগুনের উপর প্রতিফলিত হয়। অনুরূপ ধারণা আমরা আদিম যুগের বিশ্বাসে অনেক দেখতে পাই। নারীও পুরুষের মৈথুনে সন্তান উৎপন্ন হয় সুতরাং ক্ষেতে মৈথুন করলে এই প্রজনন শক্তি সেখানেও সঞ্চারিত হবে এই সদৃশ যাদু বিশ্বাস থেকে প্রজনন কৃত্য প্রচলিত হয়েছিল। পেরুর ইণ্ডিয়ানরা—প্রজনন কৃত্যমূলক উৎসবে পাঁচ দিন সংযমের পর নগ্ন পুরুষেরা ফল বাগানের দিকে দৌড়ায়। পথে যে কোন নারী ধর্ষণ করে।[৪৮] উগাণ্ডায় যমজ সন্তানের মা কলা বাগানে চিত হয়ে শুয়ে যোনির উপর একটি কলার ফুল রাখে, তার স্বামী লিঙ্গ দিয়ে ফুলটি মাটিতে ফেলে দেয়।[৪৯] এই ভাবে রমণীর প্রজনন শক্তি কলা বাগানে সঞ্চারিত করা হয়। মধ্য আমেরিকার পিপিলারা বীজবপনের চারদিন আগে থেকে পুরুষেরা স্ত্রীদের

৪৬। কৃষ্ণ যজুর্বেদের কাঠক সংহিতা ২৬।৭।২০

৪৭। শমীবৃক্ষ পরিবেষ্টিত অশ্বত্থ গাছ মিথুনাবদ্ধ বলেই মনে হয়।

৪৮। G. B Part I Vol. II pp 98 ৪৯। তদেব পৃঃ 102

থেকে পৃথক থাকে যাতে বীজবপনের দিন ক্ষেতে প্রবল কামনার সাথে মৈথুন করতে পারে। এমনকি ক্ষেতে সহবাস করার জন্যও লোক নিয়োগ করা হত।[৫০]

বৈদিক সাহিত্যে সর্বত্র যজ্ঞ এবং যজ্ঞের বিবিধ আচার ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে মৈথুনের তুলনা করা হয়েছে। মৈথুনের দ্বারা পশু ও সন্ততি জন্মে। যজ্ঞাগ্নি জ্বালানো হয় মৈথুন সদৃশ অনুষ্ঠানের দ্বারা অতএব সদৃশ যাদু-শক্তির দ্বারা যজ্ঞফল রূপে পশু এবং সন্ততিলাভ হবে—এই ছিল বিশ্বাস।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে দীক্ষনীয় ইষ্টি বিধানে আছে,—ঘৃতং চরুনির্বপেত যো অপ্রতিষ্ঠিত।[৫১] অর্থাৎ 'যে যজমান আপনাকে অপ্রতিষ্ঠিত[৫২] মনে করে সে ঘৃতপক্ব চরু নির্বপণ[৫৩] করিবে।'[৫৪]

'ঘৃত চরু দ্বারা সেই অপ্রতিষ্ঠার পরিহার হয়।' কারণ—তদ্যদ্ ঘৃতং তৎস্ত্রিয়ৈ পয়ো যে তণ্ডুলাস্তে পুংসস্তন্মিথুনং মিথুনেনৈবেনং তৎ প্রজয়া পশুভিঃ প্রজনয়তি প্রজাত্যৈ॥[৫৫]—তাহাতে (ঘৃতপক্ব চরুতে) যে ঘৃত আছে তাহা স্ত্রীর পয়ঃ (শোণিত স্বরূপ) আর যে তণ্ডুল আছে তাহা পুরুষের (রেত স্বরূপ), সেই ঘৃত তণ্ডুল মিথুন সদৃশ (সেই জন্য এই) মিথুন দ্বারাই ঘৃত তণ্ডুলময় চরু প্রদান দ্বারা ইহাকে (যজমানকে) সন্ততি দ্বারা ও পশু দ্বারা বর্ধিত করা হয়।[৫৬]—প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্য- এব বেদ।[৫৭]

—'যে ইহা জানে সে সন্ততি দ্বারা ও পশু দ্বারা বর্ধিত হয়।' দীক্ষান্তে যজমানকে দেব যজন গৃহ বা প্রাচীন বংশশালাতেই অবস্থান করতে হয়। একে গর্ভবাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

যোনির্বা এষা দীক্ষিতস্য যদ্দীক্ষিতবিমিতং যোনি মেধেনং তৎ স্বাং

৫০। তদেব পৃঃ 97

৫১। ঐ, ব্রা ১।১।১

৫২। 'অপ্রতিষ্ঠিত অর্থে পুত্রাদিরহিত ও গবাদিরহিত।'

৫৩। শকটস্থিত ধান্য রাশি হইতে পুরোডাশ তৈরি করার জন্য চারি মুষ্টি ধান্য লইয়া শূর্পে (কুলায়) রাখার নাম নির্বপণ। বিশেষ অনুষ্ঠানে যে আহুতি দেওয়া হয় তাকেও বলা হয় নির্বপণ।—রামেন্দ্র রচনাবলী ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৫।

৫৪। রা, র ৫ম পৃঃ ৬ ৫৫। ঐ ব্রা ১।১।৮ ৫৬। রা, র ৫ম পৃঃ ৭

৫৭। ঐ ব্রা, ১।১।১

প্রপাদয়ন্তি।[৫৮]—'এই যে দীক্ষিতের জন্য নির্মিত প্রাচীন বংশশালা ইহা দীক্ষিতের পক্ষে যোনি স্বরূপই তজ্জন্য ইহাকে (প্রাণ স্বরূপ যজমানকে) আপনার যোনিতেই (গর্ভবাস স্থানে) প্রবেশ করান হয়।'[৫৯]

ভাষ্যে সায়ন বলেছেন—প্রাচীন বংশস্য যোনিত্বোপচারাত্তেন প্রাচীন বংশ প্রবেশেন স্বকীয় যোনি প্রবেশ সংপদ্যতে।[৬০]

যেমন মাতৃগর্ভ থেকে জাতকের জন্ম হয় তেমনি দীক্ষান্তে যেন গর্ভ-বাসান্তে নবজন্ম এবং তাব আচরণীয় সব কিছুই সন্তান জন্মের আনুষঙ্গিকেব সদৃশ। যেমন—

মুষ্টী বৈ কৃত্বা গর্ভোঽন্তঃ শেতে মুষ্টী কৃত্বা কুমারো জায়তে তদ্যন্মুষ্টী কুরুতে যজ্ঞং চৈব তৎ সর্বাশ্চ দেবতা মুষ্টয়ো কুরুতে।[৬১]—'গর্ভে মুষ্টি কবিয়া অভ্যন্তবে (দেবযজন গৃহে) শয়ান থাকে, কুমার (নবপ্রসূত শিশু) মুষ্টি করিয়া জন্ম গ্রহণ করে অতএব এই যে যজমান মুষ্টি করিবে, ইহাতে যজ্ঞকে ও সকল দেবতাকে মুষ্টি মধ্যে ধরা যায়।'[৬২]

সোম যাগেব[৬৩] প্রাতঃসবনে[৬৪] হোতা যে আজ্যশস্ত্র[৬৫] পাঠ করেন

৫৮। ঐ ব্রা ১।১।৩ ৫৯। রা, র ৫খ পৃঃ ১২

৬০। ঐ ব্রা (আনন্দাশ্রম সং) ৬১। ঐ ব্রা ১।১।৩

৬২। রা, র ৫খ পৃঃ ১৪, ঐ ব্রা—আনন্দাশ্রম সং পৃঃ ২০ তুলনীয়

৬৩। সোমযাগ—একটি যজ্ঞ। দেবতাকে আহ্বান করে তাঁর উদ্দেশে সোমরস আহুতি দানই এর প্রধান কৃত্য। অগ্নিষ্টোম, সোমযাগের প্রকৃতি। এই যজ্ঞে তিনটি সবন। প্রাতঃ, মাধ্যন্দিন ও তৃতীয়সবন—সকালে, দুপুরে আর সন্ধ্যায়। প্রত্যেক সবনেই সোমরস নিষ্কাশন বা অভিষব। সোমরস আহুতিদান ও সোমরস পান বিধেয়

৬৪। প্রাতঃ সবন—'সোমযাগের সোমলতা হইতে সোমরস নিষ্ক্রান্ত করিয়া ঐরস আহুতি দেওয়া হয় ও উহা ঋত্বিকেরা ও যজমান পান করেন। ইহাই সোমযাগের প্রধান অনুষ্ঠান। ইহার নাম সবন।' প্রাতঃকালে অনুষ্ঠের সবনই প্রাতঃসবন।—রা, র ৫খ ১৩৭ পৃঃ

৬৫। আজ্যশস্ত্র—প্রাতঃ সবনে হোতা যে প্রথম শস্ত্র (দেবস্তুতি) পাঠ করেন তাহাই আজ্য শস্ত্র।

তার তিনটি পর্ব। প্রথমে আহাব[৬৬] যুক্ত তুষ্ণীং শংস[৬৭] পরে নিবিৎ[৬৮] ও তারপর সূক্ত পাঠ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সাতটি সূক্ত[৬৯] পাঠের বিধান আছে। সূক্তগুলির পাঠ রীতিকেও মৈথুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রথমে পদে বিহরতি তস্মাৎ উরূ বিহরতি
সমস্তত্যুত্তরে পদে তস্মাৎ পুমানূরূ সমস্যতি
তন্মিথুনং মিথুনমেব তদুক্থ মুখে করোতি প্রজাতৈঃ।[৭০]

ভাষ্যে সায়ন বলেছেন—দ্বয়ো পাদয়োর্মধ্যে বিহারং বিচ্ছেদংকৃত্বা পঠেৎ। যস্মাদত্র পাদয়োঃ পরস্পর বিয়োগস্তস্মাল্লোকেঽপি স্ত্রী সম্ভোগ কালে স্বকীয়ে উরূ বিহরতি বিযোজয়তি।...

রামেন্দ্র সুন্দর অনুবাদ করেছেন—

প্রথম ঋকে প্রথম দুই চরণের মধ্যে বিচ্ছেদ বিরাম দিবে, সেই জন্য (পুংসঙ্গমকালে) স্ত্রীলোকে উরুদ্বয় বিচ্ছিন্ন করে। (সেই প্রথম ঋকে) শেষ দুই চরণ সংযুক্ত করিবে। সেই জন্য (স্ত্রীসঙ্গমকালে) পুরুষে উরুদ্বয় যুক্ত করে। তাহারা (উভয়ে মিলিয়া) মিথুন হয়। এই জন্য উকথের (আজ্যশস্ত্রের) আরম্ভে এইরূপ মিথুন করা হয়। ইহাতে যজমানের জনন (উৎপত্তি) ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা (সমৃদ্ধ হইয়া) উৎপন্ন হয়।[৭১]

রামেন্দ্রসুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন—"প্রাতঃ সবনে আজ্যশস্ত্র পাঠে যজমানের পুনর্জন্ম লাভ হয়। ঐ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ জন্মদান ক্রিয়ার অনুরূপ। প্রথম অনুষ্ঠান হোতৃজপ রেতঃ সেকের অনুরূপ; পরবর্তী অনুষ্ঠান তুষ্ণীংশংসে রেতঃ মাতৃগর্ভে বিকৃত হইয়া ভ্রূণের আকৃতি গ্রহণ করে; তৎপরে নিবিৎ পাঠে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।"[৭২]

৬৬। আহাব—'শস্ত্রপাঠের আগে হোতা যে 'শোংসা বোম্' মন্ত্রে অধ্বর্যুকে আহ্বান করেন তাহাকে আহাব বলে।'

৬৭। তুষ্ণীংশংস—মনে মনে দেবতার স্তুতিপাঠ—ওঁ ভূরগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ এই মন্ত্র মনে মনে অবিরাম জপ করা।

৬৮। নিবিৎ—'শস্ত্রান্তর্গত সূক্তের মধ্যে কতিপয় সংক্ষিপ্ত পদযুক্ত মন্ত্র প্রক্ষেপ করিতে হয়।' উহার নাম নিবিৎমন্ত্র।

৬৯। ঋ ৩।১৩।১-৭ ৭০। ঐ, ব্রা ২।১০।৩

৭১। রা, র, ৫ম পৃঃ ১৬১ ৭২। ঐ ব্রা পৃঃ ১৬৭

"আহূয় তুষ্ণীং শংসংশংসতি রেত স্তৎসিক্তং
বিকরোতি সিক্তির্বা অগ্রেহথ বিকৃতিঃ।"[৭৩]

"শোংসাবোমিতি এই আহাব মন্ত্রের দ্বারা অধ্বর্যুকে আহ্বান করে তারপর তুষ্ণীংশংস পাঠ করবে।"

সায়ন বলেন—হোতৃজপেন সিক্তং রেতোঽনেন বিকরোতি পিণ্ডাত্মাকার বিকারং রেতাসি জনয়তি।—অর্থাৎ হোতৃজপকালে সিক্তরেত বিকার লাভ করে পিণ্ডাকার (শিশু) রেত থেকে জন্মে।

উপাংশু তুষ্ণীংশংসংশংসত্যুপাংশ্চিব বৈ রেতসঃ সিক্ত।[৭৪]—তুষ্ণীংশংস নিম্নস্বরে পাঠ্য কারণ রেতঃ সেক নিঃশব্দেই ঘটে।

'তুষ্ণীংশংসংশস্ত্বা পুরোরূচংশংসতি রেত স্তদ্বিকৃতং
প্রজনয়তি বিকৃতির্বা অগ্রেহথ জাতিঃ।'

উচ্চৈ পুরোরুচংশংসত্যুচ্চৈরেবৈনং তৎপ্রজনয়তি।[৭৫] "তুষ্ণীংশংস পাঠের পর পুরোরুক[৭৬] পাঠ করা হয়। তদ্বারা বিকৃত রেতঃ (শিশু রূপে) জন্ম লাভ করে। রেতঃ পূর্বে বিকৃত হয় পরে (শিশুর) জন্ম ঘটে। পুরোরুক উচ্চে পাঠ করা হয়। কেননা (জননীর প্রসব বেদনা হেতু) উচ্চধ্বনি সহকারেই (শিশুর) জন্ম ঘটে। দ্বাদশ পদাং পুরোরুচং শংসতি দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসবঃ। সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ সোঽস্য সর্বস্য প্রজনয়িতা স যোঽস্য সর্বস্য প্রজনয়িতা স এবৈনং তৎ প্রজয়া পশুভিঃ প্রজনয়তি প্রজাত্যৈ।[৭৭]

'দ্বাদশাংশ বিশিষ্ট পুরোরুক পাঠ করিবে। দ্বাদশ মাসেই সংবৎসর। সংবৎসরই প্রজাপতি, তিনিই এই সকলের জন্মদাতা। তিনিই এতদ্বারা (পুরোরুক পাঠে) এই যজমানকে প্রজাসহিত ও পশুসহিত (সমৃদ্ধ করিয়া) উৎপন্ন করেন। ইহাতে ঐ জন্মলাভই ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজা সহিত ও পশু সহিত (সমৃদ্ধ হইয়া) জন্ম লাভ করে।'[৭৮]

শতপথ ব্রাহ্মণে বিবিধ যজ্ঞকার্যের সঙ্গে মৈথুনের ব্যাপক তুলনা

৭৩। ঐ ব্রা ২।১০।৭ পৃঃ ২৭৬ ৭৪। ঐ ব্রা পৃঃ ২৭৬ ৭৫। ঐ ব্রা পৃঃ ২৭৭
৭৬। প্রবো দেবায় ইত্যাদি সূক্তের আগে পঠিত অগ্নির্দেবেভ্য নিবিদের নাম পুরোরুক। পুরতো রোচতে দীপ্যতে ইতি পুরোরুক—সায়ন
৭৭। ব্রা ব, ৫ম পৃঃ ১৬৮ ৭৮। ঐ ব্রা ২।১০।৭ পৃঃ ২৭৮

থেকেও একথা মনে করার অবকাশ আছে যে, উদ্ভবকালে যজ্ঞের সঙ্গে অন্তত অগ্নিমন্থনের সঙ্গে মৈথুনও সম্পাদিত হত।

"অনন্তর তাহারা পত্নীসংযাজ আরম্ভ করেন। প্রজা সমূহ যজ্ঞ হইতেই জাত হয় এবং যজ্ঞ হইতে জায়মান হইয়া মিথুন হইতে জাত হয়, এবং মিথুন হইতে জায়মান হইয়া যজ্ঞের অন্তে জাত হয়। অতএব লোকে ইহার (পত্নীসংযাজের) দ্বারা যজ্ঞের অন্তে উৎপাদক মিথুন ইহাদিগকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। এবং সেইজন্য যজ্ঞের অন্তে উৎপাদক মিথুন হইতে এই সমস্ত প্রজাজাত হইতেছে। সেই নিমিত্ত তাহারা পত্নী সংযাজ আরম্ভ করেন।"[৭৯]

"তাঁহারা তাহাতে (সেই কার্যে) অনুচ্চ স্বরে বিচরণ করেন (অর্থাৎ ব্যাপৃত হন) কেননা মিথুন অপ্রকাশ ভাবেই বিচবণ কবে এবং অনুচ্চ স্বর অপ্রকাশ। সেই জন্য তাহাবা তাহাতে অনুচ্চ স্বরেই বিচরণ করেন।"[৮০]

"দেবপত্নীগণকে যাগ করেন কেননা রেত পত্নী সমূহের যোনিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহা হইতে তাহা (পুত্রাদি রূপে) প্রজাত হয়। তিনি ইহা দ্বারা পত্নী সমূহে যোনিতে সিক্ত বেতকে প্রতিস্থাপিত করেন ও তাহা হইতে তাহা প্রজাত হয়।"[৮১]

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেও যজ্ঞকে মৈথুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'স্ত্রিয়ো বা অগ্নির বৈশ্বানরঃ, তস্যোপস্থং সমিদ্ যোনির জ্যোতির ইষ্যা ধূমোঽভিনন্দো বিস্ফুলিঙ্গাঃ স স্পর্শোঽঙ্গারা। তস্মিন এতস্মিন্নগ্নৌ বৈশ্বানরে ঽহরহ দেবা রেতো জুহ্বতি। তস্যা আহুতের্ হুতায়ৈ পুরুষম সম্ভবতি।'[৮২]

—স্ত্রীই অগ্নি বৈশ্বানর। তার উপস্থ হচ্ছে সমিধ যোনি হচ্ছে জ্যোতির শিখা, ধূম আনন্দ, স্ফুলিঙ্গ সমূহ সেই স্পর্শ, অঙ্গার। তাতে সেই অগ্নি বৈশ্বানরে দেবতারা অহরহ রেতঃ আহুতি দিতেছেন। সেই আহুতি থেকে পুরুষ জন্মে অর্থাৎ যেমন স্ত্রী সঙ্গম যজ্ঞ ও তেমনি। স্ত্রী সঙ্গমে সন্তান হয়

৭৯। শ, ব্রা ১।৭।৩।৫ বিধুশেখর শাস্ত্রী অনূদিত পৃঃ ২৫৮

৮০। শ, ব্রা ১।৭।৩।৮ ঐ   ৮১। শ ব্রা ১।৭।৩।১১ ঐ

৮২। জৈ, ব্রা ১ কাণ্ড | ৪৫ খণ্ড

সুতরাং যজ্ঞে দেবতারাও সন্তান পশু ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। এই সদৃশ যাদুই যজ্ঞের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও যজ্ঞের সঙ্গে মৈথুনের বিস্তৃত তুলনা করা হয়েছে। রাজা প্রবহণ জৈবলি ঋষি গৌতমের নিকট দৈব বিদ্যা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

যোষা বা অগ্নির্গৌতম তস্যা উপস্থ এবং সমিৎ লোমানি ধূমো যোনির্বর্চির্যদন্ত করোতি তেঽঙ্গরাঃ অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ তস্মিন এতস্মিন অগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষ সম্ভবতি স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে[৮৩]—হে গৌতম স্ত্রীলোকই অগ্নি। তার উপস্থই সমিৎ। লোম সমূহ ধূম, যোনি হচ্ছে শিখা তাতে যে মৈথুন করা হয় তাই হচ্ছে অঙ্গার সমূহ। সুখবোধ সমূহ স্ফুলিঙ্গ।[৮৪] এই আগুনে দেবতারা রেতঃ আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকে পুরুষ জন্মে। সে যতদিন আয়ু থাকে বেঁচে থাকে তারপর যখন (সময়) হয় মরে। অনুরূপ মন্ত্র ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে।[৮৫]

বৃহদারণ্যকে সমগ্র জগৎ, মানব জীবন এবং সৃষ্টি ব্যাপারকে যজ্ঞের উপকরণ ও আচারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সন্তান জন্মও। উপনিষদের পূর্ববর্তীকালে যজ্ঞের সঙ্গে যে প্রজননাত্মক কৃত্য সংযুক্ত ছিল তারই স্মৃতি এই সব তুলনায় আভাসিত হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ও যজ্ঞকে সবিস্তারে মৈথুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখানে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলনের সঙ্গে সাম গানের বিভিন্ন পর্যায়ের তুলনা আছে।—উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারঃ, জ্ঞাপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ, প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ, কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনম্, এতদ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম।[৮৬]

'উপমন্ত্রণ অর্থাৎ পুরুষ কোন স্ত্রীকে সঙ্কেত দ্বারা নিকটে আসার নিমিত্ত

৮৩। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত ৬।২।১৩

৮৪। সন্ন্যাসী গম্ভীরানন্দ এই অংশের অনুবাদ করেন নাই।

৮৫। ছা, উ ৫।৮।১-২

৮৬। ছা, উ ২।১৩।১ বসুমতী সং। অনুবাদ নলিনীনাথ রায় পৃঃ :৫৬

যে আহ্বান করে তাহাই হিঙ্কার[৮৭] জ্ঞপন অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারাদি দান ও প্রিয়বাক্য দ্বারা যে স্ত্রীলোকের সন্তোষ সাধন করে তাহাই প্রস্তাব। স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় যে শয়ন করে তাহাই উদ্গীথ। অনন্তর স্ত্রীর দিকে সম্মুখ করিয়া যে শয়ন করে তাহাই উদ্গীথ। অনন্তর স্ত্রীর দিকে সম্মুখ করিয়া যে শয়ন করে তাহাই প্রতিহার। ঐ ভাবে সঙ্গত হইয়া যে সময় অতিবাহিত করে, তাহাই নিধন এবং পার অর্থাৎ ঐ মৈথুন ব্যাপারের যে সমাপ্তি তাহাও নিধন কারণ উহাই ব্যাপারের শেষ, নিধনও সাম সমূহের মধ্যে শেষ। বায়ু ও জলের পরস্পর মৈথুন ভাবে সম্বন্ধ হইতে বামদেব্য সামের উৎপত্তি হওয়ায় এই বামদেব্য সাম মিথুনে প্রোত বা প্রতিষ্ঠিত।[৮৮] পূর্ববর্তী দ্বাদশ খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে সামগানের চার পর্যায়ের সঙ্গে অগ্নি মন্থনের ক্রিয়ার তুলনা দেখা যায়।

অভিমন্থতি স হিঙ্কারঃ ধূমো জায়তে স প্রস্তাবঃ, জ্বলতি স উদ্গীথঃ, অঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহারঃ, উপশাম্যতি তন্নিধনং সংশাম্যতি তন্নিধনম্ এতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতম্।[৮৯]

যে অভিমন্থন—অর্থাৎ অগ্নি উৎপাদনের নিমিত্ত কাষ্ঠে কাষ্ঠে যে মন্থন বা ঘর্ষণ করা হয়—তাহাই হিঙ্কার। সেই ঘর্ষণে যে ধূম নির্গত হয়, তাহাই প্রস্তাব। যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহাই উদগীথ। কাষ্ঠ ভস্মীভূত হইয়া যে অঙ্গার সমূহ হয় তাহাই প্রতিহার। অগ্নির যে উপশম অর্থাৎ অল্পতা প্রাপ্তি তাহাই নিধন আর যে সম্পূর্ণ রূপে নির্বাণ প্রাপ্তি তাহাও নিধন। এই রথন্তর সামটি অগ্নিতে প্রোত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত।[৯০] দেখা যাচ্ছে সামগানের চার পর্যায়ের সঙ্গে যজ্ঞাগ্নি মন্থন ক্রিয়া ও স্ত্রী-পুরুষ মৈথুন ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ তুলনা কেবল ক্রিয়া সাদৃশ্যে বলে মনে হয় না। আদিকালে অগ্নি মন্থন তথা যজ্ঞক্রিয়ার সঙ্গে যে প্রজননাত্মক

৮৭। সামগানের আদিতে যে হিম্ শব্দ করা হয় তার নাম হিঙ্কার। প্রস্তোতার গেয় অংশ প্রস্তাব, উদগাতার গেয় অংশের নাম উদ্গীথ। প্রতিহর্তার গেয় অংশের নাম প্রতিহার এবং অবশেষে তিনজনের একত্রে গেয় অংশের নাম নিধন।

৮৮। তদেব পৃঃ ১৩৩

৮৯। তদেব ২।১২।১ পৃঃ ১৩৪

৯০। তদেব পৃঃ ১৩৪

কৃত্য জড়িত ছিল এ তারই চিহ্ন বলে মনে হয়। এই তুলনার পরই তার ফলপ্রাপ্তির কথাও বলা হয়েছে।

স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ, মিথুনা ভবতি, মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি, মহান প্রজয়া পশুভির্ভবতি, মহান কীর্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদব্রতম্।[৯১]

সেই যিনি এই বামদেব্য সামকে মিথুনে প্রতিষ্ঠিত মনে করেন তিনি মিথুনে যুক্ত থাকেন। এই যুগলের প্রতিবার মিথুন থেকে সন্তান জন্মে। সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করে উজ্জ্বল জীবন যাপন করে। বহু সন্তান বহু পশু হয়। মহান কীর্তি লাভ হয়। কোন রমণীকে পরিত্যাগ করিবে না। এই হচ্ছে ব্রত। সুতরাং যজ্ঞ তথা অগ্নিমন্থন ছিল মূলত প্রজননাত্মক কৃত্য। যজুর্বেদে বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞের একটি প্রক্রিয়া এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে উকথ[৯২] পাঠের পর দুই মহিম নামক গ্রহ[৯৩] নিয়ে প্রজাপতির উদ্দেশে হোম করা হয়। তারপর রথে অশ্ব যোজনা, অশ্বকে আদিত্যের মতো স্তুতি। অতঃপর চার অশ্বযুক্ত রথে অধ্বর্যু এবং যজমান তড়াগাদি জলের নিকটে গিয়ে জলে প্রবিষ্ট অশ্বকে স্তুতি করবে। পুনরায় সেই পথে ফিরে আসবে। তখন দেব যজন গৃহে অশ্বকে রথ থেকে মুক্ত করে মহিষী (যজমানের বিবাহিতা প্রথমা স্ত্রী) বাবাতা (দ্বিতীয়া পত্নী) ও পরিবৃক্তা[৯৪] (তৃতীয়া পত্নী) যজমানেব (রাজার) এই তিন পত্নী ঘৃতের দ্বারা যথাক্রমে অশ্বের অগ্রভাগ মধ্যভাগ ও পশ্চাদভাগ অভ্যঞ্জন কববে। অতঃপর ব্রহ্মা ও হোতার উত্তর প্রত্যুত্তরের পর অশ্বহত্যা। অশ্বমেধের পর যজমান পত্নী জল নিয়ে এসে অশ্বেব চক্ষু নাসিকা শোধন করেন।

৯১। ছা, উ ২।১৩।২ বসুমতী সং

৯২। উকথ—স্তুতিবিশেষ। দেবতার প্রশংসা জ্ঞাপক মন্ত্র বা শস্ত্র।

৯৩। সোমযাগে দেবতার উদ্দেশে আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দেবার জন্য সোমরসের যে অংশ পাত্রে গৃহীত হয় তার নাম গ্রহ

৯৪। সায়ন বলেছেন—রাজ্ঞাংহি ত্রিবিধাঃ স্ত্রিয় স্তত্রোত্তমজাতের্মহিষীতি নাম। 'মধ্যমজাতে' বাবাতেতি। অধমজাতেঃ পরিবৃক্তিরিতি—ঐ, ব্রা (আনন্দ আশ্রম সং) পৃঃ ৩৪৪

অধ্বর্যু এবং যজমানও জল ঢেলে পশুর অন্যান্য অঙ্গ শোধন করে দেন। তারপর মহিষী মৃত অশ্বের পাশে শয়ন করেন। তখন এই মন্ত্র পাঠ হয়—

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে। প্রিয়াণাং
ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে। নিধীনাং ত্বা
নিধিপতিং হবামহে। বসো মম
আহমজানিগর্ভধমা ত্বমজাসিগর্ভধম॥[৯৫]

তিনজন পত্নী তিনবার মন্ত্র পাঠ করে অশ্বকে প্রদক্ষিণ করবে—"গণ দিগের মধ্যে তুমি গণপতি তোমাকে আহ্বান করি। প্রিয়দিগের মধ্যে তুমি প্রিয়পতি তোমাকে আহ্বান করি, নিধি সমূহের মধ্যে তুমি নিধিপতি, তোমাকে আহ্বান করি।"[৯৬] হে বসুরূপ অশ্ব তুমি আমার পালক হও। গর্ভধারক রেত আমি আকর্ষণ করছি তুমি তা ক্ষেপণ কর।

তারপর মহিষী—"হে অশ্ব তুমি আমার পতি হও গর্ভধারক রেত আমি আকর্ষণ করছি, তুমি তা ক্ষেপণ কর।" এই মন্ত্র পাঠ করে অশ্বের পাশে অশ্বকে আলিঙ্গন করে শয়ন করবে। তখন তাদের কাপড় দিয়ে ঢেকে অধ্বর্যু বলবেন—হে অশ্ব ও মহিষী তোমরা এই স্বর্গলোকে আচ্ছাদিত (যজ্ঞভূমিতে)। মহিষী স্বয়ং অশ্বের শিশ্ন আকর্ষণ করে বলবে—বৃষা বাজী রেতোধা রেতো দধাতু।[৯৭]—রেতোধারক হে অশ্ব (আমাতে) রেতঃ স্থাপন কর। তখন যজমান এই মন্ত্র পাঠ করবে—

উৎসক্থ্যা অবগুদং ধেহি সমঞ্জিং চারয়া বৃষণ যঃ স্ত্রীণাং জীব ভোজনং।[৯৮]

—হে বৃষণ (সেচনকারী অশ্ব) উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত মহিষীর গুদে লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে রেতঃ ধারণ কর, যা (লিঙ্গ যোনিতে প্রবেশ করলে) স্ত্রীদের

৯৫। শু, য, বাজসনেয়ি সংহিতা ২৩।১৯

৯৬। উবট এবং মহীধর গণপতি বলতে গণের পালক এবং প্রিয়পতি বলতে বল্লভ এবং নিধি বলতে সুখ নির্দেশ করেছেন।

৯৭। শু, য ২৩।২০ ৯৮। শু, য ২৩।২১

জীবন এবং ভোগসুখ লাভ হয়। [যস্মিন লিঙ্গে যোনৌ প্রবিষ্টে স্ত্রিয়ো জীবন্তি ভোগংশ্চ লভন্তে তং প্রবেশয়।[৯৯]]

তখন অধ্বর্যু ব্রহ্মা, উদগাতা হোতা প্রভৃতি ঋত্বিকগণ যজমানের পত্নীদের সঙ্গে অশ্লীল আলাপ আরম্ভ করে

যকাঽসকৌ শকুন্তিকাঽঽহলগিতি বঞ্চতি
আহন্তি গভে পসো নিগল্গলীতি ধারকা ॥[১০০]
—অধ্বর্যু ব্রহ্মোদগাতৃহোতৃক্ষত্তারঃ কুমারী পত্নীভিঃ
সহসোপহাসং সংবদন্তে। তত্র প্রথমধ্বর্যুঃ কুমারীং পৃচ্ছতি।

অঙ্গুল্যা যোনিং প্রদর্শয়ান্নাহ যদাভগে শিশ্নমাগচ্ছতি তদা ধারকা ধবতি লিঙ্গমিতি ধারকা নির্গলগলীতি নিতরাং গলতি বীর্য ক্ষরতি...[১০১]

—প্রথমে অধ্বর্যু কুমারীকে যোনি দেখিয়ে বলে ওটা পক্ষিণীর মতো হল হল শব্দ হয়। লিঙ্গ এসে ভগ স্পর্শ করে যোনিতে গলগল করে রেত পাত করে।

কুমারী পত্নী ও কম নন, তিনিও উত্তর দেন—

যকেঽসকৌ শকুন্তক আহলগিতি বঞ্চতি।
বিবক্ষত ইব তে মুখমধ্বর্যো মা নস্ত্বমভিভাষথঃ ॥[১০২]

—কুমারী অধ্বর্যু প্রত্যাহ। অঙ্গুল্যা শিশ্নং প্রদর্শয়ন্ত্যাহ। হে অধ্বর্যো যকঃ যঃ অসকৌ অসৌ শকুন্তকঃ পক্ষীব বিবক্ষতঃ বক্তুমিচ্ছতস্তে তব মুখমিব অহলগিতি বঞ্চতি ইতস্ততশ্চলতি অগ্রভাগে সছিদ্র লিঙ্গং তবমুখমিব ভাসতে। অতো নোঽস্মান প্রতি মা অভিভাষথাঃ মা বদ তুল্যত্বাৎ।[১০৩]

৯৯। সায়নভাষ্য।
(যাজক রীফিত (T. Riffith) সমগ্র যজুর্বেদের অনুবাদ করলেও সম্ভবত রুচির মুখ রক্ষা করতে গিয়ে এই মন্ত্র এবং পরবর্তী মন্ত্রের অনুবাদ থেকে বিরত হয়েছেন।

১০০। শু, য ২৩/২২ ১০১। মহীধরভাষ্য ॥ নির্ণয়সাগর সং পৃঃ ৪৩৬-৩৭

১০২। শু, য—মহীধরভাষ্য তদেব

১০৩। India From Primitive Communism to Slavery—S, A Dange

(কুমারী অধ্বর্যুকে অঙ্গুলি দিয়ে লিঙ্গ দেখিয়ে বলল—হে অধ্বর্যু ঐ পাখির মতো শব্দকারী যে, বলতে ইচ্ছুক, তোমার মুখের মতো দ্রুত হলহল শব্দ করে ইতস্তত চলছে। অগ্রভাগে সচ্ছিদ্র লিঙ্গ তোমার মুখের মতো দীপ্ত দেখাচ্ছে অতএব আমার প্রতি ঐরূপ কথা বলো না।)

ইত্যাদি আরো কয়েকটি মন্ত্রে ব্রহ্মা মহিষী, উদগাতা বাবাতার মৈথুনাত্মক সংলাপ যজুর্বেদের ২৩ অধ্যায়ে আছে। বাহুল্য বোধে সেগুলি বাদ দেওয়া গেল। শুক্ল যজুর্বেদের অশ্বমেধ অধ্যায়ে এবং অন্যত্র উল্লেখ থেকে বোধহয় এই অনুমান সঙ্গত যে যজ্ঞকালে বিশেষত অগ্নিমন্থনের সময় বেদমন্ত্র রচনাকালে বা তার অব্যবহিত পূর্বে প্রকৃত মৈথুন বা মৈথুনের অভিনয় করা হত।

নারী ও পুরুষের মৈথুনের ফলে সন্তানেব জন্ম হয় তাই মৈথুনের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস আদিম সমাজে বিশেষত পশুপালক সমাজে গড়ে উঠেছিল। পশু সৃষ্টি এবং ফসল উৎপাদনের পিছনেও এই অলৌকিক শক্তি ক্রিয়াশীল—যা প্রকৃত মৈথুনের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করা যায়—সম্ভবত এই ছিল তাদের বিশ্বাস। সদৃশ কার্য সদৃশ ফল প্রসব করে এই যাদু বিশ্বাসই ছিল আদিম সংস্কৃতির এক প্রধান তত্ত্ব। ফ্রেজার ও বলেছেন—

So completely in the Hindu mind, does the process of making fire by friction blend with the union of the human sexes that it is actually employed as part of a charm to procure male offspring.

—G. B. Part I, Vol. I pp 250

দেবীপ্রসাদ এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এস. এ. ডাঙ্গে যজ্ঞকে collective mode of production[১০৪] —যজ্ঞ 'অন্ন উৎপাদনের বা অন্ন আহরণের কৌশল' বলে উল্লেখ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্য সঙ্গত বলে মনে হয় না। দেবীপ্রসাদও কিন্তু

১০৪। লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১০৬

একথা স্বীকার করেছেন যে, "অনেক জায়গায় দেখা যায় প্রাচীনেরা মৈথুনকেও সরাসরি যজ্ঞের মতোই মনে করেছিলেন।" ১০৫

বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রে দেখা যায় উর্বশীতে নিষিক্ত পুরূরবার রেত নতুন কলসী করে মাটিতে পুতে ফেলা হয়েছিল। তা থেকে মিথুনাবদ্ধ নারী-পুরুষের মতো শমী আলিঙ্গিত অশ্বত্থ জন্মেছিল।[১০৬] তার থেকে যে অরণি করা হয়েছিল সে গুলিকে উর্বশীর আয়ু হও, পুরূরবা হও ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতাপুত্রেব নামগ্রহণ করেছে।[১০৭] অর্থাৎ অরণিদ্বয়ের নাম পুরূরবা ও উর্বশী ও মন্থন জাত আগুনের নাম হয়েছে আয়ু। আদি নারী ও পুরুষের সঙ্গমের রেত থেকে যে শমীপরিবৃত অশ্বত্থ গাছ জন্মেছিল তা থেকে তৈরি অরণিতে যেমন সেই প্রজনন শক্তি নিহিত তেমনি সেই অরণিদ্বয় মন্থন-জাত আগুনে অলৌকিক প্রজনন ক্ষমতা বর্তমান!—এই ছিল বিশ্বাস।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর বোধ হয় কেউই এই উপাখ্যানেব বৈদিকরূপ নিয়ে মাথা ঘামান নাই। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই উর্বশী-পুরূববা উপাখ্যানের যাজ্ঞিক ব্যাখ্যাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থেব সপ্তদশ পবিচ্ছেদে ইতিহাসেব পৌর্বাপর্য বোঝাতে গিয়ে তিনি যজুর্বেদেব উর্বশী-পুরূববা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

"ইহার প্রথমাবস্থা যজুর্বেদ সংহিতায়। তথায় উর্বশী-পুরূরবা দুইখানি অরণি কাষ্ঠ মাত্র। বৈদিক কালে দিয়াশলাই ছিলনা, চকমকি ছিলনা, অন্তত যজ্ঞাগ্নিব জন্য এ সকল ব্যবহৃত হইত না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যাজ্ঞিক অগ্নিব উৎপাদন করিতে হইত। ইহাকে বলিত "অগ্নিচয়ন।"

অতঃপর তিনি শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতার (মাধ্যন্দিনী শাখার) পঞ্চম

১০৫। the male fire stick was cut by preference from a sacred fig tree which grew as a parasite on a sami or female tree. ...A parasite clasping a tree with its tendrils is conceived as a man embracing a woman—G, B. Vol I part I pp 250

১০৬। বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ১৮।৪৫
'তস্যারণী চক্রিরে অয়ং বাব স যজ্ঞ ইত্যথো খলু য এব কশ্চাশ্বত্থঃ স শমীগর্ভঃ স যদাহোর্বশ্যায়ুরসি পুরূরবা ইত্যেতেষামেবৈতৎ পিতা পুত্রাণাং নামানি গৃহ্ণাত্যথো সামান্যমেবৈতদ্বহেন।'

১০৭। কৃষ্ণ চরিত্র—বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যসংসদ

অধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ডিকার তৃতীয় ও পঞ্চম মন্ত্রের সত্যব্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ উদ্ধার করেছেন।

"হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম উর্বশী"।

বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন—(উৎপত্তির জন্য কেবল স্ত্রী নহে পুরুষ ও চাই। এ জন্য উক্ত স্ত্রীকল্পিত অরণির উপর দ্বিতীয় অরণি স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে।)

"হে অরণে। অগ্নির উৎপত্তিব জন্য আমরা তোমাকে পুরুষ রূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম পুরূরবা।"[১০৮] চতুর্থমন্ত্রে অরণি স্পৃষ্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আয়ু।

এই অনুবাদ সর্বাংশে আক্ষরিক নয়। দেখা যাচ্ছে উত্তরারণিকে পুরুষ রূপে পুরূরবা এবং অধরারণিকে স্ত্রী রূপে উর্বশী নাম এখানেও স্বীকৃত যা আমাদের সিদ্ধান্তের অনুমত। তবে আজ্য আয়ু নয়, রেত (রেতো ঘৃতম্)। আয়ু হচ্ছে অরণি মন্থন জাত অগ্নি। দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র মন্ত্রটির যাজ্ঞিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—"এখানে উর্বশী পুরূরবা আর অরণি কাষ্ঠ নহে ইহারা নায়ক নায়িকা। পুরূরবা উর্বশীর বিরহশঙ্কিত। এই রূপকাবস্থা। রূপকে উর্বশী (৫ম ঋকে) বলিতেছেন, "হে পুরূরবা, তুমি প্রতিদিন আমাকে তিনবার রমণ করিতে।" যজ্ঞের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে। পুরূরবাকে উর্বশী "ইলাপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইলাশব্দের অর্থ পৃথিবী। পৃথিবীরই পুত্র অরণি কাষ্ঠ।" বঙ্কিমচন্দ্র এমনকি উর্বশী পুরূরবা সংবাদ সূক্তের কাহিনী ও যজ্ঞাগ্নি মন্থন সম্পর্কিত অরণি নাম থেকে উদ্ভূত মনে করেন। এবং ম্যাক্সমূলর কথিত Solar myth এর ভাষ্যকে উপেক্ষা করেছেন।[১০৯]

১০৮। বঙ্কিম রচনাবলী—কৃষ্ণ চরিত্র ১৭শ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৪৪৪

১০৯। "মক্ষমলর প্রভৃতি এই রূপকের অর্থ করেন, উর্বশী ঊষা, পুরূরবা সূর্য। Solar myth এই পণ্ডিতেরা কোন মতেই ছাড়িতে পারেন না। যজুর্বেদ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এবং তিনবার সংসর্গের কথায় পাঠক বুঝিবেন যে এই রূপকের প্রকৃত অর্থ উপরে লিখিত হইল। কৃষ্ণ চরিত্র, তদেব, ৪৪৪ পৃঃ পাঃ

উর্বশী শব্দটি যে আদি নারী অর্থে ব্যবহৃত তা যাস্কের নিরুক্তের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়। নিরুক্তে যাস্ক ৪র্থ বা ৬ষ্ঠ শতকে বিভিন্ন বৈদিক শব্দের গঠন বিশ্লেষণ করে তার অর্থ নির্দেশ করেছেন। উর্বশী শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন—উর্বশ্যাপ্সরা উর্বভ্যশ্নুত উরুভ্যামশ্নুত উরুর্বাবশোঽস্য।[১১০] অধ্যাপক অমরেশ্বর ঠাকুর অনুবাদ করেছেন—উর্বশী = অপ্সরা উরুঅভ্যশ্নুতে (মহৎযশ অভিব্যাপ্ত করে) উরুভ্যাম অশ্নুতে (উরুদ্বয়ের দ্বারা সম্ভোগ কালে পুরুষকে ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ বশীভূত করে) বা (অথবা) অস্যাঃ ইহার উরুবশঃ (মহান কাম)।

উর্বশী শব্দের অর্থ তখনই বিস্মৃত বলে বলা হয়েছে উর্বশী অপ্সরা বিশেষ। উর্বশী শব্দের ব্যুৎপত্তি—

(১) উরু অর্থাৎ মহৎ যশ ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ মহাযশের অধিকারিণী। উরু + অশ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উর্বাশিনী = উর্বশী।

(২) মৈথুন কালে উরুদ্বয়ের দ্বারা পুরুষকে (পুরূরবা ?) ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ বশীভূত করে। [সম্ভোগ কালে কামিনং বশী করোতি]—(স্কন্দস্বামী)। শব্দকল্পদ্রুমেও এর প্রতিধ্বনি দেখি—উর্বশী—স্ত্রী (উরূন মহতোঽপি অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি বশী করণীতি। অর্থাৎ উর্বশী অর্থ নারী আর পুরূরবা অর্থও বোধ হয় পুরুষ।

একজন পাশ্চাত্য লেখকও অনুমান করেছেন :—

Thus I think we can regard the fire incident of the story of Pururavas and Urvasi as showing the great symbolical significance of fire-sacrifice as a means of attaining swarga, the abode of the blessed and ensuring a final state of immortality.[১১১]

১১০। Yaska's Nirukta, Part II অমরেশ্বর ঠাকুর অনূদিত ও সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১১১। The Ocean of story translation of Somadeva's Katha-saritsagar by C. H. Towne's. Now edited with introduction, Fresh explanation Notes and Terminal essays by N. M. Penzer M-A. FRGS, FGS with foreward by Sir George A Grierson K-C. I. E, Ph D. D. Lit Appendix I p 257

এই লেখকও সিদ্ধান্ত করেছেন যে, উর্বশী উপাখ্যান গড়ে উঠেছে যজ্ঞ মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়োজনে কেননা তিনিও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষত ফ্রেজার কৃত সিদ্ধান্ত অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন,

It seems rather as if the Urvasi at a later date, and merely introduced to show the importance of scrificial fires as initiatory rites to the final attainment of immortality.[১১২]

পূর্ববর্তী বিস্তৃত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হবে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলন তথা যজ্ঞকার্যের মধ্যে প্রজনন শক্তির উপাসনাও ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয়েছিল। সন্তান ও পশু কামনায় যজ্ঞকালে সম্ভবত বাস্তব মৈথুনের বা পরে তার অভিনয় ও কোন কালে অঙ্গীভূত হয় এবং আদি পুরুষ ও আদি নারী রূপে অরণিদ্বয়ের পুরূরবা ও উর্বশী নামকরণে মধ্য দিয়েই এই উপাখ্যানের আদি উদ্ভব হয়েছিল।

১১২। তদেব পৃঃ ২৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

অতিকথা (Mythology) মুলক ব্যাখ্যা

উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানটি একটি মীথ (myth) বা অতিকথা মূলক আখ্যায়িকা। সুতরাং এর অতিকথা মূলক তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টিপাত আবশ্যক। কেউ কেউ সংস্কৃত পুরাণ কথাটি মীথোলজি বা অতিকথার সমার্থক মনে করেন। বহুলাংশে মিল থাকলেও পুরাণ অতিকথা থেকে পৃথক। পুরাণ কথাটি পুরাবাচক 'পুরাভবম্ ইতি পুরাণম্'—অর্থাৎ পুরাকালে সংঘটিত কাহিনীর সঞ্চয়ই পুরাণ। বৈদিক যুগের রাজা ও ঋষিদের বিস্তৃততর পরিচয় ও বিবরণই বিভিন্ন পুরাণে সংকলিত আছে। 'সংস্কৃত সাহিত্যে পুরাণ বলতে যে একশ্রেণীর গ্রন্থাদি আছে যা সর্বাংশে মীথোলজি নয় কিছু পরিমাণে ইতিবৃত্ত।'[১] দেবতাদের বিচিত্র কাহিনী ছাড়াও ভারতের রাজাদের কিম্বদন্তী মূলক কালানুক্রমিক ইতিহাসও আছে। পুরাণের বিভিন্ন লক্ষণ হচ্ছে,

> সর্গশ্চ প্রতি সর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরানিচ।
> বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥[২]

সর্গ মানে সৃষ্টি, প্রতিসর্গ হচ্ছে প্রলয়, বংশ বলতে রাজা ঋষি দেবতা ও দৈত্য বংশের বর্ণনা, মন্বন্তর হচ্ছে বিশিষ্ট মনুর কাল বা বিশেষ যুগ, আর বংশানু-চরিত মানে বিভিন্ন বংশের কীর্তি কাহিনীর বর্ণনা। সুতরাং পুরাণ কিছু পরিমাণে ইতিহাসও—পরম্পরাগত কিম্বদন্তীমূলক ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মীথোলজি বা অতিকথা ঠিক তা নয়। সুতরাং পারিভাষিক প্রতিশব্দরূপে 'পুরাণ' শব্দের ব্যবহার চলে না। হিন্দীতে[৩] কেউ কেউ মীথোলজি অর্থে 'দেবশাস্ত্র' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাতে অর্থের সঙ্কোচ ঘটে কেননা মীথোলজি ত শুধু দেবকাহিনী নয়। রূপকথা ও উপকথার সাদৃশ্যে

১। গিরিন্দ্র শেখর বসু বিরচিত পুরাণ প্রবেশিকা

২। বায়ু পুরাণ ৪/১০

৩। ম্যাকডোনেলের Vedic Mythology-র হিন্দী অনুবাদের নাম অনুবাদক সূর্যকান্ত করেছেন 'বৈদিক দেবশাস্ত্র।'

অতিকথা কথাটি সুপ্রযোজ্য। মীথের যে কাহিনী রূপ আছে তা কথা দ্বারা বোঝান যায়। আর এই কাহিনী যে রূপকথা, উপকথা বা সাধারণ আখ্যান নয় তা এই 'অতি' বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত।

ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের বিশ্বকোষে মীথোলজি বা অতিকথার সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে—সাধারণত অতিকথা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে বর্ণনামূলক একটি কাহিনী। সাধারণ কাহিনীর সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে সত্যতায়। অন্তত যাদের মধ্যে কাহিনীটি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল তারা একে সত্য বলেই মনে করে। এদিক দিয়ে এগুলি নীতিকথা বা রূপক (parable or allegory) এবং উপন্যাস ও রোমান্স থেকে পৃথক। তাছাড়া অধিকাংশ অতিকথা আচারমূলক অর্থাৎ সেগুলি সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ বিশ্বাস বা যাদুক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে।[৪] প্রদত্ত এই সংজ্ঞায় অতিকথার তিনটি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। (১) অতিকথা বর্ণনামূলক কাহিনী (২) এ কাহিনী ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিজড়িত (৩) কোন আচার বা ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যাখ্যা। তাছাড়া এর সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব বা কোন কিছুর উদ্ভব রহস্যের বর্ণনাও থাকে। উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানে এই সব লক্ষণই বর্তমান।

ইংরেজি mythology শব্দটি গ্রীক মিথোস এবং লোগাস শব্দদ্বয়ের সমবায়ে গঠিত। উভয় গ্রীক পদেরই অর্থ কথা বা কাহিনী। পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন জাতি ও কৌমের মধ্যে প্রচলিত অতিকথার যত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেগুলি সবই ছোট বা বড় কাহিনীমূলক। কাহিনী মাত্রে বর্ণনামূলক এবং ভাষাশ্রয়ী। সুতরাং অতিকথার সঙ্গে ভাষার উদ্ভবের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। এমনকি ভাষাও অতিকথাকে যমজ মনে করা হয়।[৫] 'ভাষা হচ্ছে চিন্তার

৪। Encyclopaedia of Relgions and Ethics Vol-IX edited by James Hastings pp. 118

৫। The two oldest of these modes seem to be language and myth. Since both are of prehistoric birth, we cannot fix the age of either, but there are many reasons for regarding them as twin creatures,

—Language, by Otto Jesperson. G. Allen & Unwin 11th impression pp 30

প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ' আর চিন্তা হচ্ছে বাক্যরূপা। ভাষা উদ্ভবের আদি যুগে বিচ্ছিন্ন ধ্বনি বা দু একটি অর্থবোধক শব্দ দিয়ে চলত ভাব প্রকাশের কাজ। তারপর অসংলগ্ন শব্দগুলি একত্র গ্রথিত করে সৃষ্টি হয়েছে পূর্ণ অর্থবোধক বাক্য—তাই ভাষা। বাক্য সৃষ্টি থেকেই ধরা যায় অতিকথা বা মীথ সৃষ্টির কাল। বাক্যই আদিকাব্য বা আদি অতিকথা।

ভাষা সৃষ্টি হয়েছে মানুষের শ্রম উদ্ভবের সূচনা থেকে। ভাষাই বাহ্য বস্তুর সঙ্গে, অপর মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপন করেছে এবং মানুষকে চিন্তা করতে শিখিয়েছে। এই চিন্তার পিছনে যে প্রেরণা কাজ করেছে তা হচ্ছে বিশ্বের পশ্চাদ্বর্তী যে সদসদ্ নিরপেক্ষ শক্তি ক্রিয়াশীল[৬], মানব চেতনায় প্রবৃত্তি রূপে তাই সক্রিয়। অবচেতন মনে রক্ষিত সমাজ চেতনা তথা প্রবৃত্তি গৃহীত বাহ্যজীবনের যে রূপ ছদ্মবেশে সজ্ঞান মন হয়ে ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাই হচ্ছে মীথ বা অতিকথা। একে বোধ হয় জাগ্রত স্বপ্নও বলা যায়—যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধে সংবদ্ধ নয়, অনেকাংশে গোষ্ঠীগত। মানুষ যেমন আপন অভিজ্ঞতাকে বাহ্য জগতে অভিক্ষেপ করে তেমনি বাহ্য প্রাকৃতিক ঘটনাকেও আপন অন্তর্জগতে আরোপ করে থাকে। এইভাবে বাইরের প্রকৃতিকে আপন উপলব্ধি দিয়ে প্রকাশ করতে যে শব্দ সমূহ, বাক্যাংশ বা বাক্য ব্যবহার করেছে তাই হচ্ছে প্রাথমিক মীথ বা অতিকথা। যেমন—সূর্য ঘুমাচ্ছে, হিরণ্যপাণি সবিতা, ত্রিপাদগামী বিষ্ণু, পথপ্রদর্শক পুষা ইত্যাদি একই সূর্যের বিচিত্র রূপ বর্ণনা করতে যে সব শব্দ বা বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী কালে তার অর্থ ভুলে সেই সব শব্দ অবলম্বন করে নতুন দৈবসত্তা গড়ে উঠেছে। উদয়কালীন সূর্যের সোনালী বিভাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে সবিতা, সকাল বিকাল সন্ধ্যা ত্রিপাদগামী সূর্য বিষ্ণু, পশুপালকদের পথপ্রদর্শক সূর্য—পুষা ইত্যাদি।

জর্জ উইলিয়ম কক্সের মতে এসব হচ্ছে দ্বিতীয়স্তরের মীথ বা অতিকথা।[৭]

৬। ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীং স্তং বুদ্ধির্বোধ লক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টি স্তথা তুষ্টি ত্বং শান্তিক্ষান্তিরেব চ॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৮০

৭। The Mythology of the Aryan Nations by G. W. Cox

তাঁর মতে আদিম যুগের মানুষের চিন্তার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুনামকতা। এই বহুনামকতাই বহুতর অতিকথার বীজ।[৮] ম্যাক্সম্যুলরও মীথ বা অতিকথাকে প্রধানত ভাষাজাত বলেই মনে করেন। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের নির্দেশ করতে ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গের ব্যবহার এর একটা প্রমাণ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত অতিকথাকে তিনি 'ভাষার পীড়া' বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে একটা শব্দ হয়ত প্রথমে[৯] রূপকার্থে ব্যবহৃত হত, তার পর স্থানান্তর, কালান্তর বা উচ্চারণের পরিবর্তনের জন্য বা প্রাথমিক প্রেরণা বা তাৎপর্য ভুলে নতুন অর্থ বা তাৎপর্য দেখা দিত এবং এই ভাবে নতুনতর অতিকথা গড়ে উঠত।[১০] তিনি অদিতির উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথমে শব্দটি সম্ভবত উষাবাচক বা তার এক রূপ ছিল। পরে উষাকে ছাড়িয়ে অসীম অনন্ত—'ন দিতি' অর্থাৎ যা সসীম বা সীমাবদ্ধ নয়—অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উষার সুদূর প্রসারী মহিমা দেখা যায় স্বর্গমর্তের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

ব্যঞ্জতে দিবো অন্তেষ্বক্তূন্বিশো ন যুক্তা উষসোযতন্তে।[১১] ইত্যাদি বহু ঋক উদ্ধার করে ম্যাক্সম্যুলর আকাশ তথা উষাকে অবলম্বন করে অনন্তের ধারণার উদাহরণ দিয়েছেন। বস্তুত দেখা যায় আদিম মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম এক আকাশবাচী পরমেশ্বরের ধারণাই প্রচলিত ছিল। অবশ্য তাকে নিয়ে সম্ভবত কোন উপাসনা গড়ে ওঠে নি।[১২] পরে এই আকাশবাচী পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি অবলম্বনে নানা দেবদেবী গড়ে

৮। Thus in the Polyonym which was the result of the earliest form of human thought we have the germ of the great epics of later times and of the countless legends which makeup the rich store of mythical tradition, তদেব pp 23

৯। Natural Religion by F. M. Muller. 1889 pp 412

১০। Contribution on the Science of Mythology—F. M. Muller.

১১। ঋ 7/79/2 "Aditi, an ancient god or goddess invented to express the Infinite—F. M. Muller.

১২। Origin and Growth of Religion by W. Schmidt.

উঠেছিল।[১৩] দ্যৌঃ, অদিতি, ইন্দ্র, বরুণ, বিবস্বান বোধ হয় অশ্বিদ্বয়ও আকাশেরই নাম বিশেষ ছিল। ভারতোরপীয় ভাষাভাষীদের মধ্যে এই প্রাচীন আকাশদেব রূপে দ্যৌঃ বা দ্যু নামে প্রচলিত ছিল। গ্রীকদের জিউস (Zeus) লাতিনদের জুপিতর, জার্মানদের Tiu এই দ্যু শব্দেরই রূপান্তর। ঋগ্বেদে ইনি পিতা এবং পৃথিবী মাতা রূপে উল্লিখিত।[১৪] আবার অদিতি অর্থও যে আকাশ বা অসীম অনন্ত তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ঋকে অদিতিকেই দ্যৌ বা আকাশ, অন্তরীক্ষ, মাতা, পিতা, পুত্র সকল দেবতা ইত্যাদি বলা হয়েছে।[১৫] একটি ঋকে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে সহস্রাক্ষ। এখানে অগণ্য নক্ষত্রখচিত রাতের আকাশেরই স্মৃতি। সায়ন বলেছেন—'মৈত্রং বৈ অহোরিতি শ্রুতে। শ্রুয়তে চ বারুণী রাত্রী।' ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে অহো-র্বৈমিত্রোর্রাত্রির্বরুণঃ।[১৬] অর্থাৎ মিত্র দিনের আকাশ আর বরুণ রাতের আকাশ। আবার গ্রীক পুরাণের উরানোস (Uranous) বরুণেরই প্রতিরূপ —আকাশ দেবতা। আবার অশ্বিদ্বয় কে? যাস্ক নিরুক্তে বলেছেন—তৎকৌ অশ্বিনৌ। দ্যাবা পৃথিব্যোইতি একে। অহোরাত্রৌ একে।—অর্থাৎ কেউ বলে দ্যাবাপৃথিবী, কেউ বলে দিনরাত। অশ্বিদ্বয় বা নাসত্য আদি বৈদিক দেবতা, মিতান্নি চুক্তিতে উল্লিখিত।[১৭]

বেশ বোঝা যাচ্ছে বৈদিক যুগের মধ্যকালে বৈদিক নামের অর্থ বিস্মৃত। কোন শব্দ রূপকার্থে প্রথম ব্যবহার করা হয় পরে সেই মূল রূপক অর্থ ভুলে যাওয়ায় নতুন করে সেই শব্দের ধ্বনি ও গঠনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে গিয়ে নতুন অতিকথা দেখা দেয়। একেই মূল্যর ভাষার পীড়া বলে অভিহিত করেছেন। তা ছাড়া শব্দের মূল ধাতুর ভ্রান্ত ব্যুৎপত্তি থেকেও অতিকথা গড়ে

১৩। The Quest : History and Meaning in Religion by Mircia Eliade 1969 p 47

১৪। দ্যৌর্মে পিতা জানতা নাভিরত্রবন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্‌ ঋ ১।১৬৪।৩৩

১৫। অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। ঋ ১।৮৯।১০

১৬। ঐ ব্রা ৪।১৭।৫

১৭। খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে মিতান্নি রাজ আর্ত্তিতম এবং হিট্টাইট রাজের সন্ধি চুক্তি পাওয়া গিয়েছে বোগজকুই লিপিতে।

উঠেছে। যেমন ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে 'সহস্রাক্ষ'।[১৮] সহস্র নক্ষত্র খচিত রাতের আকাশই ছিল এর মূল তাৎপর্য। পরে পুরাণে আক্ষরিক অর্থে ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুর কারণ বোঝাতে নতুন কাহিনী গড়ে উঠেছে। আবার ইন্দ্রকে যেখানে শচীপতি বলা হয়েছে তার অর্থ যজ্ঞকর্তা ইন্দ্র। পরে পৌরাণিক যুগে ইন্দ্রের পত্নীর নাম শচী এই মর্মে আখ্যান রচিত হয়েছে।[১৯]

ম্যূলর যাকে ভাষার পীড়া বলেছেন জর্জ কক্স তাকে বিস্মৃতিজনিত বলে মনে করেছেন। অবশ্য দুজনের অভিমতে পার্থক্য খুব সামান্যই।[২০]

কক্স অতিকথার উদ্ভবের অপর ভাষাগত কারণ নির্দেশ করেছেন উভবাচিতা (equivocal)। একটি উদাহরণ দিয়েছেন তিনি।—Shine বা দীপ্তি বাচক কোন শব্দ থেকে সম্ভবত সপ্ত দীপ্তিমান বা seven shine নামকরণ হয়েছে সপ্তর্ষির। বোধ হয় একই ধাতু থেকে এসেছে স্বর্ণঋক্ষ বা Golden bear (Arkos বা Ursa)। জার্মানরা সিংহকে স্বর্ণ কেশরী বা Gold fusz বলে। এই বিশেষণ সম্ভবত কোন কোন কৌমে ভালুক সম্পর্কে ব্যবহৃত হত। সপ্তদীপ্তিমান এইভাবে পরিণত হয় সপ্তঋক্ষ-এ। ভারতে সম্ভবত ঋক্ষ শব্দের অর্থ বিস্মৃত হয়ে অথবা ধ্বনি সাম্যে সপ্তঋষি রূপে গৃহীত হয়েছে। গ্রীসে তা সপ্তজ্ঞানী—রোডস্ এবং হেলিঅসের সাত ছেলে। যাবা seven triones বলত তাদের পিতৃ পুরুষেরা এই নক্ষত্রগুলিকে বলত (তারস=stars)। সেকথা ভুলে এই নক্ষত্রমণ্ডলীর আকৃতি অনুযায়ী Bootes (গ্রীক Bowtes= নক্ষত্রমণ্ডলী) বা লাঙ্গল চালক বলতে থাকে। আবার টিউটনেরা—যারা আদি শব্দ stern অথবা star রেখেছিল তারাও—ভ্রান্ত ব্যুৎপত্তি করে আকৃতি অনুযায়ী Wagon বা Wain অর্থাৎ চার চাকার শস্য বহনকারী গাড়ি করে তোলে। আর্কাডিয়ান (গ্রীস) কাহিনীতে আছে আর্কাসের মা কালিস্তো হীরীর ঈর্ষায় ভালুকে পরিণত এবং নক্ষত্রমণ্ডলীতে আবদ্ধ হয়েছিল।

১৮। ঋ ১।২৩।৩

১৯। রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদানুবাদ ২য় সংস্করণে ১।৮২।৫ ঋকের টীকা দ্রঃ।

২০। But in all this there would be no disease of language. The failure would be that of memory alone—a failure inevitable— G. W. Cox-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থ pp 23

কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অতিকথা প্রসঙ্গে ম্যুলরের 'ভাষার পীড়া' বা কক্সের বিস্মৃতি তথা ভ্রান্ত ব্যুৎপত্তির কিছু তাৎপর্য থাকলেও, অতিকথার সৃষ্টির ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ নয়। ভাষাকে আশ্রয় করে অতিকথা প্রকাশিত হলে যে মন সে ভাষা উচ্চারণ করেছে তার রহস্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যারও প্রয়োজনীয়তা আছে। ম্যাক্সম্যুলর এবং কক্স উভয়েই কিন্তু অতিকথার উদ্ভব সম্পর্কে প্রকৃতিবাদী তত্ত্বে আস্থাশীল। এই প্রকৃতিবাদ মূলত E. B. Tylor-এর প্রাণবাদ বা animism তত্ত্বাশ্রয়ী। বিশ্বের তাবৎ পদার্থের মধ্যেই প্রাণের অস্তিত্বে আস্থা থেকেই জেগেছে প্রাকৃতিক শক্তির নরাকৃত দেবরূপের বিশ্বাস।

মানুষ যেমন প্রকৃতিতে মানবিক ক্রিয়া আচারের আরোপ করে তেমনি মানব অভিজ্ঞতাও উপলব্ধ হয়েছে প্রাকৃতিক ঘটনার সাদৃশ্যে। আর সর্বত্রই দেখা যায় আদিম মানুষেরা সব কিছুই জীবন্ত বা সপ্রাণ মনে করত। চেতন অচেতন প্রাকৃতিক শক্তি বা বস্তুতে প্রাণের আরোপ থেকে সৃষ্টি হয়েছে দেববাদ। সমস্ত প্রাচীন মানব সমাজেই দেখা যায় প্রাকৃতিক শক্তির দেব রূপের অর্চনা। ম্যুলরও বলেছেন—'অতি কথার সব বিবেচক ছাত্রই এই মৌলিক সত্য স্বীকার করবে যে দেবতারা আদিতে ছিল প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের ব্যক্তিরূপ।[২১]

প্রাচীন মিশরীয়দের নুট হচ্ছে আকাশ দেবী, হোরাস—নবীন সূর্য, থত—চন্দ্র দেবতা, আটন—সূর্য গোলক, গের হচ্ছে পৃথিবী দেবতা, রা—মধ্যাহ্ন সূর্য, মেণ্টু—উদিত সূর্য ইত্যাদি। প্রাচীনতম সভ্যতা সুমেরে অনু—আকাশ দেবতা, উতু হচ্ছে সূর্য, নান্নার হচ্ছে চাঁদ, এনলিন ঝড়ের দেবতা, নিনহুর সাগ হচ্ছে—পৃথিবী মাতা, শামাস ও মার্দুক সূর্য দেবতা। প্রাচীন গ্রীসে উরানুস আকাশ, জিউসও আকাশ দেব, আগেই বলেছি অ্যাপোলো, হেলিওস, ফয়থন, কেফালোস ছিল সূর্য দেবতার বিভিন্ন রূপ। ভারতের ঋগ্বেদের দেব-দেবীর কথাও আগেই বলেছি। প্রাচীন সভ্যতাসমূহে এই যে প্রাকৃতিক

২১। Contribution on the Science of Mythology by F. M. Muller Vol. I 1897 pp 74

শক্তিগুলিকে দেবরূপে উপাসনা করা হত এখানেই অতিকথা উদ্ভবের মূল সূত্র রয়েছে। ঋগ্বেদের দেবদেবী স্তুতিগুলি বিশ্লেষণ করলে প্রাকৃতিক শক্তির দেবায়নের পদ্ধতি স্পষ্ট হবে।[২২]

অনেক ঋকে সূর্যের প্রাকৃতিক রূপ সুস্পষ্ট, অনেক ঋকে আবার সূর্যের মানবিক রূপ গুণের আরোপ প্রাধান্য পেয়েছে। আবার অনেক ঋকে প্রাকৃতির শক্তির অধিষ্ঠাতা দেবরূপ ও গুণ অনুযায়ী ব্যবহৃত বিশেষণানুযায়ী বিভিন্ন নরাকৃতি দেবরূপ স্পষ্ট। আদিম যুগের মানুষেরা প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের কারণ অনুসন্ধানের পরিবর্তে অভিজ্ঞতা এবং জীবন প্রয়োজন অনুযায়ী কাহিনী রচনা করেছে। সূর্যের উদয়, মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি সমকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী কাহিনী রচনা করেছেন। এগুলিকেই বলা যায় দৈব অতিকথা।[২৩] কার্ল মার্ক্স ও বলেছেন অতিকথার প্রধান উৎস প্রকৃতি। All mythology masters and dominates and shapes the forces of nature in and through the imagination, hence it disappears as soon as man gains mastery over the forces of nature.[২৪]

আর এইসব প্রাকৃতিক অতিকথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকে সৃষ্টিকথা—উৎপত্তি রহস্য বা cosmogeny—যা অতিকথার একটি প্রধান প্রেরণা হলেও তা কাব্যিক নয়, নিতান্ত অস্তিত্বের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে। সৃষ্টির পশ্চাতে যে এক অজ্ঞেয় পরমশক্তি বর্তমান তারই বিচিত্র প্রকাশ এই বিশ্ব জগৎ। এই পবিত্রের প্রকাশ বলেই তা সত্য। এই জগৎ উদ্ভবের সঙ্গে পশু, পাখি, উদ্ভিদ ও মানুষের উদ্ভবও বিবৃত থাকে।[২৫]

২২। মৎ প্রণীত "ঋগ্বেদে প্রকৃতি", সংসদ পত্রিকা ১৯ বর্ষ আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যা ১৩৮৪-তে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য

২৩। The Mythology of Aryan Nations by Sir G. W. Cox. Chowkhamba 1870 Preface

২৪। A contribution to the critique of Political Economy.

২৫। Myth And Reality by Mircia Eliade G. Allen and Unwin

এই সৃষ্টি কাহিনীর অতিকথা কেবলমাত্র আবৃত্তি নয় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পুনরনুষ্ঠানও হয়। প্রাচীন সুমেরে প্রতি বছর নববর্ষ উপলক্ষে ১২ দিন ধরে যে উৎসব হত তাতে সৃষ্টিকাহিনীর পুনরাভিনয়ও হত। বস্তুত সব নববর্ষ উৎসব—বঙ্গদেশের গাজন—সৃষ্টি ক্রিয়ারই পুনরাবৃত্তি।[২৬] প্রতিটি অতি-কথাই কোন না কোন ধর্ম কৃত্য বা আচারের সঙ্গে সংযুক্ত দেখা যায়। এইসব অনুষ্ঠানে প্রায়ই পৃথিবী মানুষ, জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদি কোন না কোনটার উদ্ভব বা উৎপত্তির কারণ নির্দেশ থাকে কেননা উৎপত্তি না-জানা থাকলে কোন অনুষ্ঠানই কার্যকরী হয় না। আর উদ্ভব জানা না থাকলে তার উপর যাদু কর্তৃত্ব অর্জন করা যায় না। বঙ্গদেশের হিন্দুমহিলাদের ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, লক্ষ্মী ইত্যাদি ব্রতকথা এজাতীয় অনুষ্ঠান। তবে অধিকাংশ আদি অতিকথার মূলে ছিল অস্তিত্বের প্রয়োজনে কৃত নানা যাদুক্রিয়া। এইসব গোষ্ঠী কৃত্য ব্যাখ্যা করতেই গড়ে উঠেছে নানা অতিকথা। সাধারণ রূপকথা বা গল্প যখন ইচ্ছা বলা যায় অতিকথা তা নয়, সেগুলো একমাত্র কৃত্য উপলক্ষেই বলা হয়ে থাকে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে আদিম যুগে জীবন প্রয়োজনে আগুন জ্বালানো হত অরণি মন্থন করে। জীবনের প্রয়োজনেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রজননাত্মক ভাবনা। তার জন্য অরণি দুটিকে নারী ও পুরুষ বোঝাতে উর্বশী ও পুরূরবা নাম দেওয়া হয়েছিল। অগ্নিমন্থনকে তাদের মৈথুন এবং জাত অগ্নিকে তাদের পুত্র আয়ু বলে অভিহিত করা হয়েছে। তারপর কৃত্য বা অনুষ্ঠানের আদি উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে কৌমগুলি একত্র হবার কালে প্রাকৃত দেববাদের প্রভাবে সূর্য উষার প্রেম কাহিনী আরোপিত হয়ে বৈদিক কাহিনী গড়ে উঠেছে যার পূর্ণাঙ্গ রূপ পাই শতপথ ব্রাহ্মণে। পাঠক লক্ষ্য করবেন শতপথেও বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রে কাহিনীর উদ্দেশ্য যজ্ঞের উদ্ভব ব্যাখ্যা।

এইভাবে আমরা মানব সভ্যতা বিকাশের স্তরগুলির পরিচয় পাই। প্রথমে অস্তিত্বের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে নানা ক্রিয়া। আর এই সব কৃত্য ব্যাখ্যা করতে সৃষ্টি হয়েছে অতিকথা। অতিকথাই আদি সাহিত্য। কৃত্যের বাস্তব

২৬। Each new year begins the creation overagain—তদেব

প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও অতিকথা মূলক উপখ্যানটি রিকৃথ রূপে থেকেই যায়। তারপর সে কাহিনী যুগ সঙ্গত মানবিক রূপারোপের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে তার পরবর্তী রূপ—যার পরণতি সাহিত্যে।

অতিকথার, স্বরূপ সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনান্তে এখন উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানের অতিকথামূলক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমেই আচার্য ম্যাক্সমূলরের মতবাদ উপস্থিত করা হচ্ছে। তিনি উর্বশী-পুরূরবা সংবাদ সূক্তটিকে সূর্য উষা প্রণয় কাহিনী বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে উর্বশী যে পুরূরবাকে ভালোবাসে তার অর্থ সূর্যের উদয়। উর্বশী পুরূরবাকে নগ্ন দেখলেন মানে উষার বিলয়। উর্বশী আবার পুরূরবাকে দেখতে পেল মানে সূর্যের অস্তগমন।[২৭]

ঋগ্বেদের ১০।৯৫ সূক্তের ১৭শ ঋকে পুরূরবা উর্বশীকে বলেছে 'অন্তরিক্ষ পূর্ণকারিণী লাল মেঘের নির্মাতা।' এবং পুরূরবা নিজেকে বলেছে বসিষ্ঠ বা সূর্য।[২৮] উর্বশী নিজেকে বলেছে উষস।[২৯] তাছাড়া ঋগ্বেদের আর যে কটি স্থানে উর্বশীর উল্লেখ আছে সেখানেও তার সম্পর্কে উষার বিশেষণ ও ক্রিয়া সমূহ প্রযুক্ত দেখা যায়। যেমন পঞ্চম মণ্ডলে বলা হয়েছে 'উর্বশী বা বৃহদ্দিবা'[৩০] সপ্তম মণ্ডলে বসিষ্ঠের জন্ম কাহিনী আছে তা থেকেও উর্বশীর উষাত্ব প্রমাণিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে 'আরো হে বসিষ্ঠ তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মণ উর্বশীর মন হইতে তুমি জাত। তখন মিত্র ও বরুণের তেজ নির্গত হইয়াছিল। বিশ্বদেবগণ দৈব[৩১] স্তোত্র দ্বারা পুষ্কর মধ্যে তোমায় ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ উর্বশী বা উষার গর্ভে বসিষ্ঠ বা সূর্যের জন্ম। এই মন্ত্রের টীকায় রমেশচন্দ্র বলেছেন—

২৭। Comparative Mythology by Max Müller Edited by A. Smythe London George Routledge & Sons Ltd. pp 161

২৮। অন্তরীক্ষ প্রাং রজসো বিমানীম্ উপ শিক্ষাম্য উর্বশীং বসিষ্ঠঃ। ঋ ১০।৯৫।১৭

২৯। ঋ ১০।৯৫। ২, ৪

৩০। ঋ ৫।৪১।১৯

৩১। উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্মনসোঽধি জাতঃ।
দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বেদেবাঃ স্বাদদন্তে। ঋ ৭।৩৩।১১

সপ্তম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের "৯ হইতে ১৩ ঋকে বসিষ্ঠের জন্ম সম্পর্কে একটি বৈদিক আখ্যানের উল্লেখ আছে। বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র ও বসিষ্ঠ উর্বশী হইতে জাত। এই আখ্যানের প্রাকৃত তাৎপর্য কী? বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বসুতম অর্থাৎ উজ্জ্বলতম, অর্থাৎ সূর্য। মিত্র ও বরুণ অর্থে দিন ও রাত, উর্বশীর আদি অর্থ উষা। অতএব বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র এবং উর্বশী হইতে জাত।"[৩২] ঋগ্বেদের ভাষ্যকারেরা মিত্রকে দিনের আকাশ ও বরুণকে রাতের আকাশ বলে নির্দেশ করেছেন।[৩৩] এই কাহিনী আছে কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রে এবং বৃহদ্দেবতায়। বৃহদ্দেবতায় আছে—"যজ্ঞকালে আদিত্যদের দুজনে অপ্সরা উর্বশীকে দেখলে তাদের রেত স্খলিত হয়ে বসতীবরীর[৩৪] কুম্ভে পতিত হয়।[৩৫] কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রে উর্বশীর অভিশাপের কারণ রূপে যে পৌরাণিক কাহিনী পাই তাই রামায়ণে, ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে পাওয়া যায়। উর্বশীকে আকাশ কন্যা রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী বিচিত্র জ্যোতি অথবা দিনরাতের সঙ্গমকালের সান্ধ্যরাগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ম্যাক্সমূলর বলেছেন যে বৈদিক আর্যরা উর্বশী ও পুরূরবার নামের প্রকৃত অর্থ ভুলে গিয়েছিলেন।[৩৬] তিনি অবশ্য পুরূরবা সূর্য দেবতা বা solar hero এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন।[৩৭] তাঁর মতে শব্দটি গ্রীক পলিদেউকস্ Polideukes—অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোক—আলোকধারী।

তাঁর মতে পুরু অর্থাৎ বহু এবং রব যদিও সাধারণত ধ্বনি অর্থে ব্যবহৃত হয় তথাপি মূল ধাতু 'রু' মূলত রব বা চীৎকার বাচক হলেও বর্ণ বা রঙ

৩২। রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদানুবাদ দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রঃ

৩৩। মৈত্রং বৈ অহোরিতি শ্রুতে; শ্রূয়তে চ বারুণীরাত্রী—সায়ন

৩৪। সোমযাগের পূর্বদিন সন্ধ্যায় জলাশয় থেকে যে আনুষ্ঠানিক জল আনা হয় ঐ জলের নাম বসতীবরী। সোম নিষ্কাশনে এই জল ব্যবহার করা হয়।

৩৫। বৃঃ দেঃ ৫।১৪৯

৩৬। ম্যাক্স ম্যলরের প্রাগুক্ত গ্রন্থ pp 134

৩৭। তদেব p 129

অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে পুরূরবা মানে উচ্চ রব বা উচ্চ বর্ণ অর্থাৎ loud colour বা লাল রঙ—যা সূর্য বাচক—বোঝায়। পুরূরবা যে নিজেকে বসিষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।[৩৮] বসিষ্ঠ শব্দের অর্থ যে সূর্য তা আগেই দেখানো হয়েছে। বৈদিক যুগের শেষ ভাগেও আমরা দেখতে পাই যে পুরূরবার এই প্রাকৃত স্বরূপ জানা ছিল। নিরুক্ত এবং বৃহদ্দেবতায় তার প্রমাণ আছে। বৃহদ্দেবতার একটি শ্লোকে আছে—জল বর্ষণ করে গর্জন করতে করতে আকাশে সূর্যোদয়ের দিকে ধাবিত হয় বলে উরুবাসিনী (উর্বশী) আপন বাক্যে তাঁকে বলে পুরূরবা।[৩৯] ম্যাক্সমুলর উর্বশী শব্দটির গঠন বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে শব্দটি উরু অর্থাৎ বিস্তৃত এবং অশ—ছড়ানো থেকে গঠিত, যা আকাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়ানো অর্থাৎ উষা।

ঋগ্বেদে ৪।২।১৮ ঋকের ব্যাখ্যা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে, মন্ত্রটি অথর্ববেদেও আছে।

এই ঋকে উর্বশী পুরূরবা আখ্যানের আভাষ আছে। এই ঋক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অরণি মন্থনের ফলে যে অগ্নি জ্বলে, তাতে বিভিন্ন দেবতা আমন্ত্রিত হয়ে যজ্ঞ উপলক্ষে আবির্ভূত হয়, প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে ইন্দ্রাদি-দেবতাকে আহুতি দেওয়া হয়। এই অরণিদ্বয়ের নিচেরটিব নাম উর্বশী, উপরেরটির নাম পুরূরবা। সে উর্বশীর স্বামী (অর্য)। যে মানুষ হয়েও উর্বশী অপ্সরাকে উপভোগে সমর্থ। এই অরণিদ্বয়ের মন্থনে নিচের অরণিতে যে ছিদ্র থাকে সেখানেই ঘর্ষণজাত আগুন জ্বলে। তাই এই আগুনকে তাদের সন্তান-আয়ু বলে অভিহিত করা হয়। পাঠক লক্ষ্য করবেন এই মন্ত্রে একদিকে যেমন যজুর্বেদোক্ত যজ্ঞকার্য বা অগ্নিমন্থনের সম্পর্কিত নামগুলি এবং তাদের সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে তেমনি উর্বশী-পুরূরবা সূক্তের কাহিনীরও আভাস

৩৮। রুবন্ব্যোম্নুদয়ং যাতি রুস্তত্রাদ্বিস্বজন্নপঃ
পুরূরব সমহেনং স্ববাকে নোরুবাসিনী। বৃঃ দে ২।৫৯ পৃঃ ১৬

৩৯। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই ঋকের ব্যাখ্যা তথা অনুবাদের সংশয় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

আছে। এই ঋকের 'মর্তনাংচিত্বুর্বশী' ইত্যাদি অংশে বলা হয়েছে 'মানুষ হয়েও উর্বশী অপ্সরা উপভোগে সমর্থ হয়'—সংবাদ সুক্তের নবম ঋকেও আছে——"পুরূরবা নিজে মনুষ্য হইয়া দেবলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সঙ্গে কথা কহিতে এবং তাহাদিগের শরীর স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন।" দশম ঋকে পুরূরবা বলেছেন—"তাহার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। পরের ঋকে উর্বশী বলেছেন— হে পুরূরবা তুমি পৃথিবী পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করিলে, আমার গর্ভে নিজ বীর্য পাতিত করিলে।" ইত্যাদি পঞ্চম ঋকের—ত্রিঃ স্ম মাহ্ন শ্নথয়ো বৈতসনোৎস্ম—অর্থাৎ উর্বশী বলছেন—"দিনে তিনবার তুমি আমাকে আলিঙ্গন করিতে।" রমেশদত্ত সম্ভবত শোভনতার মুখ চেয়ে আলিঙ্গন লিখেছেন কিন্তু স্বয়ং সায়ন ব্যাখ্যা করেছেন—তুমি আমাকে প্রত্যহ পুংলিঙ্গ দ্বারা তিনবার মৈথুন করতে।[৪০] এই উক্তির তাৎপর্য যে তিন সবনের জন্য তিন বেলা অগ্নি প্রজ্বালনের জন্য অরণি মন্থনের প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রও তা অনুধাবন করেছিলেন।[৪১] পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত এখানেও সমর্থিত।

সুতরাং ঋগ্বেদের উর্বশী-পুরূরবা সুক্তটি ম্যাক্সমূ্যলর কথিত সূর্য-উষা প্রণয় কাহিনী মূলক এ অভিমত অগ্রাহ্য করা যায় না।

কিন্তু পরবর্তী ভারত তত্ত্ববিদেরা মূ্যলর-বেবর কথিত সূর্য-উষা প্রণয় মূলক ব্যাখ্যা বা তার মূ্যলর কথিত ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যকে যথার্থ বা যথেষ্ট বলে মনে করেন না। Sir A. B. Keith মনে করেন যে উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানের সূর্য উষার অতিকথা মূলক ভাষ্য অপ্রয়োজনীয়। তাঁর মতে এই গল্পের কোন গভীর তাৎপর্য নাই। তিনি বলেছেন—এই সূক্ত স্পষ্টত নর-অপ্সরীর প্রেম কাহিনী যা থেটিস তথা জার্মান হংস কুমারীর কাহিনীর মতো সকল সাহিত্যেই সুলভ···নগ্ন দর্শনের নিষেধ বিধি আদিম প্রকৃতির···পুরূরবা একজন মানব নায়ক হয়ত বাস্তব নয়।[৪২] ফ্রেজার কাহিনীর কৌম উপাদান নির্দেশ

৪০। সায়ন ভাষ্য দ্রষ্টব্য

৪১। বঙ্কিম রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৪৪

৪২। The Religion and Philosophy of the Vedas & Upanishadas by A. B. Keith

করতে গিয়ে উর্বশীর পক্ষি রূপের কথা বলেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে উর্বশী সহচরীদের সঙ্গে পক্ষি রূপে কুরুক্ষেত্রের পুকুরে চরছিল।[৪৩] পক্ষিকে টোটেম ধরে এই কাহিনীকে তিনি কৌম সমাজের বিবাহ পদ্ধতির অবক্ষয় বলে মনে করেছেন। যা যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ নির্ভর নয়।

ধর্মেন্দ্র দামোদর কৌশাম্বী তাঁর Myth and Reality গ্রন্থে উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানের বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং প্রচলিত ভাষ্যগুলির সমালোচনা করেছেন। তিনি সূক্তটির যথাসাধ্য আক্ষরিক অর্থ অনুসরণের চেষ্টা করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে উপাখ্যানটি পুরুষ-মেধ বা পিতৃমেধ মূলক। তিনি বলেছেন—

'দ্ব্যর্থবোধক অংশ অমীমাংসিত রেখেই সামগ্রিক অর্থ অনুযায়ী আমার ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব আক্ষরিক পাঠজাত। উর্বশীতে একটি পুত্র ও উত্তরাধিকারী উৎপাদনের পর পুরূরবাকে বলি দেওয়া হবে। উর্বশীর দৃঢ় সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে পুরূরবা বৃথাই অনুনয় করে। নৃতত্ত্ববিদদের নিকট এটা আদিম বিবাহ বিধির পরিণতি রূপে সুবিদিত।[৪৪] কৌশাম্বীর মতে সমাজে যখন মাতৃ কর্ত্রীত্বের লোপ ও পিতৃ কর্তৃত্বের সূচনা সেই সন্ধিকালের কাহিনী এটি। তাঁর মতে উর্বশী বা উষস কেবল উষা মাত্র নয় এক মাতৃ দেবতা। "ইলা ছাড়া কোন পিতা নাই বলে তিনি মনে করেন যে পুরূরবা হচ্ছে সেই অন্তবর্তী কালের লোক যখন পিতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল অর্থাৎ সেই যুগের যখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পূর্ববর্তী সমাজের (মাতৃতান্ত্রিক) উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল।"[৪৫] ইলা ছয় মাস পুরুষ এবং ছয় মাস নারী হয় এবং নারীকালে বুধের ঔরসে পুরূরবাকে জন্ম দিয়েছিলেন তা থেকে এই অনুমান। কিন্তু আধুনিক নৃতাত্ত্বিকেরা মাতৃতন্ত্র নয় মাতৃধারাকেও আদিম মানব সমাজের

৪৩। We can still detect hints that the fairy wife was once a bird woman—G. B. pp 131

৪৪। Myth and Reality by D. D. Kosambi Bombay Ist impression

৪৫। তদেব pp 59

সর্বজনীন স্তর বলে স্বীকার করেন না।[৪৬] তাঁদের মতে মাতৃধারা পূর্ববর্তী তারপর পিতৃধারা সর্বত্র এরকম সমাজক্রম স্বীকার্য নয়। তাঁরা মনে করেন যে মাতৃধারা এবং পিতৃধারা অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে বা পিতার দিক থেকে উত্তরাধিকার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে আদিম সমাজে দেখা দিয়েছিল। সুতরাং মায়ের দিক থেকে পরিচয়ও প্রচলিত ছিল। মেট্রিয়ার্কি (matriarchy) বলে যে স্ত্রীর কর্ত্রীত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তা বোধ হয় নৃতত্ত্ব সঙ্গত নয়।

আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা দেখেছেন যে আদিম সমাজে উত্তরাধিকার মাতা এবং পিতা উভয়ের ধারা থেকেই আসে। যে সমাজে মাতৃ উত্তরাধিকার পিতৃ উত্তরাধিকার অপেক্ষা অধিক তাকেই মাতৃধারা বা ম্যাট্রিলিনিয়াল এবং যেখানে পিতৃ উত্তরাধিকার অধিকতর তাকে পিতৃধারার বা প্যাট্রিলিনিয়াল সমাজ বলা হয়। মাতৃধারার সমাজেও কর্তৃত্ব মায়ের হাতে নয় মায়ের ভাই বা মামার হাতে।[৪৭] যেমন দেখা যায় ভারতের নায়ার সমাজে।

কৌশাম্বী ঋগ্বেদে এক ভিন্ন ধরণের হেতেরাবাদের অস্পষ্ট রূপ দেখেছেন যাকে তিনি আর্য সমাজের যূথ বিবাহের (Group marriage) অবশেষ বলে মনে করেছেন। প্রসঙ্গত ১।১৬৭।৪ ঋকের সাধারণ্যের অর্থাৎ সাধারণী স্ত্রীর উল্লেখকে কৌশাম্বী ভ্রাতৃমূলক বহুপতিকতা বা যূথ বিবাহের আভাস বলে মনে করেছেন।[৪৮] বিবাহ সূক্তের (ঋ ১০।৮৫) "যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপতি —যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে। এখানে যস্যাং ৭মীর একবচন আবার মনুষ্যা .কর্তৃকারক বহুবচন অথচ ক্রিয়া বপতি একবচনের। কাজেই এই মন্ত্রে 'প্রাচীনতর কোন কালে কতিপয় ভ্রাতার বা কৌমের পুরুষদের বধূ'

৪৬। Extreme patrilineal systems are comparatively rare and extreme matrilineal system perhapes rarer—Structure And Function in Primitive Society—by Radcliff Brown, Cohen & West

৪৭। Structure and Function in Primitive Society by Radcliff Brown, Cohen & West

৪৮। কৌশাম্বীর গ্রন্থ পৃঃ ৬৭

বোঝান হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এই মন্ত্র বরের উক্তি—গৌরবে বহুবচন হতে পারে অথবা যুগে যুগে মানুষেরা স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করেছেন অর্থাৎ বিভিন্ন যুগের মানুষ অর্থে মনুষ্যেরা পদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। সাধারণী স্ত্রীশব্দ প্রসঙ্গে গণিকা যে গণবধূ অর্থাৎ কৌমবধূ তাও মেনে নেওয়া যায় না। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা যূথ বিবাহ বা Group marriage-এর সত্যতা স্বীকার করেন না। লক্ষ্য করা দরকার মন্ত্রাংশ দুটি প্রথম ও দশম মণ্ডলের, যা পরবর্তীকালের বলে মনে করা হয়। এই দুই মণ্ডলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সুতরাং গণিকার অস্তিত্বও ছিল বলেই মনে হয়। হয়তো পরবর্তী উন্নততর সমাজের বেশ্যাবৃত্তির ইঙ্গিত আছে এতে।

কৌশাম্বী মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈদিক সমাজের বিশ্লেষণ করেছেন যার ভিত্তি মর্গান কথিত সমাজ তত্ত্ব। তদনুযায়ী তিনি আদিম সমাজের প্রাচীন স্তর মাতৃতান্ত্রিকতা, যূথবিবাহ বা অবাধ যোনি সম্পর্ক, কৌম সমাজের টোটেম-বাদী ক্ল্যান বা গোষ্ঠী ইত্যাদির অনুকূলে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা ন্যায়ানু-মোদিত নয়। সাম্প্রতিককালে, পরবর্তীকালে গৃহীত তথ্যের সাহায্যে মর্গান কথিত আদিম সমাজ বা যূথ বিবাহ ইত্যাদি যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক নয় বলে পরিত্যক্ত। আমরা মাতৃতান্ত্রিকতা সম্পর্কে র‍্যাডক্লিফ ব্রাউনের যুক্তি উপস্থিত করেছি। মার্কস্‌বাদী ফরাসী লেখিকা ইম্মানুয়েল তেব্রে আদিম সমাজের মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ গ্রন্থে বলেছেন—আত্মীয় সম্পর্ক ও বিবাহ, সমরক্তজ পরিবার ও যূথবিবাহ নৃতাত্ত্বিক ভ্রান্তির পর্যায়ে নেমে গেছে। ইতিহাসে ও কুটুম্বতত্ত্বে তার কোন আভাস নেই।[৪৯]

কৌশাম্বীর পতিমেধ—উর্বশী কর্তৃক পুরূরবা নিধন—একান্তভাবে ফ্রয়েডীয়

৪৯। In the field of relation of kinship and marriage the consanguineous family and group marriage have been relegated to the category of ethnological error—neither history nor ethnography have produced any trace of them; the institution and customs upon which Morgan based his argument for their existence can justifiably be explained quite differently—Marxism and Primitive Society by Emmanuel Terray tr. by Marry Klepper, Modern Reader

'পুরুষ মেধ' তত্ত্ব নির্ভর। ফ্রয়েড মনে করেছিলেন ধর্ম এবং সমাজ গড়ে উঠেছিল আদিম পিতৃহত্যা থেকে। এই মতের ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে, আদিম সমাজ ছিল একজন বয়স্ক পুরুষ, কয়েকজন নারী ও তাদের অপরিণত শিশুদের নিয়ে। যেই মাত্র পুরুষ শিশুরা পূর্ণ বয়স্ক হয়ে ওঠে তখনি পরিবারের পিতা তাদের তাড়িয়ে দেয়।[৫০] বিতাড়িত পুত্ররা শেষে তাদের পিতাকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে ফেলে। এই কৌম ভোজ থেকেই ধর্ম এবং সমাজের উদ্ভব। কৌশাম্বী সম্ভবতঃ এই ফ্রয়েডীয় ধারণাকে মর্গান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদিম কৌম সমাজ তথা পরিবারের কর্ত্রী কর্তৃক কৃত বলে একে পতিমেধ বা husband killing বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিদেরা অধিকাংশই এই মতবাদকে তথ্যসহ বা যুক্তি সঙ্গত বলে মনে করেন না। ফাদার Schmidt বলেছেন—প্রাক টোটেমীয় জনেরা নরমাংস ভোজন জানতনা এবং তাদের মধ্যে পিতৃমেধের প্রচলন মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক এবং নীতিগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব।[৫১] কৌশাম্বী এই পুরুষমেধ প্রমাণ করার জন্য অতিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। সূক্তটির দ্বাদশ ঋকে পুরূরবার উক্তি—কো দম্পতা স মনসা বিয়ুযোদধ।—'পরস্পর প্রীতিযুক্ত দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটাতে কার ইচ্ছা হয়' বা ১৭ ঋকে—উব ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠান্নিবর্তস্ব। হৃদয়ং তপ্যতে মে—"তোমার সুকৃতের সুফল যেন তোমার নিকট বর্তমান থাকে। হে উর্বশী ফিরিয়া আইস আমার হৃদয় দুগ্ধ হইতেছে।" —এ সব উক্তি কি মৃত্যু-ভীতের প্রাণ ভিক্ষার অনুনয়? না আসন্ন প্রিয়া-বিচ্ছেদ কাতর প্রেমিকের হৃদয় বেদনা?

তবে অতিকথা উদ্ভবের মূল কারণ তিনি সঠিক নির্দেশ করেছেন।—"উর্বশী ও পুরূরবার সংলাপ দুই চরিত্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন কৃত্যের অংশ বিশেষ।" তবে এই কৃত্য কী তা তিনি নির্ণয় করতে ভুল করেছেন—"এই দুই চরিত্র হচ্ছে দুই নীতির প্রতিভূ এবং আদিকালের এক পুরুষমেধ যজ্ঞের প্রকৃত রূপের

৫০। Anthropology (Totem and Tabw) by A. L. Kroebar

৫১। Origin and Growth of Religion by Schmidt pp 112-115

বিকল্প।"[৫২] তাঁর মতে অতিরিক্ত ঋকগুলি তৃতীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চার্য। আশা করি আমাদের যুক্তি ক্রমের অনুসরণকারী পাঠক এই সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি অনুধাবন করতে পারবেন। এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রদর্শিত অগ্নিমন্থনই যে অভীষ্ট কৃত্য—মেনে নেবেন।

অগ্নিমন্থনের যাতুক্রিয়ার প্রাথমিক প্রেরণা হ্রাস পেলে নামগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপায়নে উর্বশী পুরূরবার মানবিক কাহিনী গড়ে ওঠে। এই সময় প্রাকৃতিক শক্তির দেবায়ন গুরুত্ব পাওয়ায় হয়তো কাহিনীতে সূর্য উষার প্রণয় কাহিনী আরোপিত হয়েছে।

এর আগে আমরা উর্বশীর প্রাকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সপ্তম মণ্ডলের ৩৩নং সূক্তের কয়েকটি ঋকের[৫৩] আলোচনা করেছি। সেখানে বসিষ্ঠের জন্মকথা আছে। উর্বশীর নরলোকে নির্বাসনের কথা আছে বৃহদ্দেবতায় ও কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রে। বৃহদ্দেবতায়[৫৪] আছে—যজ্ঞকালে আদিত্যেরা অপ্সরী উর্বশীকে দেখলে তাদের রেত স্খলিত হয়ে বসতীবরীর কুম্ভে পতিত হয়, তখন সেই মুহূর্তে অগস্ত্য এবং বসিষ্ঠ এই দুই বীর্যবন্ত তপস্বী হয়েছিলেন। কলসে জন্মেছিলেন অগস্ত্য, জলে জন্মেছিল মহাদ্যুতিমান মৎস। এ হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত্ব-মূলক অতিকথা। এখানে শুধু বসিষ্ঠ আর অগস্ত্যের জন্মকথা। কাত্যায়ন সর্বানুক্রমনীতে অভিশাপের কথাও আছে।—মিত্র ও বরুণ উভয়ে দীক্ষাকালে উর্বশীকে দেখেছিলেন। চঞ্চল চিত্ত উভয়েই তাঁরা বসতীবরী জলাধারে শুক্রপাত করেছিলেন। উর্বশীকে শাপ দিয়েছিলেন মনুষ্যভোগ্য ভূমিতে অর্থাৎ মর্তে বাস করার।[৫৫] এখানে কাহিনী পৌরাণিক রূপ লাভ করেছে। যা ছিল প্রাকৃতিক তা পরিণত হল কার্যকারণ সম্মত মানবিক কাহিনীতে। আগেই বলেছি কাহিনীটির উদ্ভবের তাৎপর্য ছিল দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থলে আকাশের

৫২। কৌশাম্বীর প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃঃ 55

৫৩। ঋ ৭।৩৩।১০-১৩ দ্রঃ

৫৪। বৃঃ দেঃ ৫।১৪৯-১৫২ A A. Macdonell সম্পাদিত Harvard Oriental Series মতিলাল বানারসীদাস সং

৫৫। কাত্যায়ন সর্বানুক্রমণী A. A. Macdonell সম্পাদিত Oxford 1886

আলোকাভা সূর্যের উদয় ও অস্তের সূচনা। প্রাচীন মানুষের কাছে যেহেতু মৈথুন থেকে সন্তানের জন্ম ছিল অলৌকিক শক্তি বলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং সূর্যের জন্ম বা উদয়ও তাঁরা কাম বাসনার সৃষ্টি বলে গল্প রচনা করেছেন। এই কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক রূপ পাই রামায়ণে।[৫৬] এখানে বসিষ্ঠের জন্মকে পুনর্জন্ম রূপে দেখান হয়েছে। কাহিনীটি প্রায় একটি ছোট গল্পের মতো।

নিমির শাপে বসিষ্ঠ দেহহীন হলে তিনি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা তাকে মিত্রাবরুণের বিসৃষ্ট তেজে প্রবেশ করতে বললেন কেননা তাহলেই তিনি অযোনিসম্ভব হতে পারেন। বসিষ্ঠ তাড়াতাড়ি সমুদ্রে গেলেন। 'এই সময় সুর পূজিত মিত্রদেব বরুণের সঙ্গে ছিলেন। তখন সুরূপা অপ্সরী উর্বশী সখীদের নিয়ে এসেছিলেন সমুদ্রে। বরুণ ঐ পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণ-চন্দ্রাননাকে আপন আলয়ে খেলা করতে দেখে আনন্দিত হলেন এবং তাঁর সহবাস প্রার্থনা করলেন। উর্বশী জোড় হাতে বললেন ঃ—

'দেব, মিত্র আগে আমাকে এবিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন।' বরুণ তখন কামানলে পীড়িত হয়ে বললেন—'সুন্দরী তবে আমি এই দেব কলসীতে তোমাকে দেখে স্খলিত তেজ পরিত্যাগ করি, যদি তুমি আমার সহবাস না চাও তবে তোমার জন্য এই তেজ ত্যাগ করে আমি কৃতার্থ হব।'

উর্বশী লোকপাল বরুণের সুমধুর কথা শুনে প্রীত মনে বললেন—দেব আপনি যা বললেন তাই হোক। আমার এই দেহ মাত্র মিত্রের, হৃদয় আপনার আর আপনার হৃদয়ও আমার। আপনার প্রতি আমার অতুল প্রেম। উর্বশী এই কথা বলা মাত্র জ্বলন্ত আগুনের মতো তাঁর তেজ কলসে ত্যাগ করলেন। পরে উর্বশী মিত্রের কাছে এলে মিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'রে দুষ্টে, আমাকে উপেক্ষা করে অন্য পতি নিলি? এই দুষ্কর্মের জন্য তোকে কিছুকাল মর্তে থাকতে হবে। তুই বুধের পুত্র পুরূরবার পত্নী হয়ে থাক।'[৫৭]

৫৬। রামায়ণ 7।56।13-20

৫৭। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৫৬ সর্গ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত, বাল্মীকি রামায়ণ ভারবি সংস্করণ ২ খণ্ড পৃঃ 997

পরের সর্গে অগস্ত্য আর বসিষ্ঠের জন্মকথায় বলা হয়েছে—"ঐ যে মিত্র বরুণের তেজ পূর্ণ কুম্ভ উহাতে তেজোময় দুই ঋষি জন্মগ্রহণ করে। ঐ কুম্ভ হইতে সর্বাগ্রে অগস্ত্য উৎপন্ন হন। কিন্তু তিনি জাত মাত্র বলিলেন—আমি একমাত্র তোমার পুত্র নহি—এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বরুণের তেজ পরিত্যাগের পূর্বে ঐ কুম্ভে মিত্রের তেজ নিহিত ছিল। অর্থাৎ যে কুম্ভে মিত্রের তেজ[৫৮] ছিল তাহাতেই বরুণ তেজ পরিত্যাগ করেন।"[৫৯] এই কাহিনী অর্থাৎ উর্বশী শাপের কথা বিষ্ণুপুরাণ ভাগবত[৬০] এবং পদ্মপুরাণেও[৬১] আছে।

দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে মূলে যে আতিকথা গড়ে উঠেছিল পরবর্তী কালে সে প্রেরণা বিস্মৃত হওয়ার ফলে রক্ষিত কাহিনী সূত্র নিয়ে কালানুক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নতুন করে উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। বৃহদ্দেবতায় পুরূরবাকে সূর্যের নামান্তর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬২]

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাব্যে উর্বশীকে উষা এবং কেশীকে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আবৃষ্টি সংরম্ভ মেঘ রূপে উপস্থিত করেছেন, পুরূরবার সূর্যস্বরূপও ব্যঞ্জিত।

ঋগ্বেদে উর্বশী যেমন উষা তেমনি অপ্সরাও।[৬৩] দশম মণ্ডলের 136 সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে এবং প্রথম ঋকে কেশীর উল্লেখ আছে। প্রথম ঋকে—অগ্নি, জল, দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণকারী এই যে জ্যোতি তার নামই কেশী।[৬৪] ৬ষ্ঠ ঋকে গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের সঙ্গে কেশী উল্লিখিত প্রথম ঋকের—"কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে"—কেশী বিশ্বকে দৃশ্যমান করেন—এই জ্যোতিকে কেশী বলা হয়। তাতে মনে করা যায় যে কেশী আসলে সূর্যরশ্মি এবং এই জন্য ৬ষ্ঠ ঋকে তাকে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সঙ্গে বিচরণের কথা বলা

৫৮। তদেব পৃঃ ৫৯। বিষ্ণুপুরাণ ৬০। ভাগবত 9/13/3

৬১। পদ্মপুরাণ স্বর্গ খণ্ড 7/57

৬২। বৃঃ দেঃ পৃঃ 12

৬৩। ঋ 7/33/12 দ্রঃ

৬৪। কেশ্যাগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী।
কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে॥ ঋ 10/136/6

হয়েছে।[৬৫] আর গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের আদি উৎস বোধ হয় সূর্যকর প্রতিফলিত বিচিত্র বর্ণ জলদ। 10/139/4 ঋকে বিশ্বাবসু গন্ধর্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে 'গন্ধর্বমাপো দদৃশু', পঞ্চম ঋকে বলা হয়েছে 'গন্ধর্বো রজসো বিমান:' ভাষ্যে সায়ন বলেছেন রজস: উদকস্য বিমান: নির্মাতা অর্থাৎ গন্ধর্ব জলের সৃষ্টি কর্তা। 8/1/11 ঋকের গন্ধর্ব শব্দের টীকায় সায়ন বলেছেন—গবাং রশ্মীনাং ধর্ত্তারং অর্থাৎ সূর্য রশ্মি ধারণকারী ইত্যাদি। আর অপ্সরা শব্দের অর্থ Whitney লিখেছেন—'personification of the Vapours which are attracted by the sun and form into mist of cloud.' অর্থাৎ সমুদ্রাদি জলাশয় থেকে সূর্য কিরণে উত্থিত যে সব বাষ্প মেঘের আকার ধারণ করে সূর্যকর প্রতিফলিত বিচিত্র বর্ণ সেই মেঘ বা আকাশই বোধ হয় অপ্সরা ধারণার আদি প্রেরণা। উষা বা প্রাতঃকালে আলোক প্রতিফলিত মেঘমালা বা আকাশ, যাকে উর্বশী বলা হয়েছে সেও এক অপ্সরা। অপাৎ সরতি—অপ বা জল থেকে সরে বা চলে এই অর্থে বোধ হয় অপ্সরা পদটি গঠিত। অবশ্য বৈদিক যুগেই অপ্সরা অর্থে সুন্দরী রমণী গৃহীত হয়েছে।

বিষ্ণুধর্মোত্তব উপপুরাণে উর্বশী নারায়ণ ঋষির উরু থেকে জাত বলে কথিত আছে। গল্পটি এই রকম—নর ও নারায়ণ ঋষি যখন গন্ধমাদনে কঠোর তপস্যা রত তখন তাদের প্রভাবে বাঘ সিংহ প্রভৃতি বনের হিংস্র প্রাণীরাও হিংসা ত্যাগ করে। পাছে এই কঠোর তপস্যা দ্বারা নর ও নারায়ণ ঋষি ইন্দ্রত্ব লাভ করে এই ভয়ে ইন্দ্র তপস্যা ভঙ্গের জন্য কন্দর্প ও বসন্তকে সঙ্গে দিয়ে রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরীদের পাঠান। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলে নারায়ণ তাঁর উরু থেকে অধিকতর সুন্দরী উর্বশীকে সৃষ্টি করে তাদের সঙ্গী করে দিলেন।[৬৬] এই আখ্যানের প্রথম সাক্ষাৎ পাই কাত্যায়ন সর্বানুক্রমণীতে[৬৭] সেখানে অগস্ত্যের নাম মৈত্রাবরুণি কেন তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নারায়ণ ঋষির কথা বলা হয়েছে—

৬৫। অপ্সরসাং গন্ধর্বাণাং মৃগাণাং চরণেচরণ্।
কেশী কেতস্য বিদ্বান্ সখা স্বাদুর্মদিন্তমঃ। ঋ 10/136/6

৬৬। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ 102—103

৬৭। কাত্যায়ণ সর্বানুক্রমণী

বদর্যাশ্রম বাসিনা ভগবতা নারায়ণেন সমাধিভেদার্থমিংদ্র প্রেষিতাপ্সরসাং ক্রীড়ার্থমাত্মীয়োরূ প্রদেশাৎ সৃষ্টাহি। অর্থাৎ বদরী আশ্রমে ভগবান নারায়ণের সমাধি ভঙ্গের জন্য ইন্দ্র প্রেরিত অপ্সরাদের ক্রীড়ার জন্য নারায়ণ নিজ উরু থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, ইতিহাসবিদেরা এইরূপ বলেন। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকেও এর উল্লেখ আছে।[৬৮]

মনে হয় পরবর্তীকালে যখন আর্যরা উর্বশীর প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গেছেন, উর্বশী অপ্সরা রূপে সম্পূর্ণ গৃহীত, তখন তার উদ্ভব রহস্যের ব্যাখ্যানের জন্য শব্দটির গঠনরূপ বিশ্লেষণ করে নারায়ণের উরুজাতা এই কাহিনী খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই গড়ে ওঠে।

উর্বশী সম্পর্কে আর একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায় জৈমিনীর নামে প্রচারিত দণ্ডী পর্বে।[৬৯] এখানে আছে দুর্বাশার অভিশাপে উর্বশী দিনে ঘোটকী হন এবং রাতে নিজরূপ ধারণ করেন। মৃগয়ায় আগত রাজা দণ্ডী উর্বশীর প্রেমে পড়ে তাকে গৃহে নিয়ে যান। নারদের প্ররোচনায় কৃষ্ণ ঘোড়াটি চান। অনিচ্ছুক দণ্ডী পাণ্ডবদের আশ্রয় নেন। তারপর ঘোটকী নিয়ে পাণ্ডব আর যাদবদের যুদ্ধ। এখানেও কি উর্বশীর উষা রূপের অনুস্মৃতি? বৈদিক সাহিত্যে অশ্ব অবশ্য সূর্যের প্রতীক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উষাকে অশ্ব বলা হয়েছে। যজ্ঞে ছিন্ন রক্তাক্ত অশ্বমুণ্ডকে উষার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।— উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ।[৭০] এও কি ভোরবেলার আরক্ত আকাশের স্মৃতি? ঋগ্বেদ পাঠক মাত্রেই বৈদিক দেবদেবীর প্রাকৃত স্বরূপ লক্ষ্য না করে পারেন না। এই প্রাকৃতিক পটভূমিকা ম্যাক্সমূলর, বেবের প্রভৃতি পণ্ডিতদের আবিষ্কার মাত্র নয়। সূত্র যুগের রচনায়—নিরুক্ত, বৃহদ্দেবতা সর্বানুক্রমণী ইত্যাদি গ্রন্থেও এই সব উপাখ্যানের প্রাকৃতিক তাৎপর্য স্বীকৃত।

প্রাকৃতিক শক্তিগুলির কেবল অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন দেব রূপ নয়, তাদের যেমন প্রাকৃত স্বরূপ তেমনি মানবিক রূপের পরিচয়ও প্রচুর। ইন্দ্র

৬৮। উরূদ্ভবা নরসখস্য মুনেঃ—বিক্রমোর্বশীয়ম্ প্রথম অঙ্ক

৬৯। জৈমিনীয় ভারত, দণ্ডীপর্ব এরূপ কোন সংস্কৃত গ্রন্থ দেখি নাই।

৭০। বৃঃ উঃ ১।১।১

বরুণ প্রভৃতি যত অধিক উল্লিখিত হোক না কেন ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা সূর্য। শুধু ভারতীয় আর্যভাষীদের কাছেই নয় অন্যান্য দেশেও সূর্যের দেবরূপের অজস্র প্রশস্তি। দিনরাতের বিভাগ কর্তা আলোক সম্পাদক সূর্য আদি-যুগের মানুষের কাছেও ছিল পরম বিস্ময়। ঋগ্বেদে সূর্যের যেমন প্রাকৃতিক রূপের সাক্ষাৎ পাই তেমনি তার দেবরূপেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বহু ঋকে।— তিনি সকল জ্যোতির্ময় পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[৭১] সূর্য জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার দূর করে,[৭২] সূর্যের আগমনে নক্ষত্রগণ তস্করের ন্যায় রাত্রির সহিত চলিয়া যায়,[৭৩] সূর্য আকাশের পুত্র,[৭৪] জগতের আত্মা,[৭৫] আকাশের বিস্তৃত চক্ষু[৭৬] ইত্যাদি। আবার সূর্য সবিতা, অর্যমা, আদিত্য, মিত্র, ঋভুগণ, পুষা, বিষ্ণু— এই সব সূর্যেরই বিভিন্ন দেবরূপ। উদয়ের পূর্বমুহূর্তে বা উদয়ক্ষণে সূর্যের যে রূপ তার নাম সবিতা[৭৭] ইনি জগৎ প্রসবকারী অর্থাৎ রাতের অন্ধকার মোচন করে পৃথিবী প্রকাশ করেন। দিনরাত বিভাগকারী সূর্য, মিত্র হচ্ছেন দিন বা দিনের আলোকোজ্জ্বল আকাশ[৭৮], উদয়াচল, মধ্যগগন আর অস্তাচল এই ত্রিপাদগামী সূর্য হচ্ছেন বিষ্ণু , আবার বিষ্ণুকে বলা হয়েছে শিপিবিষ্ট—টাক মাথা, উজ্জ্বল সূর্যগোলকই এই শব্দের দ্বারা লক্ষিত—গ্রীক পুরাণে যার নাম কেফালোস[৮০] (Kephalos) আবার সায়ন বলেছেন ঋভু হচ্ছে সূর্যরশ্মি[৮১]। ম্যাক্স ম্যূলর

৭১। ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ঋ 10/170/3

৭২। সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমঃ ঋ 10/37/4

৭৩। তায়বঃ যথা নক্ষত্রা যন্তি অক্তুভি ঋ 1/50/2

৭৪। দিবস্পুত্রায় সূর্যায় ঋ 10/37/1

৭৫। সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ঋ 1/115/1

৭৬। দিবীব চক্ষুরাততম্

৭৭। অহোরাত্র বিভাগ কর্তা সূর্যঃ—সায়ন

৭৮। মৈত্রং বৈ অহরিতিশ্রুতে

৭৯। ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা। ঋ 1/22/18

৮০। ঋ 7/100/5-7

৮১। আদিত্য রশ্ময়োহপি ঋভব উচ্যতে। সাযন 1/110/6

বলেছেন ঋভু হচ্ছে সূর্য[৮২] পুষা হচ্ছে গোপালকদের পথ প্রদর্শক সূর্য।[৮৩] তাছাড়া আদিত্য, সূর্য, বসিষ্ঠ ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রায় শতাধিক সূক্তে সূর্যের স্তুতি।

আবার উষাকে নিয়ে ঋগ্বেদের যত কাব্যসৌন্দর্য যার ভিত্তিমূলে প্রভাত-বেলার পূর্বাকাশে আলোর চরণ ধ্বনি।[৮৪] আবার তাকে নিয়ে বিচিত্র নারী রূপের সৃষ্টি—উষা, অহনা, সরমা, সরণ্যু, অর্জুনি, সূর্যা, উর্জানী, উর্বশী ইত্যাদি। বস্তুত ঋগ্বেদের উষা সম্পর্কে অন্তত কুড়িটি সূক্ত এবং ম্যাকডোনেল গণনা করে দেখেছেন অন্তত ৩০০ বার উল্লেখ আছে।

'হে দেবদুহিতা আমাদিগকে ধন দান করিয়া প্রভাত কর।'[৮৫] 'তমোনিবারণী দ্যুলোক দুহিতা উষা আগমন করিতেছেন দৃষ্ট হইল। তিনি দর্শনার্থে মহৎ তম অপাবৃত করিতেছেন। মনুষ্যের নেত্রী হইয়া জ্যোতি বিকাশ করিতেছেন।'[৮৬] অরুণবর্ণা 'সূর্যের পুরোবর্তিনী দীপ্তিময়ী উষা।' লোহিতবর্ণ দীপ্তিমান রশ্মিযুক্ত সুভগা বিস্তীর্ণা প্রথমা এই উষা।[৮৭]

'হে উষা দেবী তুমি প্রকাশ হইলে পর পক্ষিগণ বাসস্থান হইতে উত্থিত হয় এবং হব্যভাক্ মনুষ্যগণ উত্থিত হয়।'[৮৮] উষাকে বারবার বলা হয়েছে দুহিতর্দিবঃ[৮৯] বা আকাশ কন্যা, স্বর্গদুহিতা। উষার এই প্রাকৃত রূপে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে মানব মনে তার কল্যাণী রূপকে দেবী রূপে ও অতঃপর অপ্সরা উর্বশী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

৮২। Ribhu was used in the vedas as an epithet of Indra and a name of the Surya—Comparative Mythology by F. Muller pp 161-62

৮৩। সর্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা আদিত্য—যাস্ক

The sun as viewed by shepherds—Muller

৮৪। Some pearls of lyric poetry which appeal to us much through this fine flowing language are to be found among the songs above all to Usas—Winternitz p 80

৮৫। ঋ 1/48/1; ৮৬। 7/81/6; ৮৭। 6/64/3; ৮৮। 6/64/6; ৮৯। 1/10/22, 1/48/9, 5/79/2, 4/51/1 ইত্যাদি।

"তিনি সুবেশা রমণীর ন্যায় নিজমূর্তি প্রকাশিত করিয়া এবং যেন স্নান হইতে উত্থিত হইয়া আমাদের নেত্র সমীপে উদিত হইতেছেন। স্বর্গ কন্যা উষা দ্বেষভাজন তমোরাশি বিদূরিত করিয়া দীপ্তি সহকারে আগমন করিতেছেন।"[৯০] হে উষা যে সকল জ্যোতিঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রকাশ হয়, তাহাদিগের গুণে তুমি কুলটার ন্যায় না হইয়া পতিসমীপ গামিনী রমণীর ন্যায় পরিদৃষ্ট হও।'[৯১] "এই যে উষা, যিনি নবযৌবন ধারণ করিয়া এবং জ্যোতিঃ দ্বারা গূঢ় তমঃ বিনাশ করিয়া জাগরিত হন। লজ্জাহীনা যুবতীর ন্যায় ইনি সূর্যের সম্মুখে আগমন করেন।"[৯২] উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন, এবং গাভী যেরূপ (দোহন কালে) স্বীয় উধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন।"[৯৩] 'স্বর্গদুহিতা উষা দীপ্তিমান সূর্যের সেবা করিতেছেন।'[৯৪] প্রণয়ী সূর্যের স্ত্রী উষাদেবী।[৯৫] 'উষার প্রণয়ী সূর্যের ন্যায়।'[৯৬]

'দেবী কন্যার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল ও দীপ্তিমান সূর্যের নিকট অগ্রসর হও। যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর।' মাতা দেহ মার্জনা করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেইরূপ উজ্জ্বল হয় তুমিও সেইরূপ হইয়া দর্শনার্থে আপন শরীর প্রকাশ কর।'[৯৭]

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র, A. B. Keith, ধর্মেন্দ্র দামোদর কৌশাম্বী, J. G. Frazer যাই বলুন ঋগ্বেদের উর্বশী-পুরূরবা সংবাদ সূক্তের ম্যাক্সমূল্যর বেবের কথিত সূর্য উষা প্রণয়োপাখ্যানের তাৎপর্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর কেবল উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানই নয়, ঋগ্বেদে সূর্য উষা প্রণয় নিয়ে আরো কয়েকটি আখ্যানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যথা—সূর্যার বিয়ে, বর্তিকা উদ্ধার ও সরমাপণি কথা। ঋগ্বেদে বর্তিকা উদ্ধার কাহিনী আছে—

আস্নঃ বৃকস্য বর্তিকাম অভীকে যুবম নরা নাসত্যামুমুক্তম্।[৯৮] সায়ন

৯০। 5/80/5; ৯১। 7/76/3; ৯২। 7/80/2; ৯৩। 1/92/4; ৯৪। 1/92/5; ৯৫। 1/92/11; ৯৬। 1/69/1, 5

৯৭। ঋ 1/123/10, 11

৯৮। তদেব 1/116/16

ভাষ্য করেছেন—বর্তিকা হচ্ছে চড়াই পাখি, তাকে ধরেছে বৃক বা নেকড়ে। নাসত্য দুজন এসে ছাড়িয়ে দিলেন তাকে। যাস্ক বলেন—পুনঃপুনর্বর্ততে প্রতিদিবসম আবর্ততে ইতি বর্তিকা উষাঃ। তাং বৃকেন আবরকেন সর্ব জগৎ প্রকাশেনাচ্ছাদয়িত্রা সূর্যেনগ্রস্তা তদীয় মুখাৎ অশ্বিনাব মুঞ্চতামিতি। অর্থাৎ যে বারবার প্রত্যাবর্তন করে সেই বৃক বা সূর্য। উষার পিছনে পিছনে এসে সূর্য তাকে ধরে। অশ্বিদ্বয় এসে সূর্যের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করে। প্রভাত উষার পর সূর্যের অস্তগমন কালে পশ্চিমাকাশে আবার উষার আবির্ভাব ঘটে সন্ধ্যার অস্তরাগে। যেন সূর্য এসে ধরল উষাকে অশ্বিদ্বয় এসে ছাড়িয়ে দিলেন। ম্যাক্সমূল্যরও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেছেন।[৯৯]

সূর্যার বিয়ের গল্প আছে প্রথম মণ্ডলের দুটি এবং দশম মণ্ডলের একটি ঋকে। —'হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের শীঘ্রগামী অশ্ব থাকায় সূর্যের দুহিতা বিজিত হইয়া তোমাদের রথে আরোহণ করিলেন।'[১০০] হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের প্রশংসনীয় অশ্বদ্বয় তোমাদিগের সংযোজিত রথকে তাহার সীমাভূত আদিত্য পর্যন্ত সকল দেবগণের পূর্বেই লইয়া গিয়াছিলে; কুমারী সূর্যা এইরূপে বিজিতা হইয়া সখ্যতা হেতু আসিয়া 'তোমরা আমার পতি' এই বলিয়া তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন।[১০১]

সূর্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাকে সূর্য যখন সূর্যাকে সম্প্রদান করিলেন তখন সোম তাঁহার বিবাহার্থী ছিলেন কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার বর স্বরূপ পরিগৃহীত হইলেন।[১০২]

উদ্ধৃত প্রথম ঋকটির টীকায় সূর্যাবিবাহের সমগ্র কাহিনী সায়ন বিবৃত

৯৯। Science of Language by F M. Muller 1882 vol II pp 55
রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদানুবাদে দ্বিতীয় সংস্করণের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। "যাস্কের মত যতদূর বাঝা যায় বোধ হয় অর্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে যে আলোক ও অন্ধকার বিজড়িত থাকে তাহাই অশ্বিদ্বয়।"

১০০। ঋ 1/116/17 ঐ, ব্রা 4/17 তে বিস্তৃত কাহিনী আছে

১০১। ঋ 1/115/5

১০২। 10/85/9

করেছেন—সবিতা স্বদুহিতরং সূর্যাখ্যাং সোমায় রাজ্ঞে প্রদাতুমৈচ্ছৎ। তাং সূর্যাং সর্বে দেবা বরযামাসুঃ। তে অন্যোন্যমূচুঃ। আদিত্যমবধি কৃত্বা আজিং ধাবাম। যোঽস্মাকং মধ্যে উজ্জেষ্যতি তস্যেয়ং ভবিষ্যতীতি। তত্রাশ্বিনাবুদজয়তাম্। সা চ সূর্যাং জিতবতোস্তয়োঃ রথমারুরোহ।”—অর্থাৎ সবিতা নিজকন্যা সূর্যাকে রাজা সোমকে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সূর্যাকে সব দেবতাই বরণ করতে চেয়েছিলেন। তারা পরস্পর বললেন—আদিত্য পর্যন্ত পণ রেখে দৌড়াব। যিনি আমাদের মধ্যে জয়ী হবেন ইনি তাঁরই হবেন। তাতে অশ্বিনীদ্বয় জিতেছিলেন। সেই সূর্যাও বিজিতা হয়ে তাদের সঙ্গে রথে চড়েছিলেন।

প্রভাতে উষার পশ্চদ্ধাবন করে সূর্য যখন অপরাহ্ণে এসে তাঁকে ধরলেন তখন রাতের আলো আঁধারে (অশ্বিনীদ্বয়) মিলিয়ে গেলেন উষা।

দশম মণ্ডলের ১০৮নং সূক্তটি পণি-সরমা সংবাদ। পণিগণ লুকিয়ে রেখেছিল স্বর্গ-গাভীগুলিকে। তাদের উদ্ধারের জন্য ইন্দ্র পাঠিয়েছিলেন স্বর্গ কুক্কুরী সরমাকে। পণিরা স্বর্গ-ধেনুগুলি লুকিয়ে রেখেছিল গিরি গুহায়। সরমা সেগুলি খুঁজে বের করে এবং ইন্দ্রের ভয় দেখিয়ে পণিদের সেগুলো ফিরিয়ে দিতে বলে। কিন্তু পণিরা কিছুমাত্র ভীত না হয়ে সরমাকেই তাদের মধ্যে ভগ্নীরূপে চায়। প্রথম মণ্ডলের ৬ষ্ঠ সূক্তের পঞ্চম ঋকের ভাষ্যে সমগ্র কাহিনীটি উদ্ধার করেছেন সায়ন—অস্তিকিঞ্চিদুপাখ্যানম্। পণিভিঃ দেবলোকাৎ গাবঃ অপহৃতা অন্ধকারে প্রক্ষিপ্তাঃ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে রমেশ-চন্দ্র দত্ত বলেন—“মোক্ষমূলর বিবেচনা করেন এই বৈদিক উপাখ্যানটি সূর্যের সহিত উষা সম্পর্কিত একটি উপমা মাত্র। তিনি বলেন সরমা উষার একটি নাম। দেবগণের গবীগণ অর্থাৎ সূর্যরশ্মি সমুদয় অন্ধকার দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। দেবগণ ও মনুষ্যগণ তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে উষা দেখা দিলেন। তিনি বিদ্যুৎ গতিতে গন্ধ পাইয়া কুক্কুরী যেরূপ যায় সেইরূপ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তিনি সন্ধান লইয়া ফিরিয়া আসিলে আলোকদেব ইন্দ্র প্রকাশ হইয়া অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাদিগের দুর্গ হইতে দেবগবী উদ্ধার করিলেন।”

অর্থাৎ সন্ধ্যায় আলোকরশ্মিগুলি অন্ধকারে সংগুপ্ত হয়। প্রভাতে উষা এসে সে আলোর সন্ধান দেয়, ফিরিয়ে আনে সেই আলো।

ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকাহিনী উর্বশী-পুরূরবা সংবাদ সূক্ত। আচার্য ম্যাক্সমূলর এই সূক্তটিকে সূর্য-উষার প্রেমাখ্যান রূপে ভাষ্য করেছেন। উইলিয়ম কক্সও এ কে গ্রীক অর্ফিউস ও ইউরিডাইকের ন্যায় উষা-সূর্য প্রণয় কাহিনী বলে মনে করেন। বেবেরও এই মতের সমর্থক। কিন্তু এ, বি, কীথ এই প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও অতিকথায় এজাতীয় প্রাকৃতিক ঘটনামূলক যেসব কাহিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা দেখলে সূক্তটির প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে বাধা থাকে না। বিভিন্ন প্রাচান সভ্যতার অতিকথা থেকে অনুরূপ কাহিনী উদ্ধার করা যাক।

বিশ্বসভ্যতা ও সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে সুমেরে। খৃঃ পূঃ চার হাজার বছর আগের সুমেরের যেসব দেবস্তুতি, স্তোত্রগাথা, কাহিনী সম্বলিত মৃৎ ফলক পাওয়া গিয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রাকৃত শক্তির প্রতীক রূপে সেখানকার দেবদেবী মানবিক রূপ লাভ করেছে। সুমেরীয় পুরাণে অনু—আকাশ দেবতা, এনলিন—বায়ুদেব, নান্না বা সিন—চন্দ্রদেব, উতু, মার্হ্বক, শামস—সূর্য দেবতার বিভিন্ন রূপ। ইশতার বা ঈস্টার হচ্ছে চন্দ্রদেব কন্যা। প্রধানত প্রকৃতি দেবী—উদ্ভিদ জগতের উর্বরা শক্তির দেবী। কিন্তু একটি স্তোত্রে তাকে বলা হয়েছে আকাশকন্যা বা Light of heaven। দিন তার ভৃত্য আকাশ তার চন্দ্রাতপ, সূর্যের শ্রদ্ধেয়া তিনি।*

প্রাচীন বেবিলোনীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় ইশতার ও তাম্মুজ উপাখ্যান। মহাদেব ঈআর পুত্র তাম্মুজ আর কন্যা ইশতার, তাম্মুজ ছিলেন মেষপালক। বনস্পতি এরিডার তলায় যখন তিনি মেষ চরাচ্ছিলেন তখন প্রেমের দেবী উষা-ইশতার তাঁর প্রেমে পড়লেন। তাঁকেই বেছে নিলেন যৌবন সঙ্গী।

*Light of heaven, who like the fire (1)
Day (is thy) servant, heaven (thy) canopy (8)
The exalted of the sun god (11)
The lady of Ishtar (19)
—Accadean Hymn to Ishtar by Rev. A. H. Sayce pp 162

একদা তাম্মুজ নিহত হল বন্য বরাহের দন্তাঘাতে। নিহত তাম্মুজ নেমে গেলেন পাতালে মৃত্যুলোকে, আরালুতে। ইশতারের বোন এরেশকিগেল সেখানে কর্ত্রী। শোকার্ত ইশতার ঠিক করলেন আরালুতে যাবেন তাম্মুজের ক্ষত, বিশোধনী ফোয়ারার জলে ধুয়ে তাঁকে পুনর্জীবিত করতে। নরকের দরজায় এসে উপস্থিত হলেন ইশতার তাঁর অতুলনীয় রূপ নিয়ে। এরেশকি-গেল দ্বারীকে আদেশ করলেন প্রাচীন বিধি অনুযায়ী তাকে ভিতরে নিয়ে আসতে। নগ্ন না হয়ে কেউ আরালুতে প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং নরকের ৭টি দরজার প্রত্যেকটিতে একে একে মুকুট, দুল, হার, নেকলেশ, চন্দ্রহার, বালা, কাপড়, অন্তর্বাস ইশতারের সব বসন ভূষণ একে একে খুলে নেওয়া হল। তারপর তাঁকে আনা হল এরেশকিগেলের সামনে। তাঁকে দেখে ক্রুদ্ধ এরেশকিগেল অনুচর 'নামতার'-কে আদেশ করলেন ইশতারকে বন্দী করে রাখতে। ইশতার নরকে বন্দিনী তাই পৃথিবীতে লোকে ভুলে গেল প্রেম, পশুরা অনুভব করে না প্রজননের প্রেরণা। ফুল ফোটে না, ফল ফলে না, গাছপালা, তৃণলতা কিছুই আর জন্মায় না। জন সংখ্যা কমে যেতে লাগল, ফলে কমে যেতে লাগল দেবতার নৈবেদ্য। আতঙ্কিত দেবতারা এরেশকিগেলকে বললেন ইশতারকে মুক্তি দিতে কিন্তু ইশতার তাম্মুজকে না নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে যেতে রাজি নন। জয় হল ইশতারের। একে একে সাত দরজা পেরিয়ে তাঁর সমস্ত বসন ভূষণ অলঙ্কার ফিরিয়ে নিয়ে যেই পা দিয়েছেন পৃথিবীতে অমনি গাছ জন্মাল, ফুল ফুটল, ফলে শস্যে পূর্ণ হল বসুন্ধরা। এ কাহিনী প্রতি বছর বসন্তে পৃথিবীর উর্বরাশক্তির প্রকাশ আর শীতে তার বিলুপ্তির লোক কথা।

বেবিলোনীয় পুরাণে ইশতার হচ্ছেন উর্বরা শক্তির দেবী, পরে যুদ্ধেরও। তথাপি তাঁর স্বরূপে উষা রূপের আদি প্রেরণাও অনুমান করা যায়। গ্রীক পুরাণের ভেনাস অ্যাডোনেস এবং অর্ফিউস-ইউরিডাইকের অনুরূপ কাহিনীর উৎস হিসেবে ইশতার উপাখ্যানকে নির্দেশ করা হয়। প্রাচীন সুমেরের নগর রাষ্ট্র নিপ্পুর উৎখননের ফলে আদি সুমেরীয় সাহিত্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে দেবী ইনান্নার প্রেমিক তাম্মুজকে

মৃত্যুলোক থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য পাতালে অবতরণের কাহিনী।[১০৩] সুতরাং খৃঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দে রচিত এই কাহিনীকে বিশ্বসাহিত্যের অনুরূপ সব কাহিনীর আদি উৎস বলে বিবেচনা করা যায়। সুমেরীয় সাহিত্যে এই কাহিনী 'ইশতার-ইজদুবা' মহাকাব্যের মধ্যেও আছে। ইনান্নার মৃত্যুলোকে অবতরণ কাব্যে ইনান্না বারে বারে নিজেকে স্বর্গের রানী, আলোকের দেবী বলে উল্লেখ করেছেন। সুমেরীয় সভ্যতার আদি কালের ধর্মভাবনা যেসব মৃৎ ফলকে স্তব, স্তুতি, স্তোত্র গাথায় পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে সেখানকার দেবদেবাও প্রাকৃত শক্তি থেকে মানবিক রূপ লাভ করছে যা প্রায় ঋগ্বেদের অনুরূপ।[১০৪]

মিশরীয় পুরাণের প্রধান দেবতা 'রা' (Ra) হচ্ছে সূর্য—মধ্যাহ্ন সূর্য—মিশরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। খেপ্রি হচ্ছে সূর্যের সৃজনী শক্তির প্রকাশ রূপ, সম্ভবত বৈদিক সবিতার সমার্থক। মেন্টুও উদয়কালীন সূর্য, আত্মু—অস্তাচলগামী সূর্য। আমুন—সূর্যের আবৃত সত্তা বা গোপন শক্তি। আটন হচ্ছে 'রা'-র মতোই সূর্য গোলক—বেদের শিপিবিষ্ট, গ্রীক পুরাণের কেফা-লোস। সূর্যের এই সমস্ত বিচিত্র রূপ সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে।

মিশরের আদি মাতৃ দেবতা ইসিস 'রা'-এর ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর যাতায়াতের পথে অপেক্ষা করতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ-রা অতি কষ্টে পথ চলেন। চলতে মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ে। ইসিস সেই লালার সঙ্গে ধুলো

১০৩। Sumerian Mythology by S. N. Kramer pp 86
Harper Torch Books

১০৪। But the rest are the product of the new impulse of an age which had forgotten in part, the nature origin of the myths, it was so busy in creating and which was founding its gods in the powers of light and harmony in the sun god the moon god and the sky. The very phrases and metaphors that are used in this odd hymns are to be found in the sanskrit hymns of the Rigveda—Babylonian Literature by Syce A. H. Samuel Bagster & Sons, London pp 42

মিশিয়ে এক বিষধর সাপ সৃষ্টি করে পথের পাশে রেখে দিলেন। 'রা' যখন সেই পথে যাচ্ছিলেন তখন সাপ তাঁকে কামড়াল। দংশনের বিষের ব্যথায় 'রা' সব দেবতাদের ডাকলেন সাহায্যের জন্য কিন্তু কেউ তাকে রক্ষা করতে পারল না। শেষে ইসিস এসে বললেন 'রা' যদি তাঁর গোপন নামটি বলেন তাহলে তিনি তাঁকে বাঁচাতে পারেন। 'রা' বললেন, তিনি সকালে 'খেপ্রি', দুপুরে 'রা' আর বিকেলে 'তেমু' কিন্তু তাতেও কিছু হলনা। তখন 'রা' ইসিসকে তাঁর হৃদপিণ্ড উপড়ে নিতে বললেন, যেখানে তাঁর গোপন নাম লেখা আছে। ইসিস তখন তাঁর বিষের জ্বালা দূর করলেন। কিন্তু এর ফলে 'রা'র ক্ষমতার প্রাধান্য কমে গেল। এই কাহিনীর পিছনে প্রাকৃতিক ঘটনার দেবায়ন, তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

মিশরীয় সাহিত্যে অনুরূপ আর একটি কাহিনী পাওয়া যায়। —সূর্য-দেবতা অসিরিস, আকাশ দেবতা নুট আর পৃথিবী দেবী কেব (Keb)-এর সন্তান। দেবী ইসিস আর অকল্যাণের দেবতা সেত ও তাঁদের সন্তান। অসিরিস দেবী ইসিসের স্বামী। অকল্যাণের দেবতা সেত—এর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলেন অসিরিস। ইসিস পাখি হয়ে করুণ চিৎকারে নেমে এলেন মাটিতে। পাখার বাতাসে অসিরিসকে বাঁচিয়ে আলিঙ্গন করে গর্ভবতী হন তিনি। জন্ম নিলেন হোরাস (Horus)। যতদিন না প্রসব হয় ইসিস এসে পালিয়ে রইলেন নলবনে। ছেলেকে লুকিয়ে রেখে একদিন মন্দিরে গেলেন পুজো দিতে। তাঁর অনুপস্থিতিতে সেত—এর প্রেরিত একটি কাঁকড়া বিছের কামড়ে মারা গেলেন শিশু হোরাস। ইসিসের করুণ কান্নায় এসে যোগ দিলেন ভগ্নী 'নেপাথস'। তিনি ইসিসকে বললেন, 'রা'—এর নৌকার মাঝিদের বাওয়া বন্ধ করার জন্য প্রার্থনা করতে। ইসিসের প্রার্থনা শুনে 'রা'—এর নৌকা থেকে সাহায্যকারী দেবতা 'থট' এলেন। তিনি জীবন প্রবাহ সঞ্চার করে 'হোরাস' কে বাঁচালেন। 'রা' হোরাসকে তার বংশধর স্বীকার করে নিলেন। হোরাস শব্দের অর্থ—যা উপরে বা উচ্চে। নতুন প্রভাত সূর্যই বোধ হয় হোরাস। এ কাহিনীতে রাতের আগমনে সূর্যের মৃত্যু এবং পৃথিবীর প্রার্থনায় তাঁর পুনরুজ্জীবনের কাহিনী।

সমগ্র গ্রীক পুরাণে সৌর কাহিনীর প্রাধান্য সকলেরই চোখে পড়ে।

সদৃশ কিছু কাহিনী এখানে উপস্থিত করা গেল। দেবরাজ জিউস, পত্নী আলেমেন (Alomene)-এ উপগত হলে হেরাক্লিসের জন্ম হয়। জিউস পত্নী হেরার ভয়ে আলেমেন শিশুটিকে ফেলে রাখে। শিশুর কান্না শুনে দেবী আথেনী হেরাকে আদেশ করেন শিশুটিকে পালনের জন্য। হেরা যেই তাকে স্তন পান করাতে গেলেন শিশুটি অমনি তাঁর স্তন কামড়ে দিল। হেরা তখন তাকে ফেলে দিলেন। হেরার স্তন থেকে যে দুধ ঝরে পড়েছিল তাই হচ্ছে আকাশের ছায়াপথ (Milkway)। আথেনী তারপর আলেমেনকে আদেশ করলেন শিশুটি পালন করতে। নিজের সন্তানকে তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন। আলেমেন শিশুটিকে দুধ খাইয়েছে জানতে পেরে হেরা তাকে হত্যা করতে দুটি সাপ পাঠিয়ে দিলেন। সাপ দুটো শিশু হেরাক্লিস টিপে মেরে ফেলেন।

হেরার উস্কানীতে মাইসেনিয়ার রাজা ইউরিস্থেউস, কন্যা আইওল (Iole) এর পাণিপ্রার্থী হেরাক্লিসকে বার বছর বারটি কর্ম সম্পাদনে বাধ্য করে। কার্যান্তে হেরার অভিশাপে উন্মত্তাবস্থায় মেগারার শিশুদের সে হত্যা করে। প্রকৃতিস্থ হয়ে পত্নী দীঅনারাকে (Deaneira) ত্যাগ করে আইওলকে বিয়ে করতে চাইলে তার পিতা ইউরিস্থেউস, কন্যার ভাগ্য মেগারার মতো হতে পারে এই আশঙ্কায় আপত্তি করলেন। সে যুদ্ধ করে আইওলকে বন্দী করে নিয়ে আসে। জিউসের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার জন্য পোষাক চাইলে স্বামীকে বশ করার আশায় স্ত্রী দীঅনীরা হয়মানব নেস্সুসের রক্তে সাদা পোষাক ছুপিয়ে দিলেন।

একদা দীঅনীরাকে নদী পার করার সময় নেস্সুস তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। হেরাক্লিস বিষাক্ত তীর মেরে তাকে হত্যা করেন। প্রতিশোধ স্পৃহায় মরার সময় সে দীঅনীরাকে তার রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে বলে। তাঁর স্বামী যদি অন্যের প্রতি আসক্ত হয় তবে এই রক্ত তাঁর স্বামীকে ফিরিয়ে আনবে।

এদিকে যজ্ঞাগ্নির শিখায় বিষাক্ত রক্তে ছোপান পোষাকের বিষ উষ্ণ হয়ে হেরাক্লিসের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠল। মরার আগে ছেলে হিয়েলুসকে বললেন তাঁকে চিতায় শুইয়ে দিতে এবং আইওলকে বিয়ে করতে। দীঅনীরা আত্ম-

হত্যা করল। —এ কাহিনী সৌর উপাখ্যান বলে স্বীকৃত। হেরক্লিস-সূর্য, জিউস বা আকাশের পুত্র। তুলনীয় দিবিস্পুত্র—দিবি:>দিবিস্>জিউস। দীঅনীরা হচ্ছে দিনের উজ্জ্বল দীপ্তি আর আইওল হচ্ছেন উষা। শব্দটি ion আইঅন থেকে জাত যার অর্থ বেগুনি এবং সম্ভবত সূর্যোদয়ের আগের আকাশের বেগুনি আভাযুক্ত মেঘ।

হেরাক্লিসের ভয়ঙ্কর ক্রোধ আর উন্মত্ততা হচ্ছে মধ্যাহ্ন সূর্যের তীব্র কিরণ। হেরাক্লিস অস্থির চিত্ত। একবার মধ্যাহ্ন দীপ্তি দীঅনীরাকে আবার উষা আইওলকে চেয়েছেন। আবার যখন দীঅনীরার কাছে এসেছেন তিনি তাঁকে লাল রক্তে ছোপান জামা পরিয়ে মৃত্যুর কারণ হয়েছেন। পশ্চিম আকাশে রক্তরঞ্জিত মেঘে সূর্যের অস্তগমনই বোধ হয় এই কাহিনীর প্রকৃত অর্থ। "তাই আমরা প্রায়ই হেরাক্লিসকে সূর্যদেবতা রূপে দেখতে পাই। তাঁর দ্বাদশ শ্রমকে মনে করা হয় দ্বাদশ রাশি অতিক্রমণ।"[১০৫]

আর একটি কাহিনী গ্রীক দেবতা কেফালোস-এর (Kefalos)। যিনি সূর্য গোলকের দেবরূপ। কেফালোস প্রক্রিসের স্বামী। ঈঅস বা উষাদেবী ভালোবাসত তাঁকে। প্রাক্রিস তাঁকে ত্যাগ করে যেতে চায়। ঈঅসের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কেফালোস স্ত্রী প্রক্রিসের সতীত্ব পরীক্ষার জন্য অনেকদূর যাচ্ছি বলে ছদ্মবেশে তখনি ফিরে আসে। আলিঙ্গন প্রার্থনা করলে প্রথমে অস্বীকৃত হলে পরে সম্মত হয় প্রক্রিস। কেফালোস তখন ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করলে লজ্জায় প্রক্রিস গৃহত্যাগ করে। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত কেফালোস একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করছিল। তাঁকে দেখে সঙ্গে ঈঅস আছে কিনা সন্দেহ করে দেখবার জন্য ঝোপের মধ্যদিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে প্রক্রিস অগ্রসর হয়। শব্দ শুনে কোন বন্য জন্তু মনে করে কেফালোস দেবী ডায়েনা প্রদত্ত অব্যর্থ বর্শা ছুঁড়ে মারে। শেষে দেখতে পায় যে স্ত্রীকেই হত্যা করেছে। কেফালোস অনুশোচনায় সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করে।—"এটি একটি সৌর অতিকথা, প্রক্রিস (প্রত্যূষ) হচ্ছে শিশির শিশু যে কেফালোস বা প্রভাত সূর্য কর্তৃক নিহত। ঈঅস বা উষা কর্তৃক তিনি প্রলুব্ধ। বর্শা হচ্ছে সূর্য কিরণ।

১০৫। Mythology of Greece and Italy by Thomas Keightly

কেফালোসের অন্বেষণ তাঁকে আকাশের প্রান্তে নিয়ে যায় দিনশেষে তার মৃত্যুতে।”[১০৬]

তারপর ধরা যাক অ্যাপোলো-ড্যাফনী আখ্যান। পেনেউস কন্যা ড্যাফনী ছিলেন পরম সতী। তাঁর রূপে মুগ্ধ সূর্য দেবতা ফীবাস তাঁকে চাইলেন। দ্রুত ছুটে পালালেন ড্যাফনী। ফীবাস ও ছোটেন পিছে পিছে। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত শঙ্কিত ড্যাফনী দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁকে রক্ষা করার জন্য। ফীবাস যেই তাঁকে যাবেন আলিঙ্গন করতে তখনি দেবতারা তাঁকে লরেল গাছে পরিণত করে দিলেন।

“সূর্য ভালোবাসে উষাকে। ফীবাস (সূর্য) কখনো বিশ্বস্ত হতে পারে না তাই ড্যাফনী (উষা) তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে যান। ফীবাসও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু সূর্যের আলিঙ্গন মানে মৃত্যু—উষার নিশ্চিত মৃত্যু।”[১০৭] সূর্যের উষার পশ্চাদ্ধাবন ঋগ্বেদেও[১০৮] আছে। ড্যাফনী শব্দটি ম্যাক্সমুলর দেখিয়েছেন গ্রীক Δα(Da) বা দহ ধাতু নিস্পন্ন অর্থ দহন করা। ঋগ্বেদের দহনা বা অহনা সদৃশ শব্দ। অহনা অর্থে উষার প্রয়োগ দেখা যায়। ফীবাস অর্থ উজ্জ্বল আলো। গ্রীক পুরাণে সূর্যেরই এক নাম।[১০৯]

সুমেরীয় ইশতার উপাখ্যানের গ্রীক রূপ পাওয়া যায় অর্ফিউস-ইউরিডাইক উপাখ্যানে। অ্যাপোলো আর ক্যালিপসোর পুত্র অর্ফিউস সঙ্গীতে পারদর্শী। গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ইউরিডাইক তাঁকে বিয়ে করল। আরিস-টাউসের হাত থেকে পালাতে গিয়ে একটা সাপকে মাড়িয়ে দেওয়ায় তার কামড়ে মারা গেলেন ইউরিডাইক। তাঁর আত্মা এল পাতালে মৃত্যুলোকে। অর্ফিউসের কাতর প্রার্থনায় দেবরাজ জিউস তাঁকে পাতালে যাবার অনুমতি

১০৬। Dictionary of Mythology Folklore and Symbol by Gertrude Jobbes

১০৭। Mythology of Greece and Rome

১০৮। সূর্যোদেবীমুষসং রোচমানা মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ। ঋ ১।১১৫।২

১০৯। The Mythology of Ancient Greece & Italy by Thomas Keightly p 103

দিলেন। তাঁর অদ্ভুত গান[১১০] আর কাতর অনুনয় শুনে এবং স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা দেখে পাতাল রাজ হেদিস এবং তার স্ত্রী প্রসারপিন বিচলিত হয়ে তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলেন। সর্ত ছিল—মর্ত্যলোকে না ফেরা পর্যন্ত পিছনে তাকাতে পারবেনা। সানন্দে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জীব জগতে ফেরার ঠিক আগে কৌতূহল, আগ্রহ আর সংশয়ে ফিরে তাকালেন অর্ফিউস এবং তখনি তার স্ত্রীর অন্তর্ধান।—সুন্দরী সন্ধ্যার (উষার) জন্য অর্ফিউসের (সূর্য) কাতর সঙ্গীত যেন শোনা যাচ্ছে। রাতের সর্পদংশনে সে চলে গেছে অন্ধকার মৃত্যু-লোকে। অর্ফিউস তাঁকে অন্ধকার লোক থেকে ফিরিয়ে আনলেন জীবলোকে (উষালোকিত জগতে)। কিন্তু দিবসের দুয়ারে যেই অর্ফিউস তাকিয়েছেন (সূর্যের উদয়) অমনি তার অন্তর্ধান।

দেবী আথেনীর সঙ্গেও উষার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। আথেনী মিশরীয় ইসিস এবং বৈদিক উষসের সমগোত্রীয়।[১১১] পিণ্ডারের বর্ণনা অনুযায়ী আথেনীর জন্ম হয় দেবরাজ জিউসের মাথা চিরে। ম্যাক্সমূলর দেখিয়েছেন জিউস বৈদিক দ্যৌঃর গ্রীক রূপ অর্থাৎ আকাশ। আকাশ চিরেই ত রক্তাক্ত উষার আবির্ভাব। হেসিয়ড অনুযায়ী তাঁর প্রধান কর্তব্য মানুষকে নিদ্রা থেকে জাগানো। ঋগ্বেদে উষার এই দায়িত্বের কথা আছে।[১১২] সুতরাং প্রাকৃত সৌর ঘটনার মানবিক রূপারোপ বিভিন্ন অতিকথার সাক্ষ্যে মিথ্যাবলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ বেদবিদ্যাবিদ অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী বৈদিক সাহিত্যে আমার পথ প্রদর্শক। তিনি আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সহমত নন। তিনি সুপ্রচুর তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যান রাজবৃত্ত থেকে উদ্ভূত। তাঁর অনুমতি ক্রমে তাঁর বক্তব্য এখানে উপস্থিত করে কৃতার্থ বোধ করছি।

১১০। The Mythology of the Aryan Nations by Rev G. Cox p 48

১১১। Dictionary of Mythology Folklore and Symbol p 18

১১২। ঋ ১।৪৮।৫

তিনি শতপথ ব্রাহ্মণে বিবৃত উপখ্যানের বক্তব্যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন—

(১) উর্বশী কর্তৃক "ঐড়" (ঐল) রূপে পুরূরবাকে সম্বোধন পুরূরবা ইড়া বা ইলার পুত্র।

(২) পুরূরবা ও উর্বশীর পুত্র পুরাণে উল্লিখিত আয়ু। প্রবর তালিকায় ক্ষত্রিয়দের দুই শাখার যজ্ঞস্থলে উপবীতের গ্রন্থিবন্ধন কালে উচ্চার্য নির্দিষ্ট প্রবর-ঋষি মনু, ইলা ও পুরূরবা। চন্দ্রবংশের আদিমাতা ইলা ও প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রের পৌত্র বুধের পুত্র পুরূরবা। সূর্যবংশের আদি পিতা সূর্য পুত্র মনু। এস্থলে সূর্য টটেম থেকে মনুর জন্ম ও চন্দ্র টটেম থেকে চন্দ্র বংশের উদ্‌ভব অনুমেয়।

(৩) পুরূরবা তাঁর উর্বশীজাত পুত্রের সাথে গন্ধর্ব প্রদত্ত অগ্নি গ্রহণ করে। এই অগ্নির অশ্বত্থ বৃক্ষে প্রবেশের তাৎপর্য অনুসারে অগ্নিমন্থনের উত্তরারণি ও অধরারণি নির্মিত হয় অশ্বত্থশাখা দিয়ে।

(৪) শতপথ ব্রাহ্মণে কোথাও উত্তরারণি রূপে পুরূরবাকে ও অধরারণি রূপে উর্বশীকে বর্ণনা করা হয় নাই।

পুরূরবা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। উর্বশী স্বৈরিণী নারী। স্বর্বেশ্যা রূপে আখ্যাত হতে তাঁকে দেখা যায়।

মনুকন্যা ইলা—এই পৌরাণিক জনশ্রুতির প্রচলন বৈদিক সাহিত্যেও ছিল—ইড়া বৈ মানবী (মনু কন্যা)। —তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।১।৪

ইড়া এব মে মানবী অগ্নিহোত্রী (মনোঃ দুহিতা—সায়ণ)।

শত ব্রা ১১।৫।৩।৫

বৈদিক সাহিত্যে মহাপ্লাবনের কাহিনীর রূপ পরিবর্তিত হয়েছে পৌরাণিক বিবরণে। শতপথ ব্রাহ্মণ অনুযায়ী মহাপ্লাবনের কালে সকলেই বিনষ্ট হয়। একমাত্র মনু বেঁচে থাকেন। তিনি মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বেঁধে ভেসে বেড়ান। তিনি প্রজাকাম হয়ে পাকযজ্ঞ করলেন। ঘৃত, দধি দিয়ে হোম করলেন। অগাধ জলে জন্ম নিল এক কন্যা। মিত্র ও বরুণের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি জানালেন যে তিনি মনুর কন্যা (মনোঃ দুহিতা) মনুর প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে তিনি জলে যে আহুতি দিয়েছিলেন তার থেকেই তাঁর জন্ম। যজ্ঞে তাঁকে কল্পনা

করে আহুতি দিলে প্রজাও পশু লাভ হয়। মনু তাঁকে যজ্ঞে কল্পনা করলেন। এরপর মনুর বংশধারা উদ্ভূত হল। এই ইলা (ইড়া) ও পুরোডাশের অভেদ বিবৃত হয়েছে। এস্থলে বলা যায় পুরোডাশ আহুতির রীতি থেকে ইলা কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু তা সঙ্গত হয় না। পৌরাণিক জনশ্রুতি বৈদিক যুগে গাথা রূপে প্রচলিত ছিল। পুরাণের নানা বিবরণে মনু কন্যাই ইলা। চন্দ্র পুত্র বুধের সঙ্গমের ফলে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। পুরূরবা ও জনৈক স্বৈরিণী উর্বশীর মিলনের ফলে আয়ুর জন্ম হয়। মনুর সঙ্গে যোগ রেখে ঐল পুরূরবার বংশ কথার পত্তন। Pargitar এর Ancient Indian Historical Tradition-এ এই সিদ্ধান্ত। হেম রায়চৌধুরী Political history of ancient India গ্রন্থে চন্দ্রবংশ ধারাব আদি অংশ বাদ পড়লেও Vedic Age গ্রন্থে চন্দ্র বংশের আদি অংশ অনেকটাই গৃহীত। Pargiter এর সিদ্ধান্তই অধিক গ্রহণ যোগ্য।

ডাঙ্গে পন্থীরা এক্ষেত্রে যজ্ঞকে বলেছেন means of production বা উৎপাদনের হাতিয়ার। কিন্তু বস্তুত যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানটি জাদু বিশ্বাস (magic) মিশ্রিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বিশুদ্ধ জাদু অনুষ্ঠানে জাদু দ্রব্য ও জাদু মন্ত্রই থাকে। বৈদিক যজ্ঞে দেবস্তুতিব বাহুল্য এই অংশে যজ্ঞ ধর্মীয় লক্ষণ যুক্ত। তান্ত্রিক পূজায় জাদু অংশও ধর্মীয় অংশও আছে। জাদু অংশ বৃত্ত অঙ্কন পূর্বক পূজা। বিনাশকারী অপদেবতাদের 'ওম অস্ত্রায় ফট' মন্ত্র দ্বারা অপসারণ করা হয়। এ ছাড়া ঘটের নিচে স্ত্রী দেবতার পূজাব নিম্ন মুখ ত্রিকোণ চিহ্ন (=যোনি চিহ্ন ▽) এবং পুং দেবতার পূজায় উর্ধ্ব মুখ ত্রিকোণ চিহ্ন (=লিঙ্গ চিহ্ন △) অঙ্কন করার যাদুরীতি আছে। পূজা স্থানে দেবদেবী স্তুতি ও কাম্য বস্তুর উল্লেখ থাকে। তান্ত্রিক পূজা বৈদিক যজ্ঞের মতো কাম্য কর্ম।

পূজায় স্ত্রীদেবতা যোনিচিহ্ন দ্বারা ও পুংদেবতা লিঙ্গ চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করার বিধি আছে এবং মন্ত্র ও দেবতার অভেদ কল্পনা করা হয়—মন্ত্র দেবয়োঃ অভেদঃ। বীজমন্ত্রের মধ্যে দেবতা নিগূঢ়। যথা ক্লীং কৃষ্ণের বীজমন্ত্র-এর মধ্যে মানবীয় দেবতা কৃষ্ণ নিগূঢ়। ভারতে মহামানবের দেবত্বে উন্নয়ন প্রাচীন রীতি। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামের দেবত্ব ইতিহাসে কল্পনা সংযোজন মাত্র। হ্রীং দুর্গা

চণ্ডীর বীজমন্ত্র। মন্ত্রের মধ্যে দেব বা দেবী অস্ফুট থাকেন যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ নিগূঢ় থাকে। মাটি জল বাতাসের সংস্পর্শে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় বৃক্ষে তেমনি মন্ত্রশক্তি জাগ্রত হলে মন্ত্র দেব বা দেবীরূপে প্রকটিত হন ভক্তের সম্মুখে। সমীকরণ পদ্ধতি তান্ত্রিক যন্ত্রে যেমন (রেখাঙ্কনে) দেখা যায় তেমনি এর বাহুল্য ব্রাহ্মণ সাহিত্যে যজ্ঞীয় উপকরণ, যাজক যজমান বর্ণনা প্রসঙ্গে। পূজা স্থলে যেমন শাস্তর (পাঁচালী বা কাহিনী বা মেয়েলি ব্রতকথা) বলবার রীতি এখনও চালু আছে তেমনি যজ্ঞস্থলে গাথা বা পুরাণীগাথা ছড়া কেটে আবৃত্তি করার প্রচলন ছিল।

শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতায় ত্রিংশ অধ্যায় পুরুষমেধ যজ্ঞ সম্পর্কিত। এস্থলে সবিতা বিষয়ক গায়ত্রী মন্ত্রটি হচ্ছে ঃ—তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (বা সং ৩০।২) উপনয়নের পরে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেব উচ্চার্য মন্ত্র।

ঐল ধারাই প্রধান ক্ষত্রিয় ধারা। মনুব হাঁচি থেকে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়। ইক্ষ্বাকু সূর্য বংশের আদি পিতা। ক্ষত্রিয় প্রবরে মনু, ইলা ও পুরূরবার উল্লেখ তাৎপর্য পূর্ণ। এই প্রবর সূর্যবংশের ও চন্দ্র বংশর রাজারা যজ্ঞস্থলে সমভাবে উচ্চারণ করতে পারতেন। মনু থেকে ইক্ষ্বাকু···রঘু···রাম···কুশ এইভাবে সূর্য বংশ ধারার বিকাশ। মনুকন্যা ইলা থেকে পুরূরবা···আয়ু···যযাতি··· পুরু···কুরু ···পাণ্ডু···এইভাবে চন্দ্রবংশ ধারার উদ্ভব। ইলা ও ইক্ষ্বাকুর অলৌকিক জন্ম বিবরণ বাদ দিলে পৌবাণিক বংশ ধারার অর্গল মোচন হবে।

জনক দুহিতা সীতার জন্ম বিবরণ মীথলজির কুয়াশাচ্ছন্ন। সীতা লাঙ্গল চিহ্নিত রেখা। তিনি পৃথিবী কন্যা, জনক পালিতা। 'তিনি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন কৃষি ব্যবস্থার প্রতীক মাত্র এই ব্যাখ্যা নিলে প্রবল পৌরাণিক জনশ্রুতিকে পাশ কাটান হয়। জনক রাজা তাঁকে কৃষি ক্ষেত্রে কুড়িয়ে পান এই ব্যাখ্যা সঙ্গততর।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে রূপকের ছড়াছড়ি এবং এর ফলে সমীকরণ অপরিহার্য। যথা—প্রজাপতিঃ যজ্ঞঃ শঃ ব্রাং ৩।২।২।৪ বাক্‌বৈ যজ্ঞঃ—শঃ ব্রা ৩।২।২৩

অগ্নিঃ যজ্ঞঃ—শ ব্র ৪।২।২।৯

যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় তাই অগ্নিও যজ্ঞের

অভেদ কল্পনা। যজ্ঞে মন্ত্র বাহুল্য। মন্ত্রই বাক্। সুতরাং বাক ও যজ্ঞের অভেদ কল্পনা। যজ্ঞানুষ্ঠান করলে প্রজা ও পশু লাভ হয় তাই যজ্ঞই প্রজাপতিরূপে কল্পিত।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত অনুসারে বিরাট পুরুষ থেকে জগৎ সৃষ্টি কল্পিত হয়েছে। পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্—যা কিছু হয়েছে বা হবে সবই পুরুষ। কিন্তু যজ্ঞ ব্যতিরেকে ত সৃষ্টিও হতে পারে না। বিশ্ব সৃষ্টির বিরাট যজ্ঞে বিরাট পুরুষই কল্পিত হয়েছেন যজ্ঞীয় পশুরূপে।

দেবাঃ যৎ যজ্ঞম তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষম্ পশুম্॥

সায়নের ব্যাখ্যা অনুসারে দেবতারা মানস যজ্ঞের পশুরূপে গণ্য হয়েছেন বিরাট পুরুষ। তাঁকে কল্পনায় বাঁধলেন দেবগণ এবং যজ্ঞ থেকে সৃষ্টি কর্ম সম্পন্ন হল। ঋ ১০।৯০।২, ১৫

পুরুষ মেধ যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কিত ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত। যজ্ঞে হনন যোগ্য মনুষ্যরূপী পশুর তালিকা ৩০ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নরবলি হত না। মনুষ্যরূপী পশুর চারদিকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়ে তাকে বন্ধন মুক্ত করা হত।

অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজার চারি পত্নীর সহিত যাজকগণের অশ্লীল ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে বাজসনেয়ি সংহিতার অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে। শ্বাসরোধ পূর্বক নিহত যজ্ঞাশ্বের সহিত মহিষীর আবৃত অবস্থায় মৈথুনাভিনয় উর্বরতামূলক জাদুক্রিয়ার নির্দশন। ডাঙ্গে পন্থীরা এস্থলে যৌন সাম্যবাদের নজীর সন্ধান করেছেন। শ. ব্রা. ১৩।৫।২।২-৮

যজ্ঞীয় পাত্রাদি, অগ্নি, আহুতি প্রভৃতির খুঁটিনাটি বিবরণে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ছোট বড় কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও গাথার উল্লেখও আছে। যাজকেরা যজ্ঞকে ঋক্ যজুঃ ও সাম মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং যজ্ঞের প্রত্যেক মন্ত্রের ব্যাখ্যায় কাহিনীর অবতারণা করেছেন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সুবিশাল থিওলজির বৈশিষ্ট্য যুক্ত। এতে যজ্ঞীয় মনন পরিস্ফুট। একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি বলে সাধারণ পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর হলেও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার উৎস বিশেষ। গৃহ্যসূত্র থেকে বৈদিক আর্যদের সামাজিকও পারিবারিক জীবনের যেমন বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় এমন গ্রীক বা সেমেটিক ইহুদি

আরবদের সম্পর্কে জানা যায় না। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা রাজাগণের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনা না করলেও (ব্যতিক্রম রাজতরঙ্গিনী, হর্ষচরিত ইত্যাদি) তাঁরা history of the people বা জনগণের ঐতিহ্য রক্ষা করে গেছেন। এখানেই ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য।

অগ্নি সমিন্ধন ক্রিয়াটি পুরূরবা সম্পন্ন করেছিলেন অশ্বত্থের থেকে উত্তরারণি ও অধরারণি নির্মাণ দ্বারা। শতপথ ব্রাহ্মণে উত্তরারণি রূপে পুরূরবা ও অধরারণি রূপে উর্বশী কথিত হন নাই। (শ ব্রা ১৩।৫।১।১-১৩)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অগ্নি মন্থন ক্রিয়ার বর্ণনা আছে। অরণি ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মন্থন প্রতিবন্ধক রক্ষস দূরীকরণের জন্য রক্ষোঘ্ন মন্ত্র (ঋক) পাঠ করা হয়, সামিধেনা মন্ত্র পাঠ করা হয়। সামিধেনী ঋক মন্ত্র। ঐ ব্রা ১।৩।৫ ; ১।১।১।

এস্থলে উত্তরারণি ও অধরারণির সঙ্গে কোন মনুষ্যের সমীকরণ দৃষ্ট হয় না।

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র অনুসারে ক্ষত্রিয় প্রবর :—মানব, ঐড় পৌরূরবস ইতি—২৪।১০।১০,১ । বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রের অন্তর্গত প্রবর প্রশ্ন অনুসারে ক্ষত্রিয়ানাং ত্র্যার্ষেয় প্রববঃ ভবতি মানব ঐড় পৌরূববস ইতি। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের প্রবর তিন ঋষির বা রাজর্ষির নাম যথা, মনু, তৎ কন্যা ইড়া বা ইলা, ইলাপুত্র পুরূরবা। উভয় শ্রৌত্র সূত্রেই পুরূরবাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে গণ্য করা হয়েছে। A. D. Pusalkar বলেছেন—

There is hardly any doubt that the royal geneologies in the Puranas embody many genuine historical tradition of great antiquity···It has been pointed out by Pargiter that the Puranic account is corroborated in many respects by Vedic Texts.—P. 271, Vedic Age

তাঁর মতে বৈবস্বত মনু মহাপ্লাবনে রক্ষা পেয়ে মানব বংশের প্রবর্তন করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইল ইলা রূপে পরিণত হন। ইলার বিবাহ হয় বুধের সঙ্গে। বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। পুরূরবা থেকে ঐল বংশ

শুরু হয়। ibid p. 276. মনু পুত্র ইক্ষ্বাকু থেকে সূর্য বংশের পত্তন হয়। ibid p. 276

বৃহদ্দেবতা অনুসারে—পুরূরবসি রাজর্ষৌ অপ্সরাঃ তু উর্বশী পুরা। স্বধসদ্ সংবিদং কৃত্বা তস্মিন ধর্ম্মং চচার চ ॥ ৭।১৪৩ ; ঋ ১০।৯৫

এ স্থলেও পুরূরবা ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে প্রতিভাত। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে—পুরূরবাঃ তু অতিদানশীলঃ অতিযজ্বা অতিতেজস্বী যং উর্বশী দদর্শ। ইত্যাদি। ৪।৬।২০—৩০

ঐতিহাসিক গবেষণায় বিষ্ণুপুরাণের নজীরের বিরাট গুরুত্ব। পুরূরবার সঙ্গে অগ্নিমন্থনের উত্তরারণির সমীকরণ হচ্ছে যজ্ঞীয় সমীকরণ রীতির একটি নমুনা মাত্র। এর দ্বারা পুরূরবার অনৈতিহাসিকতা প্রমাণিত হয় না। এর তাৎপর্য হচ্ছে উত্তরারণিকে পুংচিহ্ন রূপে বিবেচনা। পুরূরবা ও উর্বশীর রতি-ক্রিয়ার উপমা সামনে রেখে অগ্নি সমিন্ধনের কঠিনসাধ্য ক্রিয়াটিকে বুঝতে সুবিধা হয়। ইত্যাদি।

উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানের উদ্ভবের নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য আমি উপস্থিত করেছি। আচার্য ম্যাক্সম্যুলরের মিথোলজিকাল বা অতিকথামূলক ভাষ্যকে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেছি। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী ঐতিহাসিক প্রকল্প উপস্থিত করে উপাখ্যানের উদ্ভব রহস্যের এক তৃতীয় মাত্রা সংযোজনা করে সামগ্রিকতা দিয়েছেন। বৈদিক যুগ চারহাজার বছর পূর্ববর্তী তার রীতি নীতির উদ্ভব আরো বহুকাল আগের, কাজেই সে সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত গাণিতিক সিদ্ধান্ত করা চলেনা। অন্যতর প্রকল্পের বা ব্যাখ্যার অবকাশ সর্বদাই থেকে যায়।

আমার ধারণা আমি যে উদ্ভব তত্ত্ব উপস্থিত করেছি তা কেবল নৃতত্ত্ব সম্মতই নয়, উদ্ভবের সঠিক ব্যাখ্যাও। তবে আমি যেমন মেনে নিয়েছি যে পরবর্তী কালে ম্যুলর কথিত সূর্য উষা প্রণয়বৃত্ত উপাখ্যানের পূর্ণাঙ্গ রূপদানে কাজ করেছে তেমনি অধ্যাপক গোস্বামীর রাজবৃত্ত মেনে নিতেও আমার আপত্তি নাই। অধ্যাপক গোস্বামী তাঁর বক্তব্য নিবদ্ধ রেখেছেন পুরূরবার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব প্রমাণে। উর্বশীকে তিনি উপেক্ষা করেছেন, 'জনৈকাস্বৈরিনী' মাত্র বলে। অপ্সরা উর্বশীর কাহিনী যে অনৈতিকহাসিক একথা তিনি নিশ্চয়ই

মেনে নেবেন। আমি কোথাও পুরূরবাকে অনৈতিহাসিক বলি নাই। পুরূরবা নামে একজন রাজা প্রাচীনকালে ছিলেন একথা মেনে নিতে আপত্তি নাই। মোটকথা মংক্কত নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পুরুষ নারী, ম্যুলরের সূর্য উষা আর অধ্যাপক গোস্বামীর মহারাজ পুরূরবা ও স্বৈরিণী—এই ত্রিবিধ উপাদানই এই উপাখ্যানের মধ্যে মিলেমিশে রয়েছে। পণ্ডিতেরা বিচার করে দেখবেন কোন প্রকল্পটি কতদূর সত্য।

চতুর্থ অধ্যায়

পৌরাণিক আখ্যান

এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য আ-বৈদিক পৌরাণিক সাহিত্যে প্রাপ্ত উপাখ্যানগুলির কাব্যোৎকর্ষ বিচার। এই অধ্যায় তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত— (১) বৈদিক রূপ (২) পৌরাণিক কাহিনী (৩) অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের রূপ।

॥ বৌদিক উপাখ্যান ॥

বৈদিক সাহিত্যে উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানের যে কয়েকটি রূপ আছে তার মধ্যে ঋগ্বেদের সংবাদ সূত্রটিই প্রাচীনতম এবং কাব্যকৃতি হিসেবে শ্রেষ্ঠ। যজুর্বেদের উল্লেখ বা কাহিনী বীজ ঠিক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। ঋগ্বেদে উপাখ্যানটি নাট্যকাব্য রূপে উপস্থাপিত প্রেমগীতি হার। বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রে কাহিনীটি যে ভাবে লিখিত তা প্রায় আধুনিক ছোট গল্পের মতো। সাহিত্যোৎকর্ষ বিচারে একে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনী বর্ণনামূলক পৌরাণিক আখ্যায়িকার সমতুল্য। বৃহদ্দেবতা বা কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র তথা সর্বানুক্রমণীতে পুরাণের প্রাথমিক রূপ। পণ্ডিতদের মতে পূর্ণ আখ্যানটি ছিল গদ্য পদ্যে মিশ্র গাথারূপে—যার নমুনা পাই শতপথ ব্রাহ্মণে। উক্তি প্রত্যুক্তিগুলি পদ্যে আর বর্ণনাংশ গদ্যে। ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তে এর কাব্যাংশ মাত্র উদ্ধৃত। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫নং সূক্তের ১৮টি ঋক একত্রে একটি অখণ্ড নাট্যকাব্য—রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানী'র[১] মতো—কাব্যগুণে যা অতুলনীয়। সমালোচকেরা, ভারততত্ত্ববিদেরা এর কাব্য-সৌন্দর্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।[২]

১। বিদায় অভিশাপ—রবীন্দ্র রচনাবলী ৫ম খণ্ড বিশ্বভারতী ১৯৫৭

২। It is the first Indo-European love story and may even be the oldest love story in the world —The ocean of story tr. by C. H. Tawney pp 245

ঋগ্বেদের উপাখ্যানের রূপটাই স্বতন্ত্র। অন্যত্র যেখানে গল্পআখ্যান বা ছোটগল্পের মতো এখানে তা প্রায় গীতিকাব্যের অন্তর্গত নাট্যকাব্য। কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে পদ্ম সরোবর তীরে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মির স্বর্ণ আভায়, চিরবিচ্ছেদের ধূসর পটভূমিকায় প্রেমিক প্রেমিকার আবেগ মন্থর সংলাপের মধ্য দিয়ে চিরন্তন প্রেমের করুণ আর্তি উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে এই সূক্তে। আরম্ভটাই বেশ নাটকীয়। চার বছর সহবাসের পর বিচ্ছিন্ন দম্পতির আবার সাক্ষাৎ হল চিরবিচ্ছেদের পারে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে।[৩] বিরহ সন্তপ্ত পুরূরবা ফিরে ডাকছেন দয়িতাকে—হায়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে—'হায়, ওগো নিষ্ঠুরা জায়া, দাঁড়াও।' পূর্বানুবৃত্তি বাদ দিয়ে আকস্মিক নাটকীয় আরম্ভ—তৃষাতপ্ত হৃদয়ের কাতর আহ্বান—দুজনে আলাপ দরকার। মনের কথা এখন বলা নাহলে পরে তা দুঃখের কারণ হবে।[৪]

কিন্তু উর্বশী জানেন, যে মিলন মেলা ভেঙ্গে গেছে তা আর জোড়া লাগে না। সম্ভব নয় পুনর্মিলন। তাই বিষণ্ণ খেদে প্রতিনিবৃত্ত করতে হয় দয়িত কে।—

—তোমার সঙ্গে আমি কি কথা বলব। প্রথম উষার মতো আমি চলে এসেছি। পুরূরবা ঘরে ফিরে যাও। বাতাসের মতো দুষ্প্রাপ্য আমি॥[৫]

মর্ত্যমানুষের হৃদয়দীর্ণ অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণার ব্যাকুল আহ্বান সমগ্র কাব্যের ক্ষীণ কাহিনীসূত্র ছিন্ন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে শাশ্বত প্রেমিক পুরূরবার কণ্ঠে।

—তোমার প্রণয়ী আজ পতিত হোক, চলে যাক দূর থেকে দূরে। আর যেন ফিরে না আসে। সে নিঋ্তির কোলে শায়িত হোক, বলবান নেকড়েরা তাকে খেয়ে ফেলুক।[৬]

৩। The diologue takes place at the moment when the nymph is about to quit her mortal lover for ever.—A history of Sanskrit Literature by A. A. Macdonell pp 119.

৪। ঋ ১০।৯৫।১

৫। ঋ ১০।৯৫।২

৬। ঋ ১০।৯৫।১৪

একজন স্বর্গকন্যা অপ্সরা। আর একজন মৃত্যু-'করধৃত' মর্ত্যমানুষ। এ মিলন ত হতে পারে না। মানুষের উষ্ণ আলিঙ্গনের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যায় সে অধরা। প্রিয়তমার যে দিব্যরূপ হৃদয়ের গোপন কুট্টিমে সংরক্ষিত সে তো বাস্তবিকা নয়। চিরকালের মানুষের এই ব্যাকুল ক্রন্দন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

'ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী।
আদি যুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার।'[৭]

এই নিঠুরা উর্বশীর কথাই বোধ হয় কবি কীটসেরও কাব্যে।

I saw pale kings and Princess too
Pale warriors, death-pale were they all
They cried—'La belle Dame sans Merci.'[৮]

উর্বশীও জানে পুরুষের মুগ্ধ কামনার স্বপ্ন কল্পনা পরিতৃপ্তি তার অসাধ্য। তাই বেদনার্ত চিত্তে তাকে চলে যেতে হয়। যাবার আগে মনে পড়ে পূর্ব-মিলনের সহস্র স্মৃতি, আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখকে যা তীব্রতর করে তোলে। যাবার বেলা ভারাক্রান্ত চিত্তে বলে যায় উর্বশী—'হে মূঢ় ঘরে ফিরে যাও আমাকে পাবে না।'[৯]

সান্ত্বনা দিতে হয়—পুরূরবো মা মৃথা মা প্রপপ্তো
মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উক্ষণ
নবৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা।[১০]

—'হে পুরূরবা এমন মৃত্যু কামনা করো না, উচ্ছন্নে যেও না। দুর্দান্ত নেকড়েরা যেন তোমাকে না খায়। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না।

৭। উর্বশী॥ চিত্রা—রবীন্দ্রনাথ

৮। La Belle Dame Sans Merce—John Keats—Golden Treasury, Centennial Edition pp 162

৯। পরেহ্যস্তং নহি মূর মাপঃ॥ ঋ ১০।৯৫।১৩

১০। ঋ ১০।৯৫।১৫

স্ত্রীলোকের হৃদয় আর নেকড়ের হৃদয় এক।' সান্ত্বনা মানে না পুরূরবার অশান্ত হৃদয়। চিরকালীন প্রেমিকের আকুল আর্তি ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে।

—হে উর্বশী ফিরে এসো, আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে।[১১] এই বিয়োগান্তক ব্যাকুল বেদনাতেই কাব্যটির প্রকৃত সমাপ্তি। তথাপি আরো একটি ঋকযুক্ত হয়েছে। উর্বশীর আশ্বাস মূলক অষ্টাদশ ঋকে বৈদিক যজ্ঞের তাৎপর্য নিহিত আছে। অবশ্য অনেকে মনে করেন 'শতপথে' ধৃত কাহিনীরূপই এই উপাখ্যানের আদিরূপ, ঋগ্বেদে তার বর্ণনামূলক অংশ বাদ দিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। যাই হোক ঋগ্বেদে ধৃত নাট্যকাব্য রূপটিই ভাবে ভাষায়, রূপে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন বলে চিবকাল বিবেচিত হবে। হৃদয়াবেগের গভীরতায়, উপস্থাপনের নাটকীয়তা, সাংকেতিক ব্যঞ্জনায়, চারিত্রায়নে, ভাষা, ছন্দ ও অলংকাবের নিপুণ প্রয়োগে সার্থক কাব্য হয়ে উঠেছে। হয়তো আলোচনা প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুব প্রয়োজনীয় পরিমিতির সীমা অতিক্রম করে গেল, বিশেষত রচনা যেখানে সাড়ে তিন হাজার বছব পূর্ববর্তী। কিন্তু সেদিনও ত নরনারীর তৃষাদীর্ণ প্রেমবেদনা ছিল! সুতরাং যুগোচিত বিষয় নিষ্ঠাও অতিক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। শ্রেষ্ঠ কাব্য চিরকালই মানবিক আবেগের চিরন্তনতার জন্যই যুগসীমাকে অতিক্রম করে চিরকালীনতা লাভ করে। ঋগ্বেদের এই নাট্যকাব্য আর তার সাড়ে তিন হাজার বছর পরবর্তী লেখা রবীন্দ্রনাথের উর্বশী এই দুটিই উপাখ্যানের শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপ।

ঋগ্বেদের পর এই উপাখ্যানের পূর্ণাঙ্গ রূপের সাক্ষাৎ পাই শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে।[১২] শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে শতপথের তৃতীয় কাণ্ডে।[১৩] সেখানে কিভাবে অগ্নিমন্থন করতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তা ছাড়া যজ্ঞের সঙ্গে পুরূরবা ও উর্বশীর নাম কি করে এলো তার একটা ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজনীতাও

১১। উষ ত্বা রাত্তিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠান নিবর্তস্ব
হৃদয়ং তপ্যাতে মে ॥ ঋ ১০।৯৫।১৭

১২। শ. ব্রা একাদশ কাণ্ড পঞ্চম অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ পঞ্চম মন্ত্র ১১।৫।৩।৫

১৩। শত ৩।৩।২।২০-২৩

ব্রাহ্মণকারেরা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বোধ হয় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫নং সূক্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যজ্ঞ ও যজ্ঞাগ্নি প্রচলনের একটা কাহিনী ও যোগ করেছেন। ঋগ্বেদের উদ্দিষ্ট সূক্তের শেষ ঋকে পুরূরবার প্রতি উর্বশীর আশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে—ঋগ্বেদের কাব্যমূল্যের বিচারে যা অবান্তর। "হে ঐড় পুরূরবা, তোমাকে এইসব দেবতারা বলিতেছেন যে তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। স্বকীয় হোম দ্বারা যজ্ঞ করিবে। তুমি স্বর্গে যাইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে।"[১৪]

অর্থাৎ উর্বশী প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্তির উপায় রূপে যজ্ঞের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের কাহিনীর ঘটনা সংস্থানের সঙ্গে শতপথের একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। শতপথের কাহিনী অনুযায়ী সর্ত ভঙ্গের জন্য উর্বশী অন্তর্হিতা হলে পুরূরবা খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হলেন কুরুক্ষেত্রের পদ্মসরোবরের পাড়ে। সেখানে উর্বশী অপর সখীদের সঙ্গে জলচর পাখিরূপে চরছিলেন। পুরূরবাকে দেখে সখীদের বললেন—"এই সেই মানুষ যার সঙ্গে আমি বাস করেছিলাম।" তাঁরাও বললেন,—এসো তাঁর (পুরূরবার) সামনে উপস্থিত হই। তখন তাঁরা আবির্ভূত হলেন। উর্বশীকে চিনতে পেরে পুরূরবা তাঁকে অনুযোগ জানালেন। এখানেই ঋগ্বেদের উল্লিখিত সূক্তের ১, ২, ৩, ১৪, ১৫, ১৬নং ঋকগুলি সংলাপ রূপে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তিতে ১৫টি ঋক বলা হল। এই পর্যন্ত কাহিনী ঋগ্বেদানুযায়ী ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে তা বিস্তৃততর। ঋগ্বেদে সূক্তের শেষ ঋকের বক্তব্যে যেখানে অন্য আর একদিনের সাক্ষাৎকারের কথা অনুমান করা যায়, শতপথের কাহিনীর শেষ অঙ্ক সেখানে চারদিনের চারদৃশ্যে বিন্যস্ত।

(১) প্রথম দৃশ্যে কুরুক্ষেত্রে পদ্মপুকুরের পাড়ে উর্বশী পুরূরবাকে আশ্বাস দিলেন বর্ষশেষে একরাত সহবাসের। তখন তার পুত্রও জন্মে যাবে।

(২) বর্ষান্তের সেই মিলন রাত্রিতে উর্বশী জানাল পরদিন গন্ধর্বদের কাছে কি বর চাইতে হবে।

১৪। ইতি ত্বা দেবা ইমা আহুর ঐড় যথেম্ এতদ্ভবসি মৃত্যু বন্ধুঃ।
প্রজাতে দেবান্ হবিষা যজাতি স্বর্গ উত্বম্ অপি মাদয়াসে। ঋ ১০।৯৫।১৮

'(৩) পরদিন প্রভাতে উর্বশীর পরামর্শ মতো পুরূরবা তাঁদের একজন হতে চাইলেন। উত্তরে তাঁরা বললেন মানুষের সেই আগুন নাই যাতে যজ্ঞ করে তারা গন্ধর্বদের একজন হতে পারে। তখন তাঁরা পুরূরবাকে এক থালায় করে আগুন দিলেন।

ছেলে এবং আগুনের থালা নিয়ে রওনা হলেন পুরূরবা। পথে, বনে আগুনের থালা রেখে ছেলে নিয়ে গেলেন পুরে। ফিরে এসে সে আগুনের থালা দেখতে পেলেন না। দেখলেন আগুনের জায়গায় এক অশ্বত্থ গাছ আর থালার জায়গায় শমী গাছ।

(৪) তখন তিনি আবার গন্ধর্বদের কাছে এলেন এবং তাঁদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত সেই অশ্বত্থ শাখা থেকেই উত্তর অরণি আর নিচের অরণি করে যে আগুন পেলেন সেই আগুনে যজ্ঞ করে তিনি গন্ধর্বদের একজন হলেন।

অর্থাৎ আগুন জ্বালানোর পন্থা আবিষ্কার আর যজ্ঞের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং তার একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা। মীথ বা অতিকথার অন্যতম প্রেরণাই হচ্ছে উদ্ভব কাহিনী বর্ণনা। এখানে যজ্ঞাগ্নির উদ্ভব কথা। কিন্তু ঋগ্বেদের রূপটিতে যেমন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গুণ আছে শতপথে তার অভাব। এখানে কাহিনী বর্ণনা বা আখ্যানই প্রধান। আদি মধ্য ও অন্ত যুক্ত এক পূর্ণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে—যা ঋগ্বেদের হঠাৎ আরম্ভ হওয়া সংলাপের পশ্চাদপটকে স্পষ্ট করে তুলেছে—এখানেই পৌরাণিক মানসিকতার সূচনা। আরম্ভটাই দায় সারা গোছের।

প্রথম বাক্যটি—উর্বশী হ অপ্সরা পুরূরবসম ঐড়ং চকমে তং হ বিন্দমান উবাচ···ইত্যাদি।[১৫] অর্থাৎ উর্বশী ছিলেন অপ্সরা। তিনি ঐল পুরূরবাকে কামনা করেছিলেন তাকে বরণ করতে শর্ত বলেছিলেন। শর্ত তিনটি উল্লেখ করার পরই তাদের সহবাস এবং উর্বশীর গর্ভিনী হবার কথা। না পূর্বরাগ, না পরিণয়রাগ কিছু না। অথচ বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রে সূত্রকার সাহিত্য সৃষ্টির এ সব সুযোগ ত্যাগ করেন নি।

১৫। শঃ ব্রাঃ ১১।৫।৩।১

সাহিত্য সৃষ্টি নয়, 'শতপথ' যজ্ঞের রীতি-নীতি, ক্রিয়া-কলাপ নিয়েই অধিকতর ব্যস্ত। সাহিত্যরসের দিকে নজর দেবার অবকাশ ছিল না। তাছাড়া ব্রাহ্মণ কোন ব্যক্তি বিশেষের রচনা নয় বোধ হয়। ঋত্বিকেরা সবাই মিলে যজ্ঞের যে সব নিয়মকানুন প্রচলিত ছিল এবং তাৎপর্য যা জানা ছিল তাই সংকলন করেছেন।

যেটুকু জানা ছিল না তারও একটা অর্থ সমকালীন জ্ঞানের সাহায্যে খাড়া করেছেন। তবে শতপথ ব্রাহ্মণে সর্বপ্রথম কাহিনীর একটি পূর্ণাঙ্গ সংহত রূপ পাওয়া গেল। যদিও পরবর্তীকালের পুরাণগুলি শতপথের কাহিনীর রূপ এবং বিন্যাসই অনুসরণ করেছেন তথাপি এ কাহিনীকে পুবাণ বলা চলে না। এখানে বংশ, মন্বন্তর, সর্গ, প্রতি সর্গের নাম গন্ধও নাই—আছে শুধু যজ্ঞাচারের প্রসঙ্গ আর আগুন জ্বালানো বা অগ্নি মন্থনের কথা। পুরাণগুলিতে যজ্ঞ প্রসঙ্গ গৌণ সেখানে দেব মাহাত্ম্য ও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রচারের দিকে ঝোঁক।

বৈদিক সাহিত্যে কাত্যায়ণ সর্বানুক্রমণীর ষট্‌ গুরুশিষ্য কৃত বেদার্থ দীপিকায় উদ্ধৃত কাহিনী আর বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রেই আখ্যায়িকা গদ্যে বিবৃত। কেবল গদ্য কাহিনীতে নয় সাহিত্য গুণে বৌধায়ন কাহিনীর স্থান ঋগ্বেদের পরেই। কাব্যরূপে ঋগ্বেদে উদ্ধৃত রূপ শ্রেষ্ঠ। আখ্যায়িকা রূপে বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রের[১৬] রূপটি শ্রেষ্ঠ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অভিনবত্বে এবং সাহিত্য গুণে অনেকটা আধুনিক ছোট গল্পের কাছাকাছি। আরম্ভ ও মধ্য কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর। চরিত্রায়ণের প্রয়াসও আছে। অবশ্য পরিণতি আধুনিক ছোট গল্পের মতো সাংকেতিক ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ নয়। হবার কথাও নয়। বৈদিক যুগের অন্ত্যভাগে রচিত বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রে সংকলিত এই কাহিনীর সাহিত্য গুণ লক্ষণীয়। অন্যত্র কাহিনীতে যে, দেখলেন, কামনা করলেন এবং লাভ করলেন—পূর্বরাগ বর্জিত প্রেমের সরাসরি দাম্পত্য সম্পর্কে উত্তরণ—এখানে তা নয়। একমাত্র বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রেই প্রাক মিলন পূর্বরাগের একটা বিশ্বাস্য ভূমিকা আছে। আরম্ভটা

১৬। বৌ, শ্রৌ Ed by Dr. W. Caland, vol. I Asiatic Society 1904

দেখুন—পুরূরবা নামে এক মহান রাজা ছিলেন। অপ্সরা উর্বশী তাঁকে ভালোবেসেছিলেন। তাঁকে কামনা করে উর্বশী পুরো একবছর ধরে তাঁর পিছে ঘুরেছিলেন। অতি দীর্ঘ মনে হয়েছিল এই অনুসরণ[১৭] ইত্যাদি। রাজা রথে করে যান, উর্বশী পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। চোখোচোখি হতেই সরে দাঁড়ান অন্তরালে। রাজা সারথিকে জিজ্ঞাসা করেন। সেও বুঝতে পারেনা কাউকে দেখেছে না দেখেনি। বলে, —'আপনাকে, রথ, অশ্ব আর পথ দেখতে পাচ্ছি।' তারপর রাজা একদিন পথের পার্শ্বে তাঁকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেললেন—কে আপনি? —আমি উর্বশী অপ্সরা যে আপনাকে এক বছর ধরে অনুসরণ করেছে। রাজাও তাঁকে অনেকবার দেখেছেন পথে। তাই সাহস করে বলে ফেললেন—'তাঁকে আমার জায়া রূপে বরণ করতে চাই।[১৮]

সুতরাং একথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে যে বৌধায়ন, কাহিনীর পূর্ণতা এবং সৌন্দর্য সম্পাদনের জন্য তাঁর নিজস্ব কল্পনা দিয়ে এই অংশ গড়ে তুলেছেন। যদি ভাষায় প্রাচীনত্বের চিহ্ন না থাকত তাহলে অক্লেশে মনে করা যেত এটি সাহিত্যযুগের সৃষ্টি।

তিনটি শর্ত সাপেক্ষ তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হ'ল। কিন্তু উর্বশী জন্মাবামাত্র সন্তানদের হত্যা করতে লাগলেন।[১৯] এসব দেখে পুরূরবা অনুনয় করলেন—ভগবতি, আমরা পুরুষেরা পুত্রকামী।[২০] তারপর আয়ু, অমাবসু জন্মাল। একজন পূর্বে আর একজন পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। শতপথে আছে গন্ধর্বেরা উভয়কে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

বৌধায়নে এসেছে বোন পূর্বচিত্তি—আরো ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্ক। সে ভাবল 'আমার বোন মানুষের মধ্যে অনেকদিন বাস করেছে, তার সঙ্গে মিলতে

১৭। কাহিনীর জন্য প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

১৮। তাং মা জায়া বিন্দস্বেতি বৌ, শ্রৌ

১৯। সা হ স্ম জাতাঞ্জাতানেব পুত্রান্ পরিধ্যাতি। তদেব

২০। পুত্রকামা হ বৈ ভগবতি বয়ং মনুষ্যাঃ। তদেব

পারছিনা। কাজেই সে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করল।[২১] রাজা যেই বীরত্ব প্রতিপাদনের জন্য অপহৃত মেষশাবক উদ্ধারে নগ্ন অবস্থায় ধাবিত হলেন পূর্বচিত্তি তখন বিদ্যুৎ সৃষ্টি করল। উর্বশী তখন বললেন—কালই পরিত্যাগ করে যাব। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল ?

—আপনাকে নগ্ন দেখলাম। এই সংলাপের পর বৌধায়ন লিখেছেন, উর্বশীর অন্তর্ধানে রাজা অপ্রিয়বিদ্ধ হয়ে শোক করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।[২২]

এখানেই শেষ হলে কাহিনীটি আধুনিক ছোটগল্পের মর্যাদা পেতে পারত। কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত ঘটনার বিশ্বস্ত রূপ, নাটকীয় সংলাপ, চরিত্রায়ণ এমনকি মনস্তত্ত্বের আভাস ইত্যাদি ছোটগল্পের সব লক্ষণই এতে দেখা যাবে। কিন্তু সূত্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিস্মৃত প্রায় বৈদিক ক্রিয়াদির ব্যাখ্যা—আখ্যায়িকার পরবর্তী অংশে তাই অরণি নির্মাণ, অগ্নিমন্থন বর্ণনা, অরণির নামকরণের কারণ নির্দেশ এবং যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা—যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তবু মনে হয় বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রের আখ্যায়িকায় যেন ব্যক্তি স্পর্শ নন্দিত সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

বৃহদ্দেবতায় কাহিনীর এক সম্পূর্ণ নতুন রূপের সাক্ষাৎ পাই। সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে অনুসৃত এই আখ্যায়িকায় আর কোথাও তার আভাস নাই। এখানে কাহিনীর রূপ পৌরাণিক এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার সহবাসে বিশেষত শেষোক্তের ইন্দ্রসম প্রতিস্পর্ধায় ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তাঁদের বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন। ইন্দ্র কাজের ভার দিলেন বজ্রের উপর। ঈর্ষান্বিত তিনি বললেন,—'হে বজ্র যদি তুমি আমার প্রিয় ইচ্ছা কর তবে এদের প্রীতি বিনাশ কর।' 'তাই হোক', বলে বজ্র আপন মায়াদ্বারা তাঁদের বিচ্ছিন্ন করেছিল। তারপর শোকার্ত পুরূরবার অন্বেষণ। পুকুরে পাঁচসখীসহ উর্বশীকে চরতে দেখেছিলেন ইত্যাদি।[২৩]

২১। সা হেক্ষাং চক্রে জ্যোগ্ বৈ মে স্বপা মনুষ্যেম্ববাৎসীদ্ধন্তৈ নামচ্ছায়া নীতি। তথা সহাগত্যৈব সংগমং ন লেভে। তদেব

২২। তস্যাং প্রব্রজিতায়ামপ্রিয় বিদ্ধঃ শোচংশ্চচার। তদেব

২৩। The Brihad Devata tr and ed by A. A. Macdonell, 2nd Indi Ed Banarasi Das Motilal Das

কাত্যায়ন সর্বানুক্রমণীতে উপাখ্যানের পৌরাণিক রূপের কাঠামো সূত্রাকারে গদ্যে বর্ণিত হয়েছে। এখানে পুরূরবার পৌরাণিক পরিচয়—মনুর পুত্র ইলা স্ত্রীত্ব কালে বুধের ঔরসে পুরূরবার জন্মের কথা প্রথম উল্লিখিত। উর্বশীর প্রতি বরুণের শাপের ও উল্লেখ আছে। কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রে এই অভিশাপের ব্যাখ্যা আছে। মিত্র ও বরুণ উভয়ে দীক্ষাকালে উর্বশীকে দেখে চঞ্চল হয়েছিলেন। কুম্ভে তাদের শুক্র রাখা হয়েছিল। তাঁরা উর্বশীকে মনুষ্য-ভোগ্যা হয়ে পৃথিবীতে বাস কর বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন। বৃহদ্দেবতা বা কাত্যায়ণ শ্রৌত সূত্র এবং পরবর্তী সর্বানুক্রমণী ও বেদার্থ দীপিকা নামক ষট গুরু শিষ্যকৃত তার ভাষ্য প্রকৃত পক্ষে বেদোত্তর যুগের। এইসব রচনায় বেদের প্রকৃত তাৎপর্য বিশেষ করে যাদু ক্রিয়ার রহস্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত বলে প্রচলিত কাহিনী ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান যুক্ত করা হয়েছে। খানিকটা কাহিনীগত পূর্ণতা সম্পাদন ছাড়া এসব লেখায় সাহিত্যরস সামান্যই আছে। তা ছাড়া কাত্যায়ন সর্বানুক্রমণীতে[২৪] নারায়ণের উরু থেকে উর্বশীর সৃষ্টির কথাও আছে।

পৌরাণিক পর্ব ঃ

উপাখ্যানের দ্বিতীয় পর্যায় পৌরাণিক। রামায়ণ, মহাভারত[২৫] এবং বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য, ভাগবত, পদ্ম, ইত্যাদি পুরাণগুলি এই পর্যায়ের অন্তর্গত। এই সমস্ত গ্রন্থে উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যান যে ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার অভিনবত্ব এবং কাব্যোৎকর্ষই এখানে আলোচ্য। পুরাণগুলিতে প্রধানত বৈদিক যুগের ঐতিহ্য পরম্পরাগত আখ্যান বা ইতিহাস বর্ণিত হলেও তার একটা সাহিত্যমূল্যও পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। পুরাণ • অতিকথা বা মীথোলজির সমজাতীয়, যা সব দেশের সাহিত্যেরই প্রাচীনতম রূপ। ভারতীয় মহাকাব্যগুলিও সংহিতা ধরণের, তাই তার অখণ্ড কাব্যকাহিনীর পরিধির

২৪। Katyayan Sarvanukramani of the Rigveda with Extract from Shad Guru Sishya's commentary entitled Vedartha Dipika Ed by A. A. Macdonell Oxford 1886 p 98

২৫। সঠিক অর্থে রামায়ণ ও মহাভারতকে পুরাণ বলা না গেলেও উভয় মহাকাব্যকে এই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে আলোচনার সুবিধার জন্য।

মধ্যে তৎকাল প্রচলিত বহু উপাখ্যান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর পুরাণগুলির মূল উদ্দেশ্য বিশিষ্ট দেবমাহাত্ম্যমূলক সাম্প্রদায়িক প্রয়াস হলেও ইতস্তত সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টাও দেখা যায়—পাত্রপাত্রীর মানসিকতা বর্ণনায়, চরিত্রায়নের স্বল্প আভাসে, কাহিনী গ্রন্থনের বিন্যাসে ও সমৃদ্ধ কল্পনায়। মহাকাব্যের মতোই পুরাণও বহুলাংশে গোষ্ঠীচেতনা নির্ভর তাই তাতে ব্যক্তি-মনের সাক্ষাৎ দুর্লভ।

প্রথমে রামায়ণ মহাভারতের কথায় আসা যাক্। বাল্মীকির রামায়ণের দুটি স্থানে মাত্র এই উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। এক আছে অরণ্যকাণ্ডে। সীতা লঙ্কাপুরে অশোক কাননে বন্দিনী। রাবণ এসেছেন তাঁকে প্রলুব্ধ করতে কিন্তু সীতা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন রূঢ় ভাবে। রাবণ তখন তাঁকে বলে—হে ভীরু আমাকে প্রত্যাখ্যান করে পরে পরিতাপ হবে। যেমন পুরূরবাকে পদাহত করে উর্বশীর হয়েছিল।[২৬] রামায়ণের এই উল্লেখ অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানে কোথাও পদাঘাতের কোন প্রসঙ্গ নাই। তবে প্রত্যাখ্যানকে আলঙ্কারিক অর্থে পদাঘাত বলে গ্রহণ করা চলে বটে। কিন্তু উর্বশীর—একমাত্র ঋগ্বেদে অনুতাপ সূচক খেদোক্তি থাকলেও আর কোথাও তেমন কোন কথা নাই। অন্যটি পূর্বে বর্ণিত। ২৬ক

মূল মহাভারতে উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানের পূর্ণরূপে না থাকলেও বৈদিক কাহিনীর আভাস আছে আদি পর্বের ৭০ অধ্যায়ে। সেখানে পুরূরবার পরিচয় প্রসঙ্গে আছে—

স হি গন্ধর্বলোকস্থ উর্বশ্যা সহিতো বিরাট।
অনিনায় ক্রিয়ার্থেঽগ্নীন্যথা বদ্বিহিতাংস্ত্রিধা ॥[২৭]

২৬। প্রত্যাখ্যায় চ মাং ভীরু পরিতাপং গমিষ্যসি।
পদাভিহত্যেব পুরা পুরূরবসমূর্বশী ॥—বাল্মীকীয় রামায়ণম্ ভগবদ্দত্তেন বিশ্ববন্ধুনা সম্পাদিতা। অরণ্যকাণ্ড। ৫৩।১৭
D. A. V. college Research Department, Lahore, July 15, 1935
অনুবাদ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত। ২৬ক। ৬৯ পৃঃ দ্রঃ

২৭। The Mahabharata—Edited by V. S. Sukthankar, Poona Vandarkar Oriental Research Institute 1926. 1-70-21

অর্থাৎ তিনিই গন্ধর্বলোকস্থিত উর্বশীর সঙ্গে যজ্ঞার্থে ত্রিত অগ্নি[২৮] এনেছিলেন। তার পরের শ্লোকে আছে তিনি উর্বশীর গর্ভে আয়ু, ধীমান, অমাবসু ইত্যাদি ছয় পুত্রের জন্ম দেন। মহাভারতে পুরূরবার পরিচয় প্রসঙ্গে এর আগেই বলা হয়েছে—অমানুষৈ বৃতঃ সর্বৈ মানুষঃ সন মহাযশাঃ।—অর্থাৎ পুরূরবা মানুষ হলেও সর্বদা অমানুষ বা দেবতাদের দ্বারা বেষ্টিত। এ কথাটি ঋগ্বেদে আছে।[২৯] তিনি যে ইলার পুত্র এবং ইলা যে তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন[৩০]—এই তথ্য সর্বপ্রথম পাই কাত্যায়ণ শ্রৌত সূত্রে। এখান থেকেই আরম্ভ পুরাণের বংশ পরিচয়। অবশ্য ঋগ্বেদেও তাকে ঐড় অর্থাৎ ইলার পুত্র বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে মহাভারতে পুরূরবার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংঘর্ষের যে পরিচয় আছে তার উল্লেখ কেবলমাত্র অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত[৩১] ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেই[৩২]—দেখা যায়। পরে উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে এই ঘটনার যে আভাসমাত্র আছে মহাভারতে তা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত।—

বিপ্রৈঃ স বিগ্রহং চক্রে বীর্যোন্মত্তঃ পুরূরবাঃ।
জহার চ স বিপ্রাণাং রত্নান্যুৎক্রোশতামপি ॥
সনৎকুমার স্তু রাজন ব্রহ্মলোকাদুপেত্যহ।
অনুদর্শায়াং ততশ্চক্রে প্রত্যগৃহ্যান্ন চাপ্যসৌ ॥
ততো মহর্ষিভিঃ ক্রুদ্ধৈঃ শপ্তঃ সদ্যো।
লোভান্বিতো মদবলান্নষ্ট সংজ্ঞোনরাধিপঃ ॥[৩৩]

"তিনি বীর্যমদে মত্ত হইয়া বিপ্রগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের চিরসঞ্চিত

২৮। মহা, 1-70-17

২৯। ঋ 1.95 8

৩০। মহা 1-70 16

৩১। Buddha Charit or Acts of the Buddha ১১।৫ Ed. by E. H. Johnston the Univ. of Punjab—Lahor, Cal-Bapt. Misson Press 1935 p 117

৩২। কৌটিলীয়ং অর্থশাস্ত্রম্ vol. I Dr. R. G. Basak অনূদিত ও সম্পাদিত 3/6

৩৩। মহা 1/70/18-20

বহুমূল্য রত্নসকল অপহরণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারেন নাই। অনন্তর সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে উপস্থিত হইয়া পুরূরবাকে অনুদর্শ যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে সেই লোভ-পরতন্ত্র বলদৃপ্ত নরাধিপ সদ্যই বিনষ্ট হইলেন।[৩৪]

এখানে সম্ভবত গোষ্ঠীপতি সমাজ থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণ কালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের নিদর্শন রয়েছে। সুতরাং পুরূরবা সেই সময়ে রাজ-তন্ত্রের প্রতীক বা রাজ চক্রবর্তীরূপে পরিচিত ছিলেন। কোন কোন মতে পুরূরবা কোন বাস্তব রাজার নাম। এইভাবে পুরূরবা আদিম মানুষের অগ্নি প্রজ্বালনের ক্রিয়ায় ব্যবহৃত অরণি থেকে অতিকথাযুগের প্রাকৃতিক দেবতা সূর্য এবং তারপর মহাকাব্য বা পুরাণ যুগে রাজা রূপে পরিণত হলেন।

মহাভারতে আরো ছ'সাত জায়গায় উর্বশীর উল্লেখ আছে স্বর্গের অপ্সরীদের অন্যতম একজন নর্তকী রূপে[৩৫]

উর্বশীকে নিয়ে মহাভারতের একান্ত স্বতন্ত্র কাহিনীর নাম দেওয়া যেতে পারে উর্বশী-অর্জুন সংবাদ। এখানে উর্বশী নিতান্তই স্বর্বেশ্যা, ইন্দ্রের ইচ্ছায় অপরের মনোরঞ্জনে নিয়োজিতা। কাহিনীটি আছে বনপর্বে।[৩৬] অস্ত্র লাভের জন্য ইন্দ্রের আহ্বানে অর্জুন এসেছেন স্বর্গপুরে। স্বর্গ সভায় আয়োজন করা হয়েছে অর্জুনের সম্বর্ধনায় এক নৃত্যগীতানুষ্ঠান। তুম্বরু প্রভৃতি গন্ধর্বরা মধুর স্বরে সামগান করতে লাগলেন। ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্বশী প্রভৃতি ১৬ জন অপ্সরা করলেন নৃত্য। অর্জুনের মন উর্বশীর প্রতি আকৃষ্ট মনে করে দেবরাজ ইন্দ্র গন্ধর্ব চিত্রসেনকে আদেশ করলেন উর্বশীকে পাঠিয়ে অর্জুনকে রমণীগণের হাবভাবভঙ্গী শিখিয়ে দিতে।

৩৪। মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত বঙ্গানুবাদ॥ সাক্ষরতা প্রকাশন ১ম খণ্ড p 81

৩৫। মহাভারত, বনপর্ব ১৩ অধ্যায় ২৯, ৩০

৩৬। মহা, বন ৪৫, ৪৬

গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে দেবরাজের আদেশ শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন সর্বলোকললামভূতা উর্বশী। কারণ লোকমুখে অর্জুনের রূপগুণাদি শ্রবণে আগেই তিনি মনে মনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অর্জুনের প্রতি। সন্ধ্যাবেলা বেশভূষা প্রসাধন করে মন্মথশরে নিপীড়িতা উর্বশী অর্জুনের আবাসে এসে তাঁর সহবাস প্রার্থনা করলেন কিন্তু অর্জুন তাঁকে পৌরবংশের জননী সুতরাং পরম-গুরু বলে সশ্রদ্ধ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যাতা ক্রোধাবিষ্টা উর্বশী তখন তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে তাঁকে মানহীন হয়ে ক্লীবরূপে স্ত্রীলোকের মধ্যে নৃত্য করে কালযাপন করতে হবে। এই শাপের ফলেই অর্জুন অজ্ঞাতবাস-কালে বৃহন্নলারূপে এক বৎসর সাফল্যের সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকতে পেরেছিলেন। এখানে নারীরূপের আদর্শ বর্ণনা পরবর্তীকালের উর্বশীকে আদর্শ নারীরূপে উপস্থাপনার সূচনা বলা যায়।[৩৭]

কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ উদ্ধার করি,—

"ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় প্রদোষকাল উপস্থিত; চন্দ্রমা সমুদিত হইল। তখন সেই পৃথুনিতম্বিনী স্বীয় নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া পার্থ ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই লাবণ্যবতী ললনার সুকোমল কুঞ্চিত, কুসুমগুচ্ছ শোভিত, সুদীর্ঘ কেশপাশ, ভ্রূবিক্ষেপ, আলাপ মাধুর্য ও সৌম্যাকৃতি অনির্বচনীয় সুষমা সম্পাদন করিয়াছিল। তাহার বদন-সুধাকর-সন্দর্শনে শশধরও লজ্জিত হইলেন। সেই সর্বাঙ্গ সুন্দরী দিব্য চন্দন চর্চিত, বিলোল—হারাবলিললিত, পীনোন্নত পয়োধরযুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদেপদে নমিতাঙ্গী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহার ত্রিবলীদাম মনোহর কটিদেশের কি অনির্বচনীয় শোভা। তাহার গিরিবরবিস্তীর্ণ রজতরশনারঞ্জিত নিতম্ব যেন মন্মথের আবাসস্থান, সূক্ষ্ম বসনাবৃত অনিন্দনীয় তদীয় জঘন নিরীক্ষণে ঋষিগণেরও চিত্তবিকার জন্মে, কিঙ্কিনীকিণলাঞ্ছিত পাদদ্বয় কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত; গূঢ়গ্রন্থি অঙ্গুলি সকল তাম্রবর্ণ ও আয়ততল। একে ত সেই সুরসুন্দরী সহজেই মদনোন্মত্তা, তাহাতে আবার পরিমিত সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বিবিধ বিলাসবিভ্রম সহকারে বাক্‌পথাতীত প্রিয়দর্শনা হইয়া উঠিল···

৩৭। মহা, বন, ৪৬।৬-১৫

অর্জুনভবনাভিসারিনী সেই বিলাসিনী বহুবিধ আশ্চর্য ও মনোহর দ্রব্যপূর্ণ সুরলোকেও সকলের পরম দর্শনীয় হইল। সেই সুরকামিনী মেঘবর্ণ অতিসূক্ষ্ম উত্তরীয় বসন ধারণ করাতে যেন অভ্রাবৃত কৃশ চন্দ্রলেখার ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল।"[৩৮]

নারীরূপ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় ভারতীয় সাহিত্য মুখর এবং তা আদি সাহিত্যকৃতি ঋগ্বেদ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তবে ঋগ্বেদ প্রকৃতি বর্ণনায় যতটা সমৃদ্ধ নারীরূপ প্রশস্তিতে ততটা নয়। একমাত্র উষার বর্ণনাতেই এই নারী রূপ সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়। তা ইতিপূর্বে বর্ণিত। ঋগ্বেদে তথা সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের নারীরূপের দেহ সৌন্দর্যের বর্ণনার অভাব। ঋগ্বেদে যেটুকু বা আছে তাও প্রধানত সামগ্রিক গুণ ও কর্মের অবধারণাত্মক। নারীরূপের প্রশস্তি বোধ হয় মহাকাব্য দুটিতেই সূচনা—যা কিছু কিছু পুরাণেও প্রতিফলিত হয়েছে—এবং পরবর্তী অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যে বিবর্ধিত ও বিকশিত হয়েছে। মহাকাব্য দুটি অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারত বৈদিক সাহিত্যের শেষ অধ্যায় সূত্র সাহিত্যের সমকালীন। উভয়ের রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খৃস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত প্রলম্বিত। এদের কতটা কখন রচিত তা নির্ণয় করা অসাধ্য। এই দুই কাব্যে বহু নারীরূপের বর্ণনা আছে তবে অপ্সরা উর্বশীর রূপবর্ণনাতে মহাভারতকার যতটা উচ্ছ্বসিত অন্যত্র ততটা নয়। এখানে আমরা রামায়ণ, মহাভারত থেকে কয়েকজন অপ্সরা এবং নায়িকা রূপের বর্ণনা উদ্ধার করছি। তার সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত উর্বশী রূপের তুলনা করলেই আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হবে। রামায়ণের বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডে রম্ভারূপের বর্ণনা—'তাহার সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত, মস্তকে মন্দার পুষ্পমালা···উহার জঘনদেশ স্থূল কাঞ্চীগুণশোভিত নেত্রের তৃপ্তিকর এবং রতিবিহারের উপহার স্বরূপ। সে আর্দ্র হরিচন্দন তিলক ও বাসন্তী কুসুমের অলঙ্কার এবং স্বীয় সৌন্দর্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার পরিধান মেঘবৎ নীলবস্ত্র, মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার, ভ্রূযুগল

৩৮। মহা, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। সাক্ষরতা প্রকাশন। দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৯-৫০

ধনুরস্থায় আয়ত, উরুদ্বয় করিশুণ্ডাকার এবং হস্ত পল্লববৎ কোমল। তাকে দেখে রাবণের যে রূপ-প্রশস্তি তা কামুকের, সৌন্দর্য রসজ্ঞের নয়।—'কঠিন স্তন যুগল স্বর্ণকুম্ভাকার ও সুশোভন'…'জঘনদ্বয় স্বর্ণচক্রতুল্য কাঞ্চীগুণ-মণ্ডিত।'[৩৯] অরণ্যকাণ্ডে শূর্পনখা রাবণের নিকট সীতার রূপ বর্ণনা করে—'তাহার নেত্র আকর্ণ আয়ত, মুখ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ এবং বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। সে সুনাসা ও সুরূপা। উহার কেশ সুচিক্কণ, নখ কিঞ্চিৎ রক্তিম ও উন্নত। কটিদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব নিবিড়, এবং স্তনদ্বয় স্থূল ও উচ্চ। সে বনশ্রীর ন্যায়, এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় তথায় বিরাজ করিতেছে। দেবী, গন্ধর্বী, কিন্নরী ও যক্ষীও তাহার সদৃশ নহে। অধিক কি, ঐরূপ নারী-রূপ আমি পৃথিবীতে আর কখন দেখি নাই।'[৪০]

শকুন্তলার রূপ বর্ণনায় মহাভারতকার লিখেছেন—'মধুর হাসিনী রূপ-যৌবনবতী, লোকললামভূতা ললনার অলোক সামান্য রূপলাবণ্য';[৪১] তিলোত্তমা—'ত্রিলোক মধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যে কোন বস্তু অতীব রমণীয় বলিয়া খ্যাত, বিশ্ববিৎ বিশ্বকর্মা সেই সমস্ত বস্তু তথায় আনয়ন করিলেন। তিনি নির্মাণ কালে সেই কামিনীর গাত্রে কোটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করিলেন। বিশ্বকর্মা বিনির্মিত রত্ন সংঘাত খচিত সেই কামিনী ত্রিলোকস্থ সমস্ত মহিলাগণের অধিক্ষেপ (শীর্ষস্থানীয়) স্বরূপ হইল। ঐ লোকললামভূতা ললনা রত্নসমূহের তিল তিল অংশ লইয়া নির্মিত'।[৪২] মহাভারতের প্রধানা নায়িকা দ্রৌপদী কৃষ্ণা হলেও তাঁর রূপরচনায়ও মহাভারতকার কম উচ্ছ্বসিত নন—"সর্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী যজ্ঞবেদি মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। ত্রিভুবনে তদীয় রূপলাবণ্যের তুলনা ছিল না। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, লোচন যুগল পদ্মপলাশের ন্যায় সুশোভন ও অতি বিস্তীর্ণ,

---

৩৯। রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড, ২৬ সর্গ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত।
ভারবি সং পৃঃ ৯৫১-৫২

৪০। ঐ, অরণ্য কাণ্ড চতুস্ত্রিংশ সর্গ তদেব পৃঃ ৩৭২

৪১। মহা, আদি, ৭১ অধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত, সাক্ষরতা সং পৃঃ ৭৫

৪২। মহা, আদি ২১১ অধ্যায় তদেব পৃঃ ২০৯

কেশজাল নীল ও আকুঞ্চিত, পয়োধর পীন ও উন্নত, ভ্রূদ্বয় দেখিতে সুচারু; কন্যার গাত্র হইতে নীলোৎপল সদৃশ গন্ধ একক্রোশ পর্যন্ত ধাবিত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন মানুষী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কোন দেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।'[৪৩] 'ইনি নাতিহ্রস্বা ও নাতিদীর্ঘা। ইহার গাত্রে নীলোৎপল গন্ধ, চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, নিতম্ব অতি মনোহর ও বর্ণ বৈদুর্যমণির ন্যায় ছিল।'[৪৪] সুভদ্রা, তপতী, সত্যবতী, সাবিত্রী ইত্যাদি মহাভারতের অপরাপর রূপসীদের রূপ রচনায় অনুরূপ বর্ণনারই পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হবে। পুরাণ সমূহে, অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যে এমনকি আধুনিক পূর্ব মধ্য যুগের প্রাদেশিক সাহিত্যেও মহাকাব্যে বর্ণিত রমনী রূপ রীতির অনুসরণ দেখা যাবে। যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিদান সমূহকে উপমান করে পুরুষ হৃদয়ে রমণীরূপের আনন্দের প্রশস্তি।

পুরাণ কাহিনী—

পুরাণ গুলিতে প্রধানত বৈদিক যুগের কিম্বদন্তী ও পরম্পরাগত ইতিহাসের আখ্যান থাকলেও কোন কোন পুরাণে বিশেষত প্রথম দিকের ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে ইতস্তত সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসও অল্প-বিস্তার দেখা যায়। পুরাণ গুলিতে উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানের যে সব কাহিনী পাওয়া যায় তা প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। এক ধারার কাহিনী মোটামুটি ভাবে শতপথ ব্রাহ্মণে বিধৃত কাহিনীর অনুরূপ। দ্বিতীয় ধারাটি বহুলাংশে বেদ বহির্ভূত স্বতন্ত্র আখ্যান। দেখা যাচ্ছে, যে যজ্ঞক্রিয়া থেকে উর্বশী পুরূরবা নাম দুটি এবং কাহিনী গড়ে উঠেছিল বৈদিক যুগেই তার বিস্মৃতি ঘটেছিল। তাই তখন তার সঙ্গে প্রাকৃতিক ঘটনার রূপারোপ করে বৈদিক কাহিনী রূপলাভ করেছিল। পৌরাণিক যুগে সে তাৎপর্যও ভুলে যাওয়ার জন্য ঐ সব নাম নিয়ে গড়ে উঠেছে রাজমাহাত্ম্য তথা মানবিক কাহিনী। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংকলকদের উপাস্য মাহাত্ম্য। বৈদিক কাহিনীতে যেসব ফাঁক ছিল সেগুলি বাস্তব মানবিক ঘটনা ও ব্যাখ্যান দিয়ে ভরে তোলা হয়েছে এবং

৪৩। মহা, আদি, ১৬৭ অধ্যায় পৃঃ ১৭৪

৪৪। মহা, আদি, ৬৭ অধ্যায় পৃঃ ৭৩

অধিকতর পরিমাণে কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বিশ্বাস্ত করে তোলার প্রয়াসও দেখা যাচ্ছে। মানবজীবনের এবম্বিধ রূপায়ণেই রয়েছে পুরাণের সাহিত্যিক উপাদান।

শতপথ ব্রাহ্মণের বিন্যাস অনুযায়ী কাহিনী পাই, বিষ্ণু, ভাগবত ও বায়ু পুরাণে, হরিবংশে, দেবী ভাগবতে ও পদ্ম পুরাণের স্বর্গ খণ্ডে। এর মধ্যে আবার বায়ু পুরাণ, দেবীভাগবত ও স্বর্গখণ্ডের কাহিনী প্রায় হরিবংশের অনুরূপ—দু'একটা পংক্তির হেরফের ছাড়া পার্থক্য বিশেষ নাই। আমরা তাই বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ এবং হরিবংশের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করব।

পুরূরবার জন্ম বৃত্তান্ত তথা গুণ কীর্তন বা মাহাত্ম্যের বর্ণনা তিন গ্রন্থেই আছে উপরন্তু আছে পুরাণের সর্তানুযায়ী বংশ বৃত্তান্ত অর্থাৎ পুরূরবার পিতৃ পরিচয়। শতপথে যার নাম গন্ধ নেই। এই সব বংশ কাহিনীর উৎস খুঁজে পাওয়া যায় সূত্র সাহিত্যে-বিশেষত কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে। রাজা পুরূরবার রূপগুণ বর্ণনা পুরাণগুলিতে প্রায় এক রকমই।[৪৫] শতপথে প্রেম নিবেদনের কোন কথা নেই অবশ্য বৌধায়ণ শ্রৌতসূত্রে কিছু প্রয়াস আছে। হরিবংশে বা তদনুযায়ী পুরাণেও পূর্বরাগের কোন কথা নাই।

সরাসরি বলা হয়েছে ব্রহ্মশাপে মনুষ্যলোকে বসবাস করতে হবে জেনে উর্বশী শাপ মোচনের জন্য সর্ত করে পুরূরবার সঙ্গে এসে বাস করতে লাগলেন।[৪৬] বিষ্ণু এবং ভাগবত পুরাণ হলেও এই দুই গ্রন্থের সাহিত্যগুণ তথা কাব্যরস পাঠকের অবিদিত থাকেনা। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, পুরাণ বা অতি-কথাই জাতির আদি সাহিত্যকৃতি। কাজেই এই দুই গ্রন্থে এমন একটা প্রেম কাহিনীর পূর্বরাগ সম্ভাবনা উপেক্ষিত হয় নাই। বিষ্ণু পুরাণে আছে—মিত্রাবরুণের অভিশাপে নরলোকে বাস করতে হবে তাই উর্বশী এসে উপস্থিত হলেন মর্তে। সেখানে এসে দেখা হল সত্যবাদী রূপবান পুরূরবার সঙ্গে।

৪৫। তং ব্রহ্মবাদিনম্ ক্ষান্তং ধর্মজ্ঞ সত্যবাদিনম।—হরিবংশ শঙ্করনারায়ণ যোশী, চিত্রশালা প্রেস, পুনা। ২৬।৪

৪৬। ব্রহ্মশাপাভিভূতা সা মানুষং সমুপস্থিতা।
ঐলং তু তাং বরারোহা সময়েন ব্যবস্থিতা॥ ২৭।২০
—বায়ু পুরাণ Ed. Rajendra Lal Mitra ASB 1888 Calcutta

তাঁকে দেখা মাত্র অশেষমান ও স্বর্গসুখাভিলাস পরিত্যাগ করে তদগত চিত্তে উর্বশী এসে উপস্থিত হলেন তাঁর সামনে। পুরূরবাও তাঁকে সকল স্ত্রী সৌন্দর্যের সৌকুমার্য ও লাবণ্য থেকে অধিক লাবণ্যাদিযুক্ত অতিবিলাস হাস্যাদি গুণশীলা দেখে তদধীন চিত্ত হলেন। উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট অনন্য দৃষ্টি হয়ে আর সব প্রয়োজন ভুলে গেলেন।

বৈদিক কাহিনীতে উর্বশীই প্রথম প্রেম নিবেদন করেছেন।—পুরূরবা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন আমি উর্বশী অপ্সরা—যে আপনাকে কামনা করে একবৎসর ধরে অনুসরণ করেছে।[৪৭] কিন্তু রাজতন্ত্রের আমলে, পৌরাণিক যুগে সামাজিক আদর্শের পরিবর্তনের ফলে নারী হারিয়েছে তার নিঃসঙ্কোচ সহজতা। তাই বিষ্ণু পুরাণে[৪৮] আছে রাজাই প্রথম প্রেম নিবেদন করলেন. বললেন,—

'সুভ্রূ, তোমাকে আমি কামনা করি. তুমি প্রসন্না হও আমার প্রতি অনুরাগী হও।' এই বলা হলে লজ্জাবনতা উর্বশী বললেন—'তাই হবে, যদি আপনি আমার সর্তগুলি পালন করেন।'

—বলুন আপনার কি সর্ত—রাজা বললেন।

—আমার পুত্রতুল্য মেষদ্বয়, আপনি কখনই শয্যার পাশ থেকে দূরে সরাতে পারবেন না। আপনাকে যেন আমি নগ্ন না দেখি। ঘৃতমাত্র হবে আমার আহার।'

রাজা বললেন তাই হবে।

ভাগবতেও প্রেম নিবেদনের পালা প্রায় অনুরূপ। বিষ্ণুপুরাণে শাপের কথা জেনে মর্ত্যে এসেই দেখা পেলেন পুরূরবার। আর ভাগবতে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছে স্বর্গপুরে ইন্দ্রালয়ে সুরর্ষি নারদের মুখে পুরূরবার রূপ, গুণ, ঔদার্য, চরিত্র ও বিক্রমের কথা শুনে। 'এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু কথা

৪৭। কস্ত্বমিত্যহমূর্বশ্যপ্সরেতি হোবাচ। মা ত্বাং সংবৎসরং কাময়ামানম্বচারিষং। —বৌ, শ্রৌ

৪৮। বিষ্ণুপুরাণ—আর্যশাস্ত্র, চতুর্থ বর্ষ কার্তিক ১৩৭২ চতুর্থাংশ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪।৬ ২০-২৩

শুনেছি'—আর তাতেই প্রেমাবিষ্ট হয়ে উর্বশী তাঁর কাছে চলে এলেন। তাঁকে দেখে সেই রাজাও হর্ষোৎফুল্ল লোচনে মধুর স্বরে তাঁকে বললেন,—

হে বরাননা, আপনার শুভাগমন হোক, আপনার জন্য কি করতে পারি। আমার সঙ্গে বিহার করুন। আমাদের মিলন চিরন্তন হোক।

উর্বশী বললেন—হে সুন্দর কার না দৃষ্টি এবং মন আপনার প্রতি রিরংসায় আসক্ত না হয়ে অন্যের দিকে যাবে? কারণ যে পুরুষ শ্লাঘ্য সে রমণীদের বরণীয়, আপনার সঙ্গে আমি বিহার করব। এই বলে যথাপূর্ব তাঁর সর্তাদি উল্লেখ করলেন। রাজা বললেন—'তাই হবে।' মনে মনে ভাবলেন নরলোক মোহন কি এই রূপ। কি ভাব।' বললেন—আপনি স্বয়ং এসেছেন কোন মানুষ আপনাকে না সেবা করবে।[৪৯]

পুরাণের পঞ্চলক্ষণ অতিক্রম করে চরিত্রায়নের ঈষৎ প্রয়াস এবং প্রেমের মানবিক সৌন্দর্য সৃষ্টির এই প্রচেষ্টা সাহিত্য পদবাচ্য তা সকলেই স্বীকার করবেন।

তারপর উভয়ের বিহার বর্ণনা। বৈদিক সাহিত্যে এ ধরনের কোন বর্ণনা নাই। হরিবংশ এবং তদনুসারী পুবাণগুলিতে বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণাপেক্ষা বিহার বর্ণনা বিস্তৃততর। চৈত্ররথ বনে, রম্য মন্দাকিনী তটে, অলকায়, বিরাট নন্দন বনে, গন্ধমাদন পর্বতের পাদদেশে, মেরুপৃষ্ঠে এবং তারও উত্তরে ৬০ হাজার বছর বিহার করলেন।[৫০] বিষ্ণুপুরাণে আছে,—অলকায়, কখনও চৈত্ররথাদিবনে, কখনো অতি রমণীয় অমল পদ্মসমূহ সুশোভিত মানসাদি সরোবরের কথা আছে ভাগবত পুরাণে—সম্ভবত অধিকতর বেদানুগত বলে—বিহার বর্ণনার বাহুল্য নাই। চৈত্ররথাদি বলেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে বরং পদ্মগন্ধা উর্বশীর মুখ সৌরভের অতিরিক্ত উল্লেখ দেখা যায়।[৫১]

এরপর আসছে উর্বশী বিচ্ছেদের জন্য গন্ধর্বদের ষড়যন্ত্রের কথা। শতপথে[৫২]

৪৯। শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৪ ১৫-১৬

৫০। বি, পু—৪।৬।২৯

৫১। পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধয়া তন্মুখামোদ⋯ভা ৯।১৪ ২৪-২৫

৫২। শ, ব্রা ১১।৫।৩।২

গন্ধর্বদের কথা আছে বিশেষ কারো নাম নাই। গন্ধর্বরা মনুষ্যলোক থেকে উর্বশীকে ফিরিয়ে আনার জন্য একে একে উর্বশীর দুই মেষ হরণ করে। কাত্যায়ণ শ্রৌত সূত্রে মেষ হরণের কথা নাই। বৌধায়নে এ কাহিনী বিস্তৃততর, সেখানে উর্বশীর বোন পূর্বচিত্তি অপ্সরাকে আনা হয়েছে। হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণে গন্ধর্বেরা বিশেষ করে গন্ধর্ব বিশ্বাবসু উর্বশীকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব করে। ভাগবতে, দেবী ভাগবতে এবং পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে বিশ্বাবসুকে নিয়োগ করেছেন ইন্দ্র। ভাগবতে অবশ্য বিশ্বাবসুর নাম নেই। ভাগবতে ইন্দ্র বলেছেন—উর্বশী ছাড়া আমার স্বর্গ শোভা পায় না।[৫৩] বিষ্ণু পুরাণে মানবিক বোধ বিস্তৃততর। মর্তলোকে বিহারের উপভোগে তৎপ্রতি প্রবর্ধমান অনুরাগে উর্বশীর মন থেকে অমরলোক বাসেরও স্পৃহা চলে গেল। উর্বশী বিনা স্বর্গলোক অপ্সরা, সিদ্ধ গন্ধর্বদের কাছে রমণীয় মনে হল না। তাই উর্বশী পুরূরবার সর্ত জ্ঞাত বিশ্বাবসু গন্ধর্ব গেল রাতে মেষ হরণ করতে।[৫৪] হরিবংশে—উর্বশী এতকাল মানবলোকে রয়েছে বলে গন্ধর্বেরা চিন্তাকুল। স্বর্গভূষণ উর্বশীকে ফিরিয়ে আনার উপায় নির্ধারণে যেন এক পরামর্শ সভার আয়োজন হয়েছিল। সেখানেই বিশ্বাবসু জানালেন যে উর্বশী-পুরূরবার মিলন সর্ত তাঁর জানা। তারপর মেষহরণ পর্ব। গন্ধর্বেরা এসে খাটে বাঁধা মেষ দুটি একে একে হরণ করলেন।[৫৫] একটি অপহৃত হলে উর্বশী কেঁদে উঠলেন। দ্বিতীয়টিও নিয়ে গেলে কান্নার সঙ্গে জুড়ে দিলেন ভর্ৎসনা। প্রথমটি হরণকালে কান্না শুনে রাজা, দেবী আমাকে নগ্ন দেখে ফেলবে ভেবে শুয়েই রইলেন। দ্বিতীয়টি অপহৃত হলে স্ত্রীর গালাগাল শুনে অন্ধকারে দেখতে পাবে না ভেবে খড়্গ হাতে রাজা ধাবিত হলেন। আর তখনই গন্ধর্বেরা বিদ্যুৎ চমকাল। উর্বশী রাজাকে সেই আলোকে নগ্ন দেখে তিরোহিত হলেন। উর্বশীর খেদ ও তিরস্কারের মধ্য দিয়ে তিন গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মেষ অপহৃত হলে, তাঁর শাপমোচন কাল আগত জেনে

৫৩। উর্বশী রহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে। ভা—৯।১৪।২৫

৫৪। বি, পু ৪।৬।২৯-৩০

৫৫। হরি ২৬।১৯, ২০

অভ্র সুরেই হরিবংশের উর্বশী বললেন—হে রাজন, আমার পুত্র অপহৃত হলে আমি অনাথের মতো হলাম প্রভু।[৫৬] বিষ্ণু পুরাণে প্রথম মেষ হরণের পর 'অনাথা আমি, কেউ আমার পুত্র হরণ করেছে, আমি কার শরণ নেব' বলে কাঁদলেও দ্বিতীয় মেষ-হরণের পর তাঁর গলা চড়েছিল ভর্ৎসনায়—'আমি অনাথ, অভর্তৃকা কুপুরুষাশ্রিতা।'[৫৭] কিন্তু ভাগবতের উর্বশী যে ভাষায় বিলাপ জুড়েছিলেন তা শুনে কোন পুরুষেরই শয্যাপার্শ্বে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। সে গলাগালি বাংলা করলে এই রকম শোনায়—হায় আমার কপাল! কি কুস্বামীর হাতে পড়েছি, নপুংসক নাকি? নিজেকে আবার বলে বীর! এর হাতে পড়ে আমার সর্বনাশ হল, আমার ছেলেদের ডাকাতে নিয়ে গেল। ইনি দিনের বেলায় পুরুষ আর রাত হলে মেয়েদের মতো শুয়ে থাকেন।[৫৮] ইত্যাদি

তারপর শোক সন্তপ্ত রাজা নানা স্থানে খুঁজতে খুঁজতে উর্বশীর দেখা পেলেন কুরুক্ষেত্রে পদ্ম সরোবরের তীরে। হরিবংশে তার নাম হেমবতী পুকুর; বিষ্ণুপুরাণে পদ্ম সরোবর কিন্তু ভাগবতে মিলন স্থান কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীতীরে। উর্বশী সে স্থানে পাঁচজন[৫৯] সখীর সঙ্গে জলক্রীড়া করছিলেন। ভাগবতে এই পাঁচ সখীর উপস্থিতি আছে মাত্র কোন ভূমিকা নেই। হরিবংশে এবং বিষ্ণুপুরাণে কিন্তু এদের উপেক্ষা করা হয় নাই। হরিবংশে আছে রাজাকে দূর থেকে দেখে উর্বশী সখীদের বলেন—এই সেই পুরুষোত্তম, যার সঙ্গে আমি বাস করেছিলাম।—সেই রাজাকে দেখি বলে তাঁরা সকলে রাজার সামনে এলেন।[৬০] কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে উর্বশী পুরূরবার সংলাপ শেষ হয়ে গেলে উর্বশী সখীদের কাছে ফিরে এসে বলেন—'এই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যার সঙ্গে আমি এতকাল অনুরাগে আকৃষ্ট হয়ে সহবাস করেছিলাম।' একথা শুনে অপর অপ্সরারা বলতে লাগলেন—'আহা কি এর রূপ! তাঁর সঙ্গে

৫৬। হরি ২৬।২৪

৫৭। বি, পু ৬।৩১

৫৮। ভা ৯।১৪।২৮-২৯

৫৯। বিষ্ণুপুরাণে অবশ্য চারজন

৬০। হরি ২৬।৩৫

আমাদেরও চিরকাল সহবাসের ইচ্ছা হয়।[৬১] এই সংলাপে উভয় গ্রন্থের কাহিনীতে মানবরসের সিঞ্চন ঘটেছে বলে সাহিত্যোৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে। এখানে ঋগ্বেদের ১০/৯৫ সূক্তের উল্লেখ তিন গ্রন্থেই আছে। তবে হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণে প্রথম ঋকের প্রথম চরণ জায়েহতিষ্ঠ মনসি ঘোরে বচসি-রূপে—হরিবংশে আরো একটি তিষ্ঠহ যোগ করে এইরূপ নানা সূক্ত বলতে লাগল বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভাগবতে[৬২] কিন্তু ঋগ্বেদের উক্ত সূক্তের ১নং ১৪নং এবং ১৫নং ঋক ঈষৎ পরিবর্তিত ভাষায় উর্বশী পুরূরবার সংলাপ-রূপে উদ্ধৃত হয়েছে। সখীদের মধ্যে দেখে পুরূরবা সূক্ত বলেছিলেন—হায় প্রিয়ে দাঁড়াও, দাঁড়াও, অয়ি নিষ্ঠুরা আমাকে ত্যাগ করা উচিত হবে না। তোমাকে আজও নিবৃত্ত হয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। আমার এই সুদেহ তুমি দূরে আকর্ষণ করে এনেছ দেখ তা এখানে পড়ে যাবে, তোমার প্রেমাস্পদ না হওয়ায় নেকড়ে ও শকুনের খাদ্য হবে। উর্বশী বললেন—'মরোনা, তুমি পুরুষ. ধৈর্য হারিও না, বৃকেরা তা খাবে না, স্ত্রীলোকের সখ্য কোথাও থাকে না, স্ত্রীলোকের হৃদয় নেকড়ের মতো।'

ঋগ্বেদের ১০।৯৫ সূক্তের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ভাগবতকার ঋগ্বেদের ঋকের কিছু কিছু শব্দ অবিকৃত রাখলেও যে সব শব্দের অর্থ বিস্মৃত সে সব জায়গায় উপলব্ধি অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার করেছেন। ঋগ্বেদের পঞ্চদশ ঋকে উর্বশী প্রেমবেদনার খেদে স্ত্রীজাতির প্রতি ধিক্কার দিয়েছেন। ভাগবতকার এই পর্যন্ত উদ্ধার করে স্ত্রীনিন্দার সুযোগ আত্মসাৎ করেছেন। বস্তুত বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রচারক ভাগবত কিঞ্চিৎ নারী বিদ্বেষী। পুত্রবৎ পালিত ভেড়া চুরি হবার সময় ভাগবতের উর্বশী যে ভাষায় গালাগালি করেছেন তা আর যাই হোক উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক নয়। এখানে পঞ্চদশ ঋক উদ্ধার করে ভাগবতকার যে আরো দুটি স্বরচিত শ্লোক উর্বশীর মুখে বসিয়েছেন তা থেকেই এই মনোভাব স্পষ্ট হবে।—'রমণীগণ স্বভাবত অকরুণ, ক্রুর, চঞ্চলা প্রিয়ের জন্য অধর্মেরও সাহস করে। অল্প অর্থের জন্য বিশ্বস্ত স্বামী ও ভাইকেও হত্যা করে। যারা পুংশ্চলী, তারা স্বৈরাচারী, তারা সকল

৬১। বি, পু, ৪।৬।৩৩

৬২। ভা ৯।১৪।৩৪-৩৬

সৌহার্দ্য পরিত্যাগ করে নিত্য নতুন পুরুষ অভিলাষ করে।'[৬৩] এই প্রত্যক্ষ প্রচারের বাহন করার ফলে ভাগবতের উর্বশী চরিত্রের অবনমন ঘটেছে।

কেবলমাত্র নবমস্কন্ধের চতুর্দশ পরিচ্ছেদের উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যান প্রসঙ্গেই নয়। একাদশস্কন্ধের ২৬ অধ্যায়েও এই উপাখ্যানের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে বৈরাগ্য প্রচার তথা অধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে, নারী মোহ যে পুরুষকে কিরূপ অধঃপতিত করে তারই দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে পুরূরবার খেদ বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য বৈদিক সাহিত্যে কোথাও এ জাতীয় খেদের উল্লেখ নাই।

—বিশ্রুতকীর্তি সম্রাট পুরূরবা উর্বশীর মোহে মুহ্যমান ছিলেন বলে তাঁর বিরহে কাতর হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাৎপ্রাপ্তির পরে শোকাবসানে এই গাথা গেয়েছিলেন। উর্বশী তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দেখে রাজা কাতর কণ্ঠে—'হে জায়ে, হে ঘোরে থাকো',—বলতে বলতে উলঙ্গ হয়ে তার অনুসরণ করছিলেন। উর্বশী তাঁর চৈতন্য হরণ করেছিল বলে কামনায় অতৃপ্ত চিত্তে বহু বছর বহুরাতের আরম্ভ ও অবসান বুঝতে পারে নাই। এ পর্যন্ত তবু একরকম কিন্তু তার পরেই ঐল উবাচ বলে পুরূরবার মুখে যে সব উক্তি বসিয়েছেন তার সঙ্গে বৈদিক কাহিনী বা মানবিকতা বা সাহিত্য বিস্তারের কোন সঙ্গতি নাই। বৈরাগ্য প্রচারক ভাগবত স্ত্রীমোহ যে মানুষকে পরমার্থ বিমুখ করে আত্মবিনাশ ঘটায় তাই প্রচারে অনেকগুলি শ্লোক উপস্থিত করেছেন।—'হায়! আমার মোহ কত বিস্তৃত, কত কাম বিমূঢ়। উর্বশী গলাজড়িয়ে আয়ুর কতখানি যে নষ্ট হয়েছে তাও স্মরণ হয় নাই। উদয়াস্ত বছরের দিনগুলি কিভাবে অতিবাহিত হল বুঝতে পারি নাই। কি আমার ভ্রম! রাজচক্রবর্তী হয়েও রমণীদিগের ক্রীড়াধীন ছিলাম। রাজ্য, রাজচক্রবর্তীত্ব সহ পরিচ্ছদও ত্যাগ করে উলঙ্গ হয়ে উন্মাদের ন্যায় রমণীর অনুগমন করেছি, ইত্যাদি। এইভাবে পুরূরবা নারীমোহের অসারতা সম্পর্কে বিলাপ করে এবং উর্বশীতে নিস্পৃহ হয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে আত্মারাম হয়েছিলেন।[৬৪]

৬৩। ভা ৯।১৪।৩৬-৩৭

৬৪। ভা ১১।২৬

ঋগ্বেদের সূক্তাদি কথিত হলে উর্বশী রাজাকে জানালেন যে তিনি অন্তর্বত্নী। পুরূরবা যেন এক বছর বাদে ফিরে আসেন তাহলে তিনি উর্বশীর সঙ্গে এক রাত সহবাস করতে পাবেন এবং পুত্রকেও পাবেন। তিন গ্রন্থেই এই অংশ প্রায় এক রকমই। বৎসরান্তে পুরূরবা ফিরে এলেন। উর্বশী তাঁকে পুত্র আয়ুকে দিলেন।[৬৫] একরাত সহবাসও হল। তারপর আসন্ন বিরহে শঙ্কিত দেখে উর্বশী পুরূরবাকে বললেন[৬৬]—আমাদের প্রতি প্রীতির বশে গন্ধর্বেরা আপনাকে বর দেবে। আপনি বর চাইবেন গন্ধর্বদের সমানত্ব।[৬৭] ভাগবতে এই জায়গা একটু অন্য রকম। সেখানে উর্বশী পুরূরবাকে বিরহাশঙ্কাতুর দেখে তাঁকে গন্ধর্বদের অনুনয় করতে বললেন তাহলে তাঁরা উর্বশীকে রাজার হাতে দেবেন। বিষ্ণুপরাণে আছে উর্বশী বর চাইতে বললে রাজা বললেন—'সকল শত্রু পরাজিত, ইন্দ্রিয় সামর্থ্যও রয়েছে, ধন এবং সৈন্য বাহিনী বর্ধমান একমাত্র উর্বশীর সমলোকে বাস ছাড়া আমাব আর কিছু অপ্রাপ্য নাই সুতরাং আমি এই উর্বশীর সঙ্গে কাল যাপন ইচ্ছা করি।[৬৮] এইরূপ বলা হলে গন্ধর্বেরা রাজাকে অগ্নিস্থালী দিয়েছিলেন। ভাগবতে আছে অগ্নিস্থালীকেই উর্বশী মনে করে ভ্রান্ত রাজা বনে বনে ঘুরে ছিলেন। তারপর ভুল বুঝতে পেরে অগ্নিস্থালী বনে রেখে গৃহে ফিরে গেলেন। বাড়ি ফিরে রোজ রাতে এই বিষয়ে ভাবতে লাগলেন তখন তাঁর মনে ত্রেতা যুগের সূচনায় কর্ম বোধক বেদত্রয় আবির্ভূত হল।[৬৯] ভাগবতের এই চরণটি —ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্তত' লক্ষণীয়। ভাষ্যে শ্রীধর স্বামী লিখেছেন মনসি ত্রেতায়াং ত্রয়ী অবর্তত কর্ম বোধকং বেদত্রয়ং প্রাদুর্ভূত।

এর তাৎপর্য রয়েছে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে। বিষ্ণুপুরাণে[৭০] অগ্নিস্থালী

৬৫। বিষ্ণুপুরাণেই শুধু আয়ুর নাম আছে।

৬৬। অথৈনামুর্বশীপ্রাহ কৃপণং বিরহাতুর ৯।১৪।৪১

বিচ্ছেদের এই মানবিক শঙ্কার কথা বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে নাই।

৬৭। হরি ২৬।৪০

৬৮। বি, পু ৪।৬।৩৭

৬৯। ভা ৯।১৪।৪৩

৭০। বি, পু, ৪।৬।৪০-৪২

দেবার সময় গন্ধর্বেরা বলে দেন—এই আগুন তিন ভাগ করে সেই আগুনে দেবানুসারী হয়ে উর্বশী সহবাস কামনা করে যজ্ঞ করবে। তাহলে নিশ্চয় অভিলষিত বস্তু পাবে। বনে এসে রাজা ভাবলেন মূঢ়তা বশত উর্বশীকে না এনে অগ্নিস্থালী নিয়ে এলাম। গৃহে অর্ধরাত্রে বিনিদ্র রাজার মনে হল—উর্বশীর সালোক্য লাভের জন্যই গন্ধর্বেরা অগ্নিস্থালী দিয়েছে তাই তিনি বনে পরিত্যক্ত অগ্নিস্থালী আনার জন্য গিয়ে দেখলেন অগ্নিস্থালীর স্থানে এক শমীগর্ভ অশ্বত্থ। তখন তিনি সেই অশ্বত্থকেই অগ্নি রূপে গ্রহণ করে নিজপুরে গিয়ে তা থেকে গায়ত্রী পাঠ করে গায়ত্রীর অক্ষর সংখ্যার সমান অঙ্গুলি প্রমাণ অরণি নির্মাণ করেন। সেই অরণি মন্থন করে অগ্নিত্রয় উৎপাদন করে তাতে বেদানুসারে উর্বশী সহবাস রূপ ফল কামনা করে হোম করতে লাগলেন। তৎ প্রসাদে তিনি গন্ধর্ব লোক প্রাপ্ত হলেন। আর উর্বশী বিয়োগ হলনা।

ভাগবতে এই অংশে অরণি গুলির নাম করণের ব্যাখ্যার প্রয়াস আছে। রাজা সেই অশ্বত্থ থেকে দুটি অরণি নির্মাণ করলেন। যজুর্বেদের মন্ত্রানুসারে[৭১] নিচের অরণিটিকে উর্বশী এবং উপরেরটিকে নিজ রূপে ধ্যান করে এবং উভয়ের মধ্যে যা উৎপন্ন তাকে পুত্ররূপে ধ্যান করেন। তাঁর মন্থনে অগ্নি জন্মাল। সেই আগুন তিন বেদবিহিত সংস্কারের দ্বারা আহবণীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ এই ত্রিরূপ হলে রাজা সেই ত্রিবৃৎ অগ্নিকে পুত্ররূপে কল্পনা করলেন এবং উর্বশীর সালোক্য কামনা করে সর্বদেবময় হরির যজ্ঞ করলেন। অতঃপর ভাগবতকার বলেছেন সত্যযুগে বীজস্বরূপ প্রণব রূপে একমাত্র বেদ ছিল—নারায়ণই একমাত্র দেবতা, অগ্নিও এক, বর্ণও একই ছিল। ত্রেতা যুগের প্রথমে পুরূরবা থেকে তিন বেদ হয়।[৭২] এ ব্যাখ্যা যজুর্বেদের মন্ত্র অনুযায়ী। আগুন জ্বালানোর অনুষ্ঠানে পুরুষ বোঝাতে যে অরণির নাম হল পুরূরবা। পৌরাণিক যুগে এসে তিনিই হলেন যজ্ঞ প্রবর্তক বেদ বিভাজক রাজা।

৭১। শু, য ৫।২

৭২। এই কথাটি কিন্তু তিন গ্রন্থেই আছে

একোঽগ্নিরাত্মাভবৎ ঐলেন ত্বত্র মন্বন্তরে ত্রেতাপ্রবর্তিতা বি, পু ৪।৬।৪৬

পুরূরবস এবাসৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপঃ। ভা ৯।১৪।৪৯

পুরাণে আর একটি পৃথক কাহিনী আছে। সে কাহিনী পাই মৎস্য[৭৩] ও পদ্ম পুরাণে।[৭৪] দুজায়গাতেই কাহিনী এক। এখানে ওখানে দু' একটা শব্দ আলাদা অথবা এক আধটা চরণ কম বেশি মাত্র। অবশ্য মৎস্য পুরাণে যেখানে ব্রহ্মার প্রশস্তি পদ্ম পুরাণে সেখানে বিষ্ণুর স্তুতি কাহিনী নিম্নরূপ—

ইলার উদরে জন্মেছিলেন ধর্ম পরায়ণ বুধ পুত্র পুরূরবা। তিনি ধর্মানুযায়ী সারা পৃথিবী পালন করেছিলেন, শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সর্বলোকে সমাদৃত হয়েছিলেন। তিনি রম্য হিমাদ্রি শিখরে পিতামহ ব্রহ্মার[৭৫] আরাধনা করে অগাধ ঐশ্বর্য ও সপ্তদ্বীপের অধিকার লাভ করেছিলেন। কেশি প্রভৃতি দৈত্যরা তার দাস হয়েছিল এবং রূপে মুগ্ধ হয়ে উর্বশী তাঁর পত্নী হয়েছিলেন। স্বয়ং কীর্তি হয়েছিলেন তাঁর চামর বাহিনী। ব্রহ্মার প্রসাদে ইন্দ্র তাঁকে তাঁর আসনের অর্ধেক দান করেছিলেন। ধর্ম, অর্থ ও কামের নিয়ম অনুযায়ী তিনি সকলকে পালন করেছিলেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম তাই তাঁকে দেখতে এসেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'কেন আমাদের সমান দেখেন'। রাজা তাদের পাদ্য অর্ঘ দিয়ে স্বর্ণাসনে বসিয়ে ছিলেন। ধর্মকে একটু অতিরিক্ত পূজা করায় কাম এবং অর্থ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাপ দিলেন। অর্থ শাপ দিলেন যে অর্থ লোভে তাঁর বিনাশ হবে। কামও শাপ দিলেন যে গন্ধমাদনে কুমার বনে এসে উর্বশী বিয়োগে রাজা উন্মাদ হবেন। ধর্ম আশীর্বাদ করলেন—রাজা চিরায়ু এবং ধার্মিক হবেন এবং তাঁর সন্তানেরা যাবৎ চন্দ্র-সূর্য-তারকা বৃদ্ধি পাবে। ষাট বছর উন্মত্ততার পর উর্বশী অপ্সরা আবার তাঁর বশীভূত হবে।

প্রতিদিন• পুরূরবা দেবেন্দ্রকে দেখতে যান স্বর্গপুরে। একদিন রথে করে যাবার সময় মাঝ পথে দেখতে পেলেন আকাশ পথে কেশি দানব চিত্রলেখা ও উর্বশীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। পুরূরবা কেশি দৈত্যকে পরাজিত

৭৩। মৎস্য পুরাণম্—গুরু মণ্ডল গ্রন্থ মালায়াস্ত্রয়োদশ পুষ্পম্॥ ২৪ অধ্যায় সং নন্দলাল মোর॥ কলকাত্তা 1954

৭৪। পদ্ম পুরাণ—কেদার নাথ ভক্তি বিনোদেন সম্পাদিতম্। রাধিকপ্রসাদ দত্তেন প্রকাশিতম্। p 53-54

৭৫। মৎস্য পুরাণে—ব্রহ্মার স্থানে বিষ্ণু

করে উর্বশীকে উদ্ধার করে ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিলেন। সেই থেকে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা বৃদ্ধি পায়।

ঋগ্বেদে কেশি সূর্যনাম—কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে[৭৬] আর উর্বশী উষা সুতরাং সূর্যজ্যোতি উষাকে হরণ করে বা বিনাশ করে। এখানেও আমরা সূর্যউষা প্রণয়াখ্যানের অনুস্মরণ দেখতে পাই। যা হোক, প্রীতিবশে ইন্দ্র পুরূরবাকে খুশী করার জন্য এক নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করান। ভরত প্রযোজিত 'লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর' নামক এই নাটকে মেনকা, উর্বশী এবং রম্ভা অংশ গ্রহণ করেন। নৃত্যকালে লক্ষ্মীরূপিনী উর্বশী পুরূরবাকে দেখে কামপীড়িত হয়ে অভিনয় ভুলে যান। তাতে ক্রুদ্ধ হযে ভরত মুনি অভিশাপ দেন যে তাঁকে স্বর্গচ্যুত হয়ে ভূতলে বাস করতে হবে এবং ৫৫ বছর লতা হয়ে থাকতে হবে আর পুরূরবাও সেখানে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হবে।

মৎস্য এবং পদ্ম পুরাণের এই কাহিনীই মহাকবি কালিদাসেব বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকে অনুসৃত। পণ্ডিতদেব মতে খ্রীষ্টীয পঞ্চম শতক ছিল কালিদাসের কাল। সুতরাং উক্ত পুরাণদ্বয় কালিদাস থেকে এই কাহিনী গ্রহণ করেছে মনে হতে পারে। অথবা অধুনাবিস্মৃত অপর কোন সাধারণ উৎস থেকে পুরাণে এবং কালিদাসের নাটকে এই কাহিনী আহৃত হযেছে। মনে হয গ্রন্থাকারে সংকলিত না হলেও কিম্বদন্তীরূপে এইসব কাহিনী প্রাচীনতর কাল থেকে লোক সমাজে প্রচলিত ছিল। বস্তুত পুরাণগুলি পণ্ডিতদের মতে ৮ম থেকে ১৪শ শতকের মধ্যে এমনকি কিছু কিছু তার পরেও গ্রন্থবদ্ধ হলেও সুদূর বৈদিক যুগ থেকে সেগুলির প্রচলন ছিল। কাজেই কালিদাস মৎস্য ও পদ্ম পুরাণোক্ত কাহিনীই গ্রহণ করেছিলেন মনে হয়।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে[৭৭] উর্বশীর উদ্ভব সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। পুরাকালে পুরাণপুরুষ ধর্মপুত্র বিষ্ণু হয়ে বিপুল তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য বসন্ত ও মদনের সঙ্গে অপ্সরাদের

৭৬। ঋ ১০।১৩৬।১

৭৭। পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড ২২ অধ্যায়—কেদারনাথ ভক্তি বিনোদেন সম্পাদিতা p 162

পাঠিয়েছিলেন। গীত বাদ্য ও হাবভাবের দ্বারা যখন হরিকে মোহিত করা হয়েছিল তখন তিনিও তাদের খেদের কারণ হয়েছিলেন। কন্দর্প, বসন্ত ও স্ত্রীদের ক্ষুব্ধ করতে তিনি তার উরু থেকে এক ত্রৈলোক্যমোহিনী নারী সৃষ্টি করেছিলেন। হরি দেবতাদের তাঁকে অপ্সরার মতো সম্মান করতে বললেন এবং নাম দিলেন উর্বশী। তারপর মিত্র বরুণের তথা অগস্ত্য বশিষ্টের সৃষ্টি কাহিনী। এই কাহিনীর আভাষ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও[৭৮] আছে। এর উৎস বোধ হয় কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র।[৭৯]

বদরীআশ্রমবাসী ভগবান নারায়ণের সমাধি ভঙ্গের জন্য প্রেরিত অপ্সরাদের ক্রীড়ার জন্য নারায়ণ নিজ উরু থেকে সৃষ্টি করেছিলেন উর্বশীকে। সর্বানুক্রমণী-কার বলেছেন ইতিহাসবিদরা এইরূপ বলেন। তার মানে এই আখ্যান বৈদিক যুগের শেষভাগেই প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। উর্বশীর উদ্ভবের কাহিনী ভুলে যাবার পর উর্বশী নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বোধহয় এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি। উর্বশী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আমরা নিরুক্ত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছি। ব্যাপ্ত্যর্থক উরু শব্দ পায়ের ঊর্ধ্বাংশের কথা মনে, জাগিয়েছে এবং তার থেকেই বোধ হয় নারায়ণের উরু থেকে জন্মের কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য উরুকে কামস্থান হিসেবে কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি এই ব্যাখ্যা করেছেন।

॥ অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্য ॥

অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যেও এই উপাখ্যান দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটক আর বৃহৎ-কথামঞ্জরী ও কথাসরিৎ—সাগর প্রভৃতি কথা সাহিত্যেও। কৌটিলীয় অর্থ-শাস্ত্রের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক।[৮০] এখানে বিনয়াধিকারিকের

৭৮। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৩।৭।১৬

৭৯। Katyayana Sarvanukramani of the Rigveda Ed, by A. A. Macdonell Oxford 1886 p 98

৮০। 'খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থশতকে কৌটিল্য নিজেই এই অর্থশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।' কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রম্ পৃঃ ২।৶০ translated by Dr. Radhagovinda Basak General Printers & Publishers Private Ltd. Cal. 13

প্রথমাধিকরণে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় জয় প্রকরণে—যে রাজা শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যের বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করেন এবং যিনি নিজ ইন্দ্রিয়বর্গকে স্ববশে আনতে পারেন নাই, তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও বিনষ্ট হন এই তত্ত্বের—দৃষ্টান্তরূপে পুরূরবার উল্লেখ করা হয়েছে। "লোভের বশবর্তী হইয়া ইলানন্দন (পুরূরবা) এবং সৌবীর দেশের রাজা অজবিন্দুও পীড়াদান পূর্বক (ব্রাহ্মণাদি) চারিবর্ণ হইতে অতিমাত্রায় ধনাপহরণ করায় (তাহাদের কোপেই) বিনষ্ট হয়েন।"[৮১] খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে[৮২] মহাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত মহাকাব্য বুদ্ধচরিতেও পুরূরবার ধনাপহরণের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে কামন্দকীয় নীতি সারের টীকায়। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকৃৎ বুদ্ধচরিতের অনুবাদের পরিশিষ্টে এর উল্লেখ করেছেন।[৮৩]

বৈদিক যুগের শেষভাগে যখন রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে তখন সম্ভবত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সামাজিক আধিপত্য লাভে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল এই সব গল্পে বোধহয় তারও স্মৃতি রয়েছে। পুরূরবার এই লোভ প্রসঙ্গে উর্বশীর যে উল্লেখ আছে তা সম্ভবত মৎস্য পুরাণের অনুরূপ কাহিনীরই ভগ্নাংশ। এরই প্রসঙ্গ টেনে কামনিন্দা পরিচ্ছেদে লোভী রাজাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে পুরূরবার কথা আনা হয়েছে—পুরূরবা স্বর্গ পরিভ্রমণ করে দেবী উর্বশীকে বশীভূত করেছিলেন তথাপি স্বর্ণলোভে অতৃপ্ত হয়ে ঋষিদের স্বর্ণ অপহরণ করতে গিয়ে বিনাশ প্রাপ্ত

৮১। ঐ বঙ্গানুবাদ p 14

৮২। The poet flourished between 50 B. C. and 100 A. D. with a preference for the first half of the first century A. D.—Buddha Charit for Acts of the Buddha Ed by E. H. Johnston D. Lit. Univ. of Punjab, Lahore, Calcutta Baptist Mission Press 1931

৮৩। 'নৈমিষ্যারণ্যবাসী ঋষিগণ যজ্ঞ রক্ষার জন্য পুরূরবাকে নিমন্ত্রণ করেন, যজ্ঞস্থলে স্বর্ণময় পাত্র দেখিয়া লোভবশত তাহা তিনি হরণ করেন।'

টীকায় গণপতি শাস্ত্রীও এই কাহিনীর উল্লেখ করেছেন—পুরূরবা লোভাতুর হয়ে নৈমিষ্যারণ্যে ঋষিদের যজ্ঞশালা থেকে প্রভূত ধন অপহরণে উদ্যত হলে ঋষিদের শাপে বিনষ্ট হন। তিনি একে 'ইতি ঐতিহ্যং কৈশ্চিদ বর্ণ্যতে'—এইরূপ পরম্পরা কেউ কেউ বলেন বলে নির্দেশ করেছেন।

হন।[৮৪] 'মারবিজয়' সর্গে বুদ্ধদেবকে মার বিচলিত করার জন্য পঞ্চবাণ যোজনা করে বলেন—"এর সামান্য মাত্র স্পর্শে চন্দ্রের পুত্র ঐড় সোমের নাতি হয়েও সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন অন্য পুরুষের আর কথা কি?[৮৫]

কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটক :

মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম' নাটকে উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যান নাট্যরূপে চিরায়ত সার্থকতা লাভ করেছে। মৎস্য পুরাণ বা পদ্মপুরাণের স্বর্গ খণ্ডে বিধৃত কাহিনীকে কালিদাস তাঁর অপূর্ব প্রতিভাবলে যৌবনোচ্ছল প্রেমের এক শাশ্বত রূপ দিয়েছেন। তরুণ হৃদয়ের যে প্রেমের কাছে— 'সমাজ-সংসার মিছে সব মিছে এ জীবনের কলরব, কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদি দিয়ে হৃদি অনুভব আঁধারে ডুবে গেছে আর সব।"—বলে মনে হয়, বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকের চতুর্থ স্বর্গে সেই তরুণ প্রেমের করুণ মাধবী মঞ্জরী! সেখানে নারীরূপ যেন বিশ্বসৌন্দর্যের সার সত্তার সঙ্গে একীভূত। গাছপালা, ফুল-পল্লবে, নদী-নির্ঝরে, আকাশের মেঘমালায় সৌন্দর্য যে সহস্রখণ্ডে ছড়িয়ে আছে উর্বশীর নারী সত্তায় তারই মূর্ত রূপ। অঙ্কানুক্রমে সংক্ষেপে কাহিনীটি উপস্থিত করা যাক।

অর্জুনসখা নারায়ণের উরু সম্ভূতা উর্বশী নাম্নী সুরস্ত্রী কৈলাসাধিপতি কুবেরের গৃহে নৃত্য প্রদর্শনান্তে ফেরার পথে দৈত্যদের দ্বারা সসখী বন্দিনী হয়েছেন বলে সহচরী অপ্সরারা কাঁদছিলেন। সূর্য উপাসনান্তে রাজা পুরূরবা আকাশপথে রথে করে ফিরছিলেন। কান্না শুনে এগিয়ে এসে রম্ভার কাছে শুনলেন যে, কারো তপস্যায় শঙ্কিত হলে মহেন্দ্র তার বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য যে সুন্দর আয়ুধ প্রয়োগ করেন, যিনি রূপ গর্বিতা লক্ষ্মী এবং গৌরীর দর্পহারিণী, যিনি স্বর্গের অলঙ্কার সেই উর্বশীকে সখী চিত্রলেখা সহ দানবেরা ধরে নিয়ে গেছে।

৮৪। Buddha Charit p 117

ঐড়শ্চ রাজা ত্রিদিবং বিগাহ্য নীত্বাপি দেবী বশমুর্বশীংতাম্।
লোভাদ্দৃষিভ্যঃ কনকঃ জিহীর্ষুর্জগাম নাশং বিষয়েষ্বতৃপ্ত॥ ১১।৫

৮৫। স্পৃষ্টঃ স চানেন কথংচিদৈড়ঃ সোমস্য নপ্তাপ্যভবদ্বিচিত্তো ইত্যাদি—
বুদ্ধচরিত ১৩।১২

-চোর কোন দিকে গেছে জেনে নিয়ে অপ্সরীদের হেমকূট শিখরে অপেক্ষা করতে বলে রাজা ঈশান কোণের দিকে দৈত্যদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। শীঘ্রই রাজা সসখী মূর্ছিতা উর্বশীকে উদ্ধার করে সোম দত্ত হরিণ কেতন রথে করে ফিরলেন। মূর্ছিতা উর্বশীর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেন রাজা। মূর্ছা ভঙ্গে রাজাকে দেখে উর্বশীও ভাবলেন দানবেরা হরণ করে উপকারই করেছে।

স্বর্গ থেকে নেমে এলেন চিত্ররথ। নারদের মুখে কেশিদৈত্য কর্তৃক উর্বশী অপহৃত শুনে দেবরাজ তাঁকে পাঠিয়েছেন। দেবরাজের সাক্ষাত অন্য সময় করবেন বলে রাজা বিদায় নিলেন। কিন্তু প্রেমের দেবতা মীনকেতন ইতিমধ্যেই উভয়ের মনে সন্ধান করেছেন পঞ্চবাণ। বিদায় কালে তাই ছল করে তাঁর বাঁধল মালা লতাগাছের ডালে।[৮৬] মালা ছাড়াবার উপলক্ষ করে পিছন ফিরে সতৃষ্ণ নয়নে রাজাকে দর্শন। রাজাও সখেদে বললেন—হায়! যা পাবার নয় তাতেই মদন মানুষকে আকুল করে কেন?[৮৭]

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজউদ্যানে বসে রাজা উর্বশীর জন্য আকুলতা প্রকাশ করতে লাগলেন। মুগ্ধ রাজা মনে করেন যে প্রকৃত সৌন্দর্যের কোথাও যদি পক্ষপাত হয়ে থাকে তবে তা এই উর্বশীর উপর।[৮৮] উর্বশীর কথা স্মরণ করে অধীর চিত্তে বললেন—সে হচ্ছে আভরণের আভরণ, প্রসাধনেরও প্রসাধন, তার তনু উপমান পদার্থেরও উপমান তুল্য। এদিকে উর্বশীর অবস্থাও সুবিধার নয়। তাই সখি চিত্রলেখাকে সঙ্গে নিয়ে এসে তিনি হাজির প্রতিষ্ঠান পুরে রাজা পুরূরবার প্রমোদ উদ্যানে। তিরস্করণী বিদ্যা বলে অন্যের অদৃশ্য থেকে রাজার কথোপকথন শুনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্থা উর্বশী ভূর্জপাতায় এক প্রণয় পত্র লিখে ফেলে দিলেন রাজার সামনে।

৮৬। অম্মো লদাবিড়বে এসা এ আবলী বৈজঅন্তি আ মেল গ্‌গা

বিক্রমোর্বশী ১।৮০

৮৭। পক্ষোপাতোঽপি তস্যাং সদ্রূপস্যালৌকিক এব। ২।৩১ তদেব

৮৮। আভরণস্যাভরণং প্রসাধন বিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ।
উপমানস্যাপি সখে প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ॥ ২।৩৫ তদেব

পত্র থেকে রাজা বুঝতে পারলেন উর্বশীও তাঁর প্রতি সমান প্রণয়াবিষ্ট। উর্বশীর অনুরোধে চিত্রলেখা সশরীরে আবির্ভূত হয়ে রাজার কাছে উর্বশীর প্রেম নিবেদন করলেন। রাজাও ব্যক্ত করলেন তাঁর ব্যাকুলতা। তখন চিত্রলেখার অনুরোধে উর্বশীও আবির্ভূতা হলেন তিরস্করণী পরিহার করে। পরস্পরের অভিবাদন শেষ হতে না হতেই স্বর্গ থেকে দেবদূত এসে জানাল ভরতমুনি প্রযোজিত নাটকের কথা। দেবরাজ লোকপালগণের সঙ্গে এক সাথে সেই নাটক দেখবেন। তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে উর্বশীকে। উর্বশী চিত্রলেখা ক্ষুণ্ণচিত্তে বিদায় নিলেন রাজার কাছ থেকে।

তৃতীয় অঙ্ক

ভরত শিষ্য গালব ও পেলবের সংলাপ থেকে জানা গেল যে সরস্বতী রচিত লক্ষ্মী স্বয়ম্বর নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় ছিলেন উর্বশী, মেনকা—বারুণী। অভিনয় কালে বারুণী যখন জিজ্ঞাসা করেন—সমুপস্থিত স্বয়ং কেশব ও লোকপালগণের মধ্যে কার প্রতি তোমার আকর্ষণ?" উত্তরে লক্ষ্মীরূপী আত্মবিস্মৃতা উর্বশী নির্দিষ্ট সংলাপ—পুরুষোত্তম না বলে বলেন—'পুরূরবার প্রতি'। ফলে ক্রুদ্ধ ভরতমুনি উর্বশীকে অভিশাপ দেন যে, যেহেতু সে মুনির উপদেশ ভুলেছে সুতরাং সে আর স্বর্গে বাস করতে পারবে না। উর্বশীকে লজ্জিতা দেখে দেবরাজ বললেন—তুমি যাঁর অনুরক্ত সেই পুরূরবা সকল যুদ্ধেই আমার প্রধান সহায় এবং পরম বন্ধু সুতরাং তাঁর প্রিয়কার্য আমার কর্তব্য, অতএব ইচ্ছামত পুরূরবাকে গিয়া সেবা কর। কিন্তু তিনি যখন তোমার গর্ভজাত সন্তানের মুখ দেখবেন তখন তোমাকে স্বর্গে ফিরে আসতে হবে।

এদিকে প্রতিষ্ঠানপুরে কাশিরাজ কন্যা মহারাণী ঊশীনরী কঞ্চুকীকে দিয়ে রাজাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মণিহর্ম্য প্রাসাদশিখরে অর্থাৎ ছাতে জ্যোৎস্নালোকে প্রিয়প্রসাধন ব্রতের জন্য অপেক্ষা করতে। কিন্তু মহারাণী আসার আগেই সখী চিত্রলেখা সহ আকাশযানে অভিসারিকা বেশে সজ্জিতা উর্বশী আবির্ভূতা হলেন।

কিছুক্ষণ একান্তে থেকে রাজার মনোভাব বুঝে নিয়ে তাঁরা রাজার সামনে

এসে দাঁড়ালেন। ভাগ্যিস তিরস্করণী অপসারণ করেন নাই কেননা ঠিক তখনি ব্রতোপকরণ ধারিনী সহচরীদের নিয়ে মহারাণী এসে হাজির। রাণী প্রিয়জনের প্রীতিসাধক ব্রতের উপচার করলেন। রাজাও প্রিয়বাক্যে তুষ্ট করতে চেষ্টা করলেন মহারাণীকে। রাণী চলে গেলে উর্বশী এসে পিছন থেকে রাজার চোখ টিপে ধরলেন। চিনতে ভুল হল না রাজার, বললেন—'সখা এ সেই নারায়ণের উরুসম্ভবা নয়? উর্বশী যেন স্বর্গের কথা ভেবে উৎকণ্ঠিতা না হয়। এই বলে বিদায় নিলেন চিত্রলেখা। বসন্তের পর গ্রীষ্মকালে সূর্যদেবকে সেবা করার পালা যে তার।

চতুর্থ অঙ্ক

শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্ক যেমন শ্রেষ্ঠ বিক্রমোর্বশীয়মের চতুর্থ অঙ্ক অনুরূপ শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে। "বিক্রমোর্বশীয়মের আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্বাঙ্গ সুন্দর নহে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে, উর্বশীর বিরহে একান্ত অধীর এবং বিচেতন পুরূরবা তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এ বিষয়ে যে বর্ণনা আছে, তাহা একান্ত মনোহর—এমন মনোহর যে, কোনও দেশীয় কোন কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।"[৮৯]

প্রিয় সখী চিত্রলেখা আর সহজন্যার সংলাপ থেকে জানা গেল যে, উর্বশী রাজ্যভার মুক্ত রাজাকে নিয়ে কৈলাস পর্বতের গন্ধমাদন বনে বিহার করতে গিয়েছিলেন। সেখানে মন্দাকিনী তটে ক্রীড়ারতা বিদ্যাধরকন্যা উদয়াবতীর দিকে রাজা একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন বলে অতিরিক্ত অভিমানী উর্বশী রাগ করে রাজার শত অনুরোধ উপেক্ষা করে কুমার বনে ঢুকে পড়েন। গুরুদেব ভরতের অভিশাপে দেবত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন বলে স্ত্রীসম্পর্ক বর্জিত কার্তিকেয়ের বনে যে নারীর ঢুকতে নাই তা মনে ছিল না। সেই বনে ঢোকামাত্রই উর্বশী লতায় পরিণত হয়ে গেলেন সেইখানে। তারপর সেই রাজাও কোথায় প্রিয়া,

৮৯। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড p 36 দেবকুমার বসু সম্পাদিত।

কোথায় প্রিয়া করে এখানে সেখানে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে পাগল হয়ে গেলেন। দিনরাত সেই বিজন বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন।

সখী সহজন্যার প্রশ্নের উত্তরে চিত্রলেখা জানালেন যে গৌরী-চরণ রাগ থেকে জাত সঙ্গম মণির স্পর্শছাড়া উর্বশী উদ্ধারের বা পুনর্মিলনের আর কোন পথ নাই। দুই সখী প্রস্থান করলেন সূর্য উপাসনায়। প্রবেশ করলেন বিরহোন্মত্ত রাজা। যা দেখছেন তাই উর্বশী বলে মনে করছেন, ভুল ভাঙলে মূর্ছিত হচ্ছেন। মূর্ছান্তে আবার গান গাইছেন, নাচছেন। প্রিয়া বিরহ বেদনার এই দীন আর্তির মধ্য দিয়ে পুরূরবার হৃদয়ের গভীর বেদনা অত্যন্ত সুন্দর ফুটে উঠেছে। মিলনে যে ছিল একা বিরহে তাঁকেই মনে হচ্ছে ত্রিভুবনময়।[১০] নিজের পরিচয় দিচ্ছেন 'সূর্য আর চন্দ্র যার মাতামহ, পিতামহ, উর্বশী এবং পৃথিবী যাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করেছে আমি সেই পুরূরবা।' হরিণ, কোকিল হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, হাতি, পাহাড়, নদী জনে জনে সকলের কাছে খোঁজ করছেন প্রিয়ার। কেননা এদের সকলের মধ্যেই ত রয়েছে তাঁর প্রিয়তমা নারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বা স্বভাবের অংশ—উপমান রূপে, নাকি তারাই সেই প্রিয়তমার অঙ্গের উপমেয়। এমনি করে উন্মত্ত রাজা সকলের কাছে প্রিয়তমার খোঁজ করতে করতে কুড়িয়ে পেলেন সঙ্গম মণি। দৈববাণীর নির্দেশ অনুযায়ী মণিটি গ্রহণ করে অগ্রসর হতেই সাক্ষাৎ পেলেন প্রিয়ার অনুরূপ একটি লতার। সেটিকে আলিঙ্গন করতেই পুনরায় মানবীরূপে আবির্ভূতা হলেন উর্বশী। পুনর্মিলিত তাঁরা ফিরে গেলেন রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরে।

পঞ্চম অঙ্ক ॥

বিদূষকের কথা থেকে জানা গেল যে রাজা দীর্ঘকাল নন্দনবনে বিহার করে উর্বশীকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে রাজকাজে মন দিয়েছেন। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে পটমণ্ডপে অবস্থান কালে রাজার মুকুট থেকে উজ্জ্বল মণিটি মাংসখণ্ড ভ্রমে একটি শকুন ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। নেপথ্যাগত ধ্বনি থেকে তা জানা গেল। সদলবলে রাজা প্রবেশ করে ধনুক আনতে আদেশ

১০। 'সঙ্গে সৈষা একা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।'—উদ্ভট শ্লোক

করলেন। ধনুক নিয়ে আসার আগেই স্বর্ণসূত্র বিলম্বিত মণি মুখে চক্রাকারে উড়ন্ত পাখি বনের সীমানা ছাড়িয়ে উধাও হয়ে গেল। রাজা ঘোষণা করলেন, পাখিটা খুঁজে বার করার। রাজা যখন উর্বশীর সঙ্গে পুনর্মিলন সম্পাদক মণিটির জন্য খেদ করছিলেন কঞ্চুকী তখন প্রবেশ করলেন মণিটি নিয়ে। বাণাহত পাখিটি মাটিতে পড়েছিল সেখানে পাওয়া গেছে মণি। রাজা কঞ্চুকীকে জিজ্ঞেস করলেন বাণটি কার? কঞ্চুকী ক্ষোদিত অক্ষর পড়তে পারলনা দেখে রাজা নিজেই পড়লেন—উর্বশীর গর্ভজাত ঐল পুত্র ধনুর্ধর শত্রুহন্তা আয়ুর বাণ।[১১] বিদূষক বাহবা জানালেন মহারাজের পুত্র বলে। বিস্মিত রাজা—তা কি করে সম্ভব? নিমেষের জন্যও তিনি উর্বশীকে ছেড়ে থাকেন নাই, তার গর্ভ লক্ষণও ত টের পান নাই। অবশ্য কয়েক দিনের জন্য একটু শারীরিক অবস্থান্তর দেখেছিলেন মাত্র। রাজা আর বিদূষক যখন এই সব জল্পনা করছিলেন তখন রাজাজ্ঞা নিয়ে প্রবেশ করলেন চ্যবনাশ্রমাগত সুকুমার এক তাপসী। কুমারকে দেখে রাজার অন্তরে বাৎসল্যের উদয় হল। তাপসী জানালেন যে, এই আয়ু ভূমিষ্ঠ হলে উর্বশী অজ্ঞাত কারণে তাঁর কাছে একে গচ্ছিত রেখেছিলেন। ভগবান চ্যবন তার জাতকর্মাদি শুভানুষ্ঠান সম্পাদন করেছেন, ধনুর্বিদ্যা সহ সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত করেছেন। আশ্রমবিধি ভঙ্গ করে বাণাঘাতে পাখিটাকে সংহার করেছে শুনে ভগবান চ্যবন উর্বশীর হাতে তাঁর গচ্ছিত সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ করেছেন। উর্বশী প্রবেশ করে রাজার পাশে কুমারকে দেখে বিস্মিত হলেন। বুঝলেন এ তাঁর পুত্র আয়ু, তাপসী সত্যবতীর সঙ্গে এসেছে। রাজা পরিচয় করিয়ে দিলেন ছেলেকে তার মায়ের সঙ্গে। তাপসী সত্যবতী উর্বশীকে বললেন—যেহেতু আয়ু কৃতবিদ্য এবং আয়ুধ কবচ পরিধানের উপযুক্ত অর্থাৎ যৌবনারূঢ় হয়েছে তাই স্বামীর সমক্ষে উর্বশীকে তার গচ্ছিত ধন ফিরিয়ে দিতে এসেছেন তিনি। তাপসী বিদায় নিলেন। পুত্রলাভে উল্লাস প্রকাশ করলেন রাজা। কি যেন মনে পড়ায় কাঁদতে লাগলেন উর্বশী। রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে জানালেন—

১১। উর্বশী সম্ভবস্যায়মৈল সূনোর্ধনুষ্মতঃ।
কুমারস্যায়ুষো বাণঃ সংহর্তা দ্বিষদায়ুষাম॥ বিক্রমোর্বশীয়ম॥ পঞ্চম অঙ্ক।

'গুরু ভরত স্বর্গ থেকে নির্বাসনের অভিশাপ দিলে দয়াপরবশ হয়ে মহেন্দ্র তার সীমা নির্দেশ করেছিলেন যে তাঁর বয়স্য পুরূরবা যখন উর্বশীর গর্ভে জাত তাঁর ঔরস পুত্রের মুখ দর্শন করবেন তখনই উর্বশীকে ফিরে আসতে হবে স্বর্গে।' পুরূরবার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কায় উর্বশী তাই পুত্র জাত হলে তাকে বিত্তাশিক্ষার জন্য চ্যবন আশ্রমে তাপসী সত্যবতীর হাতে গচ্ছিত রেখে-ছিলেন। উর্বশী বললেন—'এই পর্যন্ত আপনার সঙ্গে, আজ বিদায় দিন মহারাজ।' শুনে রাজা মূর্ছিত হলেন। মূর্ছান্তে উর্বশীকে অনুমতি দিলেন স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের। নিজেও ঠিক করলেন পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়ে বনে যাবেন। অভিষেকের আয়োজন হলে নারদ আবির্ভূত হয়ে জানালেন যে ইন্দ্র তাঁকে পাঠিয়েছেন রাজার বনগমন নিষেধ করতে কেননা আসন্ন দেবাসুর যুদ্ধে পুরূরবাই হবেন ইন্দ্রের প্রধান সহায। আরো জানালেন যে ইন্দ্র উর্বশীকে রাজার সহধর্মচারিণী হয়ে চিরকাল মর্তে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। কুমারের অভিষেক সম্পন্ন হল।

কালিদাসের এই নাটকের উর্বশী পুরূরবা আখ্যান তথা নাট্যরূপ পৌরাণিক অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি। নারীরূপের প্রশস্তি রচনায় তথা বিরহ বেদনার প্রকাশে বিক্রমোর্বশীয়মের তুলনা পাওয়া ভার। এর আখ্যান ভাগে উর্বশী পুরূরবা এবং তাদের পুত্র আয়ু তিনটি নাম এবং সম্পর্ক বৈদিক যুগাগত। কালিদাস তাঁর কাহিনীর রেখারূপ মাত্র পুরাণ থেকে গ্রহণ করেছেন। মৎস্য ও পদ্ম পুরাণ থেকে তাঁর কাহিনীতে উর্বশীর লতা রূপ প্রাপ্তি ও পুরূরবার উন্মত্ততা পর্যন্ত সূত্র গৃহীত হয়েছে। এবং কাহিনীর বাকিটা তাঁর অপূর্ব কাব্য ক্ষমতার সৃষ্টি। পুত্র মুখ দর্শনে দম্পতির বিচ্ছেদ সম্ভবত প্রিয়ার অন্তর্ধান ও জননীর আবির্ভাবের ইঙ্গিত বহ।

বৈদিক কাহিনীর যাজ্ঞিক প্রত্যয় এবং অতিকথার সূর্যউষা উপাখ্যানে আশ্রয় পরিত্যাগ করে এমনকি পৌরাণিক রাজবৃত্তের প্রশস্তিও পরিত্যাগ করে উর্বশীপুরূরবা উপাখ্যান বিক্রমোর্বশীয়ম নাটকে সর্বপ্রথম মানবিক কাহিনী বৃত্তে সুতরাং বিশুদ্ধ সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।

॥ সংস্কৃত কথা সাহিত্যে ॥

ষষ্ঠ শতকে গুণাঢ্য পৈশাচি প্রাকৃতে বৃহৎকথা নামে গল্পসংগ্রহ বা সংকলন করেন। এগুলি সম্ভবত দেশে প্রচলিত ছিল। একাদশ শতকে ক্ষেমেন্দ্র বা ক্ষেমঙ্কর এই কাহিনীগুলি 'বৃহৎকথামঞ্জরী' গ্রন্থে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করেন। ক্ষেমেন্দ্র, গুণাঢ্যর রচনাকেই পরিবর্ধিত করেন। বৃহৎকথা মঞ্জরীতে[১২] কাহিনী এইরকম—পুরাকালে পুরূরবা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শত্রু বিনাশকারী এবং কন্দর্প তুল্য বলে বিখ্যাত ছিলেন। স্বর্গের বারবধূ উর্বশী ছিল তাঁর প্রিয়া। সে ছিল চাঁদের থেকেও সুন্দরী, পদ্মমুখী। রাজা পুরূরবা দৈত্যযুদ্ধে ইন্দ্রের সহায় হয়েছিলেন স্বর্গে তিনি বিজয়োৎসব দেখেছিলেন। ইন্দ্রের সামনে সুরঙ্গনাদের নাচে অভিনয় ভঙ্গ দেখে উর্বশীর সাহচর্যে নৃত্য অভিনয়ে বিদগ্ধ রাজা হেসে ছিলেন। তাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার উর্বশীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে বলে শাপ দিয়েছিলেন। তারপর রাজার প্রার্থনায় শাপান্তের উপায় বলেছিলেন। উর্বশীর বিরহে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বদরী আশ্রমে প্রবেশ করে ভগবানের দর্শনে শাপান্ত হবে। বিচ্ছিন্ন হলে মদন তাপে তাপিত উর্বশীও রাজার বিরহাতুর হয়েছিলেন। উর্বশী লতা পাশ বৎ হয়েছিলেন পরে আবার স্বরূপ লাভ করেন। সেই সময় রাজা মদোন্মত্ত অবস্থায় বদরী আশ্রমে প্রবেশ করে শাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তারপর উর্বশীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখে কাল কাটিয়েছিলেন। এইভাবে দুঃখের অনল শেষে সুখসম্পদ লাভ করেছিলেন।

এখানে প্রচলিত কাহিনী সূত্র মাত্র উপস্থিত করা হয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয় না। এখানে নতুনত্ব হচ্ছে ইন্দ্রের পুরূরবাকে শাপ প্রদান এবং বদরী আশ্রমে ভগবানের দর্শনে শাপান্তের কথা। এই কাহিনীর বিস্তৃত তথা সাহিত্যের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট রূপ আছে এই বৃহৎকথা

•১২। Brihat Katha Manjari of Kshemendra Ed by M. M. Pandit Sivadatta & Kashinath Pandurang. Pandurang Publications Nirnaya Sagar Press 33/114-123

অবলম্বনে একাদশ শতকের অপর কাশ্মীরী লেখক সোমদেব ভট্ট কৃত কথা সরিৎ সাগরে।[৯৩] এ কাহিনী বেদপুরাণ বহির্ভূত কথাসাহিত্য বৃহৎ কথার আখ্যানের বিস্তৃততর রূপ। কাহিনীটি এখানে উদ্ধার করা যাক্—

পুরূরবা নামে রাজা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। পৃথিবীর মতো স্বর্গেও ছিল তাঁর অব্যাহত গতি। একদা নন্দন কাননে পরিভ্রমণকালে এক অপ্সরা তাঁকে দেখেছিল। সেই অতুলনীয়া কামমোহিনীর নাম উর্বশী। পুরূরবাকে দেখে প্রেমবেদনায় সে সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। নায়ক নায়িকার এই মূর্ছা রোগ সম্ভবত কালিদাস থেকে শুরু। যাহোক রম্ভা প্রভৃতি সখীরা তাকে চেতন করল। এদিকে পুরূরবাও তাকে লাবণ্যরসনির্ঝরিনী অর্থাৎ সুন্দরী দেখলেন এবং তাকে না পেয়ে কামনার তাড়নায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চৈতন্য সম্পাদনের জন্য কেউ সেখানে ছিলনা। ক্ষীরাম্বুস্থিত সর্বজ্ঞ হরি নারদকে আদেশ করলেন—নারদ এসেছিলেন শ্রীহরি সন্দর্শনে।—'দেবর্ষি নন্দন কাননে রাজা পুরূরবা উর্বশী কর্তৃক হৃতচিত্ত হয়ে বিরহে নিঃসহায় রয়েছে। সেখানে গিয়ে শতক্রতুকে রাজার হাতে তাড়াতাড়ি উর্বশীকে অর্পণ করতে বল।' হরি কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়ে নারদ স্বর্গে এলেন। পুরূরবাকে প্রবোধ দিয়ে দেবর্ষি বললেন—'রাজন আপনি উঠুন, আমি বিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিত, তিনি একনিষ্ঠ ভক্তদের আপদ দেখতে পারেন না।' এই বলে তিনি পুরূরবাকে আশ্বস্থ করে দেবরাজের নিকট গিয়ে প্রণত ইন্দ্রের কাছে হরির নির্দেশ নিবেদন করলেন—পুরূরবার হাতে উর্বশীকে অর্পণ করতে। তারপর পুরূরবা উর্বশীকে নিয়ে ভূলোকে এলেন। বধুকে দেখে বিস্মিত হল মর্তবাসীরা। তাঁরা সুখে কাল কাটাতে লাগলেন। একদা দানবের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে ইন্দ্র সাহায্যের জন্য পুরূরবাকে ডেকে পাঠালেন।

পুরূরবা মায়াধর নামক অসুরাধিপতিকে পরাজিত করলেন। তারপর দেবরাজভবনে স্বর্গবধুদের নৃত্যোৎসব দেখতে গেলেন। রম্ভা নাচছিলেন, আচার্যের আসনে সমাসীন ছিলেন তুম্বরু। অভিনয়ে স্খলন দেখে পুরূরবা হেসে উঠলেন। রম্ভা তাতে কুপিত হয়ে বললেন—"এ নাচ দেবতারা জানে,

৯৩। কথা সরিৎসাগর সোমদেব ভট্টকৃত পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ সম্পাদিত। নির্ণয় সাগর প্রেস। তৃতীয় তরঙ্গ।

মানুষ এর কী জানে?" পুরূরবা উত্তর দিলেন—উর্বশীর সঙ্গে বাস করে এসব আমি জেনেছি, আপনাদের গুরু তুম্বরু জানেন না।' তা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে তুম্বরু তাঁকে শাপ দিলেন—'উর্বশীর সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ হবে। কৃষ্ণের আরাধনা করলে তবে এই শাপের মোচন হবে।' উর্বশীর কাছে ফিরে এসে অকালে নিপতিত বজ্রের মতো এই অভিশাপের কথা পুরূরবা নিবেদন করলেন। অনন্তর হঠাৎ একদিন গন্ধর্বদের দ্বারা উর্বশী অপহৃতা হলেন। শাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাজা পুরূরবা হরির আরাধনার জন্য বদরিকা আশ্রমে গেলেন। উর্বশীও গন্ধর্বনগরে বিরহার্ত হয়ে মৃতের মতো, চিত্রের মতো, নিদ্রিতের মতো হতচেতন হয়েছিলেন। আশ্চর্য যে তিনি শাপান্ত কাল পর্যন্ত প্রাণহীনের মতো কাল কাটালেন, চক্রবাকী যেমন কাটায় বিরহে দীর্ঘ রাত্রি। পুরূরবাও তপস্যার দ্বারা অচ্যুতকে তুষ্ট করেন। তাঁর প্রসাদে গন্ধর্বেরা সেই উর্বশীকে মুক্ত করে। শাপান্তে পুনরায় অপ্সরার সঙ্গ লাভ করে সেই রাজা পৃথিবীতে থেকেও স্বর্গভোগ করেছিলেন।

অপৌরাণিক নিদর্শনগুলির মধ্যে কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়মে আখ্যায়িকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপ সে কথা আগেই বলেছি : সোমদেবের কথা সরিৎ সাগরেও সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎ কথা মঞ্জরীতে বিধৃত কাহিনীতে শুধু আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত বহির্বৃত্ত মাত্র পক্ষান্তরে একই কাহিনী বৃত্তের মধ্যে সোমদেব—সংলাপ, নাটকীয়তা এবং কিঞ্চিৎ চরিত্রায়নের মধ্য দিয়ে আখ্যানটি রসায়িত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

এখানে অভিশাপ মিত্রাবরুণ বা ভরত দেয়নি। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎ কথায় ইন্দ্র আর সোমদেবের কথাসরিৎ সাগবে অভিশাপ দিয়েছেন আচার্য তুম্বরু। অন্য সব কাহিনীতেই অভিশাপ দেওয়া হয়েছে উর্বশীকে কিন্তু কথা সাহিত্যে অভিশপ্ত হয়েছেন পুরূরবা স্বয়ং। বৃহৎ কথায় না থাকলেও কথাসরিতে গন্ধর্বদের দ্বারা অপহরণের কথাও আছে। সাহিত্য রচনায় ব্যক্তি অভিরুচির পার্থক্য এবং অভিনবত্ব ছাড়া আর কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। কথাসরিতে অবশ্য বিষ্ণু মাহাত্ম্য তথা বৈষ্ণব ভক্তির কথা আছে। কাহিনী আদ্যন্ত মধ্য সংযুক্ত এবং নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্ব উপস্থাপনের প্রয়াস আছে বলে এটি একটি সার্থক গল্প হয়ে উঠেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান

বাংলা সাহিত্যে উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানের যে সব উল্লেখ বা নিদর্শন পাই তা সবই হয় মহাভারতের প্রতিধ্বনি নতুবা কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের অনুসরণ। বৈদিককাহিনীর উল্লেখ একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে মূল উর্বশীর অভিশাপের কাহিনী নেই। তবে উত্তরাকাণ্ডের ইল রাজার উপাখ্যানে মূলে পুরূরবার জন্মবৃত্তান্ত আছে। কাশীদাসী মহাভারতে অর্জুন-উর্বশী আখ্যান মূলানুগ তবে মূলে উর্বশীর বেশবিন্যাসের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে কাশীদাসে তা সংক্ষিপ্ত। দরিদ্র বাঙালি গ্রাম্য কবি অত সাজসজ্জার কথা জানবেন কোথা থেকে? তিনি শুধু—পারিজাতে বান্ধে দিব্য কেশপাশ

চন্দন কস্তুরী অঙ্গে করিল লেপন।
রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ॥[১]

বলেই ছেড়ে দিয়েছেন।

মঙ্গল কাব্যগুলিতে কোথাও কোথাও উর্বশী নামটির উল্লেখ দেখা যায় মাত্র। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে বা মনসামঙ্গলে আছে,—শিবের অভিশাপে উষার মর্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণের কথা শুনে স্বর্গরাজ্যে কান্নাকাটি পড়ে যায়। 'চারিদিকে হুড়াহুড়ি কান্দে দেবগণ।' সে ক্রন্দনে অপ্সরাদের মধ্যে উর্বশীও ছিলেন— রম্ভা উর্বশী কান্দে আরো চিত্ররেখা।
না জানি কতদিন আর হয় দেখা।[২]

সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে বেহুলা-লক্ষীন্দরের বিয়েতে বেহুলার মা সুমিত্রার আজ্ঞায় রতি বাড়ি বাড়ি গেলেন এয়োদের ডাকতে। এখানে নারায়ণ দেব সেকালের বাঙালি মেয়েদের নামের তালিকা দিয়েছেন—

১। কাশীদাসী মহাভারত—সুবোধচন্দ্র মজুমদার সং বনপর্ব পৃঃ 803

২। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ—শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য সংকলিত ৪র্থ সং পৃঃ ১০৯

ভদ্রা বিনতা সঙ্গে উর্বশী চলিল রঙ্গে
মালতি চলে জগৎ মহিনি।[৩]

মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবি কঙ্কন চণ্ডীতে ষোড়শীরূপিনী দেবী চণ্ডীকে দেখে বিস্মিত ফুল্লরার প্রশ্ন,

তোর রূপ দেখি হেন মনে লখি
উর্বশী আল্য আপনি।[৪]

এখানে উর্বশী রূপসী শ্রেষ্ঠারূপে উপস্থাপিত। কালকেতু ফিরে এলেও ফুল্লরা তাকে তিরস্কার করে বলে—

পিপীড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলেও শশী।
আখেটির ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী ॥

অর্থাৎ উর্বশী নারী রূপের পরাকাষ্ঠা রূপে মধ্যযুগেও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আধুনিক যুগ—

আধুনিক বাংলা কাব্যের গোড়াতেই উর্বশীর উল্লেখ ও উবশী-পুরূরবা উপাখ্যানের সাক্ষাৎ পাই যুগন্ধর কবি মধুসূদনের কাব্যে। মধুসূদনের কাব্যের প্রধান উপাদান পুরাণ। এইসব পুরণাশ্রিত কাব্যেই এসেছে উর্বশীর কথা। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' ও 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের বিবিধ উল্লেখ ছাড়া বীরাঙ্গনার একটি সম্পূর্ণ পত্রিকা ও দুটি চতুর্দশ পদীতে উপাখ্যানের যে পরিচয় তা মূলত মহাভারত ও কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকানুযায়ী। তদনুযায়ী উর্বশী স্বর্গ বারাঙ্গনা, নৃত্যগীত পটিয়সী, মহেন্দ্রের আয়ুধ আবার নারী সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা।

৩। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ—ডঃ তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সং কবি ১৩৪২ পৃঃ ৩৪

৪। কবি কঙ্কণ চণ্ডী—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সং প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪

মহাভারতে উর্বশী এবং অন্য সব অপ্সরারাও নৃত্যকুশলা বটে কিন্তু তাদের সঙ্গীত নিপুণতার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় না। কাশীরাম দাস অবশ্য গীত কুশলতার কথাও বলেছেন—

নৃত্যগীতে সপ্রতিভা পূর্ণচন্দ্র মুখপ্রভা
অঙ্গ ঢাকা অম্লান অম্বরে।[৫]

'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গে নদীপ্রবাহে কম্পমান হেমকমল-দামের সঙ্গে মধুসূদন তুলনা করেছেন উর্বশীর নাচ। নৃত্যশ্রান্ত রূপ বর্ণনাটি সুন্দর।

নাচে সে কনকদাম মলয় হিল্লোলে
উর্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা
যবে নৃত্য পরিশ্রমে ক্লান্তা সীমন্তিনী
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন।[৬]

ইন্দ্রালয়ে দেবসভায় নৃত্যরতা অপ্সরীদের মধ্যে উর্বশীরও উল্লেখ করেছেন তিনি।[৭] মধুসূদন উর্বশীর সঙ্গীত নিপুণতার কথাও বলেছেন।—

মায়ার উর্বশী আসি স্বর্ণবীণা করে
গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে
রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে।[৮]

কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে রম্ভা পুরূরবার কাছে উর্বশীর পরিচয় দিতে বলেছেন—কারো তপস্যায় শঙ্কিত বোধ করলে মহেন্দ্র উর্বশীরূপী সুকুমার প্রহরণ পাঠিয়ে সেই তপস্বীর সর্বনাশ করেন।[৯] মধুসূদনের কাব্যেও তার প্রতিধ্বনি। তিলোত্তমা কাব্যে ইন্দ্র বলেছেন,—

৫। কাশীরাম দাসের মহাভারত—সুবোধ মজুমদার সং বন পৃঃ ৪০৬

৬। 'তিলোত্তমা সম্ভব,' তৃতীয় সর্গ ৪০ ছত্র

৭। মেঘনাদ বধ দ্বিতীয় সর্গ ২৪ ছত্র

৮। 'তিলোত্তমা সম্ভব' প্রথম সর্গ ২৬২-৬৩ চরণ।

৯। বিক্রমোর্বশীয়ম্ প্রথম অঙ্ক, 'সুউমারং পহরণং মহেন্দ্রস্স'।

যখন দুষ্ট ভাই দুইজন
আরম্ভিলা তপঃ আমি পাঠানু যতনে
সুকেশিনী উর্বশীরে, কিন্তু দৈববলে
বিফল বিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল।[১০]

অপ্সরাদের এই মোহিনীশক্তির কথা অন্যত্র বলা হয়েছে,—

কোথা সে উর্বশী, রূপে ঋষি মনোহরা;
চিত্রলেখা—জগৎ জনের চিত্তে লেখা। ইত্যাদি[১১]

জৈমিনী মহাভারতের দণ্ডীপর্বের পর মধুসূদন উর্বশীকে অপ্সরাকুলের মধ্যে সৌন্দর্য শ্রেষ্ঠা চিত্রিত করার আগ্রহই কেবল দেখান নাই উর্বশীকে যে নারীসৌন্দর্যের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয় তার সূচনা বোধহয় মধুসূদনেই।

আইলা উর্বশী দেবী ত্রিদিবের শোভা
ভব ললাটের শোভা শশিকলা যথা
আভাময়ী, কেমনে বর্ণিব রূপ তব
হে ললনে বাসবের প্রহরণ তুমি![১২]

একটি চতুর্দশপদীতে উর্বশী কামনার প্রতীক এ আভাসও আছে। যেমন—

যথায় উর্বশী
কামের আকাশে বামা চিরপূর্ণ শশী।[১৩]

এই ভাবধারাতেই পরবর্তীকালে বলাকা কাব্যের দুই নারী কবিতায় উর্বশী হয়ে উঠেছে কামনা রাজ্যের রাণী। ৬০ সংখ্যক উর্বশী শীর্ষক চতুর্দশপদীতে মহাভারতের বন পর্বের অর্জুন-উর্বশী কাহিনীর অনুসরণ দেখা যায়। এখানেও অর্জুনের কাছে স্বৈরিনী উর্বশীর নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ। বোধহয় প্রগল্‌ভতর। মধুসূদন বোধহয় মূল মহাভারত অপেক্ষা কাশীদাসী রূপের অধিক অনুগত।

১০। তিলোত্তমা সম্ভব, তৃতীয় সর্গ
১১। ঐ প্রথম ছত্র ৫৬
১২। তিলোত্তমা, দ্বিতীয় সর্গ
১৩। চতুর্দশপদী ৩২নং নন্দন কানন

'পুরূরবা' শীর্ষক চতুর্দশপদী এবং বীরাঙ্গনার 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' দুটি কবিতায় কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের অনুস্মরণে রচিত। পুরূরবা কেশী দৈত্যকে পরাজিত করে 'ভুবনলোভ', 'কামধন' উর্বশীকে লাভ করেছিলেন। পর্বত শিখরে মূর্ছিতা উর্বশীর অপরূপ রূপ খ্যাপনই এই চতুর্দশপদীর উৎকর্ষের কারণ। কালিদাস এখানে উর্বশীর রূপের যে বর্ণনা করেছেন ত্য প্রধানত পৌরাণিক রূপমুগ্ধ পুরূরবার উক্তি। এখানে মধুসূদন ও শ্রীঅরবিন্দের কবিত্ব উৎকৃষ্টতর বলা যায়। মধুসূদন চতুর্দশপদীটিতে মেঘাবৃত পূর্ণচন্দ্রের মতো মূছিতা উর্বশীর রূপ সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ উপমান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রূপে উপস্থিত করেছেন।

মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে
দেখেছ পূর্ণিমা রাত্রে শরদের শশী,
বধিয়াছ দীর্ঘ শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে ;—
সে সকলে ধিক্‌ মানী ওই যে উর্বশী
সোনার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'উর্বশী' নামক ইংরেজী কাব্যে কেশী নিগৃহীতা মূর্ছিতা উর্বশীর রূপ বর্ণনা করেছেন।

Perfect she lay amid her tresses wide
Like a mishandled Lily luminous
As she fallen. From the lucid robe.
One shoulder gleamed and golden breast
left bare
Divinely lifting, one gold arm was flung
A warm rich splendour exquisitely out lined
Against the dazzling whiteness and her face
was a fallen moon among the snows.

URVASIE by SRI AUROBINDO, Canto I lines 210-17

বীরাঙ্গনার উল্লিখিত কবিতার প্রারম্ভে ভূমিকায় মধুসূদন লিখেছেন, "চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্বশী নামক ত্রোটক পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।"

পত্রকাব্যটি বিক্রমোর্বশী নাটক অনুযায়ী হলেও পত্রের প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আছে প্রেমব্যাকুল উর্বশী অপ্সরা চিত্রলেখার সঙ্গে পুরূরবাকে দেখার জন্য এসেছেন প্রতিষ্ঠানপুরের রাজ্যোদ্যানে। রাজা সেখানে বয়স্যের কাছে উর্বশীর জন্য আকুলতা প্রকাশ করছিলেন। তখন রাজার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার জন্য তিরস্করণী বিদ্যাবলে অদৃশ্য থেকে উর্বশী ভূর্জপাতায় প্রেমপত্র লিখে রাজার সামনে ফেলে দিলেন। তাতে লেখা ছিল,—

> সামিঅ সংভাবিতআ জহ অহং তুএ অমুনিআ
> তহ অ অনুরত্তস্‌স সুহঅ এঅমেঅ তুহ।
> ণবরি ন মে ললিঅ পারিআ অসঅ নিজ্জস্মি
> হোন্তি সুহা ণন্দণবণবাআ বি সিহিব্ব সরীরে॥

হে স্বামিন্‌ তুমিও যেমন ভাবছ আমার মনের কথা বুঝতে পাবনি আমিও তাই ভাবছি। তুমিও যেমন অনুরক্ত হে সুভগ আমিও তেমনি তোমার, তাই পারিজাত কুসুমের শয্যা এবং নন্দন কাননের সুরভি মধুর বাতাস যে আমার নিকট জ্বলন্ত শিখার মতো ছিল তা আজ শরীরে সুখদায়ক হবে।

এ চিঠিতে পুরূরবার প্রেম সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ উর্বশীচিত্তের আশ্বস্ততার আনন্দ ব্যক্ত। কিন্তু মধুসূদনের পত্রটি যেমন ভিন্ন অবকাশে রচিত তেমনি প্রেমের অনিবার্য সংশয়ে আকুল। মধুসূদনের উর্বশী ভরত মুনির শাপে স্বর্গচ্যুত হয়ে মন্দাকিনী কূলে বসে এই চিঠি লিখছেন। স্মরণ করেছেন তাদের প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি। কালিদাসের নাটকে ভরতের দুই শিষ্য গালব ও পেলবের সংলাপে ব্যক্ত হয়েছে 'লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর' নাট্যাভিনয় ও ভরতমুনির

অভিশাপের কথা আর মধুসূদনের কাব্যে উর্বশী নিজেই সে কাহিনী জানিয়েছেন চিঠিতে।

এই পরিস্থিতি রচনায় মধুসূদনের অভিনবত্বের পরিচয়। বস্তুত মধুসূদনের কাব্যটিতে আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গীর ফলে উর্বশী চরিত্র অধিকতর জীবন্ত ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। অসংকোচ প্রগল্‌ভতায় যেমন আত্ম প্রেম নিবেদন করেছেন তেমনি যাজ্ঞা করেছেন পুরূরবার ভালোবাসা। চেয়েছেন আশ্রয় —উর্বীধামে উর্বশীরে দেহ স্থান এবে,। উর্বীশ।

সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে জানতে চেয়েছেন পুরূরবা তাঁকে সত্যি ভালোবাসেন কিনা? 'ঘৃণা যদি কর দেব কহ শীঘ্র শুনি'—কেননা অমরা অপ্সরা বলে প্রাণ বিসর্জন না দিতে পারলেও উর্বশী বলেন—

ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনী বেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর।

পূর্বরাগানুরঞ্জিত, সংশয়ান্দোলিত প্রেমিকাচিত্তের এই রোমান্টিক রূপটি সুন্দর ফুটে উঠেছে মধুসূদনের কাব্যে।

আর যদি পুরূরবা প্রতি-ভালোবাসা জানান তাহলে, উর্বশী বলেন,

যাব উড়ি ও পদ আশ্রয়ে
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে। কি ছাড় স্বর্গ তোমার বিহনে?

উর্বশী চরিত্রের এই বাস্তবতা ও ব্যক্তিত্ব প্রশংসনীয় হলেও উপসংহারে তাঁর অপ্সরা সুলভ নির্লজ্জতা কাব্য মাধুর্য কিঞ্চিৎ ম্লান করেছে বলেই মনে হয়।

কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ, সর্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির যৌবন সুধা—অর্পিব তা পদে।

এ মানসিকতা পৌরাণিক পর্যায়ের।

।। দণ্ডী উপাখ্যান ।।

জৈমিনী ভারতের দণ্ডীপর্বে জৈমিনী বিরচিত বলে পরিচিত মহাভারতের দণ্ডী পর্বের মূল সংস্কৃতের কোন ছাপা বই দেখি নাই। সংস্কৃত হাতে লেখা পুথিও সংগ্রহ করতে পারি নাই বলে অনুবাদ অবলম্বনেই আলোচনা করতে হল। এতে উর্বশী সম্পর্কে এক স্বতন্ত্র উপাখ্যান আছে। সেখানে অবশ্য পুরূরবার কোন ভূমিকা বা উল্লেখ নাই। উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়[১৪] এর পদ্যানুবাদ ও শ্রীরোহিনীনন্দন[১৫] সরকার করেন গদ্যানুবাদ। তদনুযায়ী এই আখ্যায়িকা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। এই কাহিনী নিয়ে উনিশ শতকের অষ্টম নবম দশকে বেশ কয়েকটি নাটক লেখা হয়। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ 'উর্বশীর অভিশাপ[১৬] নামে ও শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর 'যাদব কলঙ্ক[১৭] নামে পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। ডঃ সুকুমার সেন দ্বিজতনয়া কামিনী সুন্দরী দেবী এই কাহিনা নিয়ে 'উর্বশী' নামে একটি নাটক রচনা করেছেন বলে তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন।[১৮] স্বয়ং গিরিশ চন্দ্র ঘোষ লিখেছেন 'পাণ্ডব গৌরব'।

১৪। বৃহৎ কূর্মপুরাণান্তর্গত দণ্ডীপর্ব নামক গ্রন্থ: উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীক্ষেত্রমোহন ধরের বেঙ্গলি প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত ১২৭৯

১৫। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত দণ্ডী পর্ব। বাঙ্গালা গদ্য শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার সঙ্কলিত। শ্যাম পুকুর ২নং অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে চৌধুরী কোং কর্তৃক প্রকাশিত। ১২৯২ সাল॥ অনুরূপ আর একখানি গদ্যানুবাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত। ১৮২২ শকাব্দ

১৬। দণ্ডি চরিত বা উর্বশীর অভিশাপ। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক দৃশ্য কাব্য। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত॥ ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। সন ১২৯৩

১৭। যাদব কলঙ্ক/পৌরাণিক নাটক॥ শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর প্রণীত ও ২।১নং রাম বাগান ব্রাঞ্চ লেন হইতে শ্রীগোকুলচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। February 1897

১৮। "বাঙ্গালায় মহিলারচিত প্রথম নাটক হইতেছে 'দ্বিজতনয়ার' 'উর্বশী' নাটক (১৮৬৬) লেখিকার নাম কামিনী সুন্দরী দেবী। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৬২ সং। পৃঃ ৮৩। জাতীয় গ্রন্থাগারে এই কাব রচিত একটি কাব্য গ্রন্থ

কাহিনীটি উমাকান্ত ও রোহিনীনন্দনের রচনা অনুযায়ী বর্ণনা করা হল। যা কালীপ্রসন্নবিদ্যারত্ন অনূদিত আখ্যানের অনুরূপ।

কঠোর তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় ক্লিষ্ট দুর্বাসা মুনির ইন্দ্রিয়গণ মুনির কাছে বিনোদন প্রার্থনা করে। দুর্বাসা ইন্দ্রিয়দের বিনোদনের জন্য ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করে হাজির হলেন স্বর্গপুরে ইন্দ্র সভায়। ইন্দ্রকে তিনি বললেন যে, "পার্থিব সকল বিষয় ভোগ করেছেন এক্ষণে স্বর্গীয় কৌতুকাদি বিষয় ভোগ হইলেই ইন্দ্রিয়গণের চরম তৃপ্তি লাভ হয়।"[১৯] ইন্দ্র, অপ্সরাগণের মধ্যে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ, গীতবাদ্য জানে ভালো পরমরূপসা উর্বশীকে ডেকে পাঠালেন।

ইন্দ্রের আজ্ঞাশুনে উর্বশী ভাবলেন—

পশুর সদৃশ রূপ দেখি যে ইহারে।
আমারে বলেন ইন্দ্র নৃত্য করিবারে॥
এই মত মনে মনে করেন উর্বশী।
তাহার মনের কথা জানিলেন ঋষি॥[২০]

উর্বশীর মনোভাব যোগবলে জেনে ক্রুদ্ধ দুর্বাসা উর্বশীকে অভিশাপ দিলেন—

যেমন আমারে কৈলে পশু হেন জ্ঞান।
পশু যোনি হয়ে মর্ত্যে করহ পয়ান॥
তুরঙ্গিনী হও গিয়া নির্জন কাননে।

অভিশাপ শুনে উর্বশী মুনির চরণ ধরি করুণ বচনে বিস্তর স্তব করলে তুষ্ট

দেখেছি তার আখ্যাপত্র এরূপ—উর্বশী নাটক প্রভৃতির গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী কর্তৃক বিরচিত। প্রকাশক জি, সি, বসু এণ্ড কোং জানিয়েছেন স্বামীহীনা দুঃখিনী কবি 'কলিকাতার পশ্চিমপার পোলের কিঞ্চিৎ উত্তরে গ্রন্থকর্ত্রীর বাটী'। প্রকাশক।"

১৯। রোহিনী নন্দন সরকার পৃঃ ৮৯

২০। পদ্যাংশগুলি সবই উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কৃত পদ্যানুবাদ থেকে আর উদ্ধৃত গদ্যাংশগুলি রোহিনী নন্দন সরকারের গদ্যানুবাদ থেকে।

মুনিবর অভিশাপ কথঞ্চিৎ সংশোধন করলেন এবং খণ্ডনের উপায়ও বলে দিলেন।

দিবাতে থাকিবা তুমি অশ্বরূপ ধরি।
রজনীতে হবে নারী পরম সুন্দরী॥
অষ্ট বজ্র একত্র হইবে যে সময়।
মুক্ত হবে সেই কালে জানিহ নিশ্চয়॥

উর্বশীকে অশ্বিনী হয়ে নেমে আসতে হল মর্তে। পৃথিবীতে অবন্তী নগরী। সেখানকার রাজা দণ্ডী। উর্বশী অশ্বিনী রূপে রাজা দণ্ডীর বিহার বনে বসবাস করতে লাগলেন। স্বর্গ থেকে রোজ অপ্সরীরা যাওয়া আসা করত সাহচর্য দিতে কিন্তু আপন শাপমোচনের উপায় চিন্তায় সর্বদা উর্বশী বিষণ্ণা থাকতেন। মৃগয়া করতে এসে রাজা দণ্ডী দেখা পেলেন সেই অপূর্ব ঘোটকীর। রাজাজ্ঞায় অরণ্য বেষ্টিত হল কিন্তু রাজার পাশ দিয়ে বেষ্টনী ছিন্ন করে ঘোটকী পালাল দূর বনে। রাজা তাকে অনুসরণ করলেন। এদিকে দিনমণি অস্তগত হলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো আব রূপ পরিবর্তন হল ঘোটকীব। অপ্সরী হলেন উর্বশী। সে অপরূপ রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা দণ্ডী তাঁকে কামনা করলেন—'আইস আমার সমভিব্যাহারে আইস আমি তোমায় রত্ন সিংহাসন ও রত্নগৃহ প্রদান করিব।' রাজার কাতরোক্তিতে অবশেষে সম্মত হয়ে উর্বশী এক সর্ত করলেন—"আমাকে কখনো ত্যাগ করিবে না বল।" ভোরবেলা উর্বশী আবার অশ্বিনী হলে রাজা তার পিঠে চড়ে রাজপুরীতে ফিরলেন।

উর্বশীর মোহে বশীভূত হয়ে রাজকার্য পরিহার করে রাজা দিনরাত সেই ঘোটকীর পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকতেন। এদিকে দেবরাজের মন উর্বশীর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। 'পৃথিবীতে বাস করিয়া উর্বশী সর্বথা নিষ্কলুষ ও পুনরায় স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। অধুনা তাহাকে স্বর্গে আনাই যুক্তি যুক্ত।' এই বিবেচনা করে তিনি দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করলেন। ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝে উর্বশী উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নারদ দ্বারকা যাত্রা করলেন। নারদ দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট অপূর্ব ঘোটকীর বিবরণ দিলেন এবং জানালেন যে সেই অশ্বিনী অবন্তীরাজ দণ্ডীর কাছে আছে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব নামক এক বিশ্বস্ত দূতকে

পাঠালেন অবন্তীরাজের কাছে সেই মায়া ঘোটকী অর্পণের আদেশসহ। রাজা দণ্ডী প্রথমে ঘোটকীর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও নারদের বিবরণের কথা শুনে এমনকি সর্বনাশের আশঙ্কা জেনেও 'ঘোটকী প্রত্যর্পণে' অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। সংবাদ শুনে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দূত পাঠালেন ঘোটকীর জন্য। রাজমহিষী দণ্ডীকে বোঝালেন ঘোটকী অর্পণ করে নারায়ণের সঙ্গে সন্ধি করতে। কিন্তু রাজা অবিচল।

সকল ত্যজিনু আমি যত অধিকার।
তথাচ না দিব অশ্ব প্রতিজ্ঞা আমার॥

দণ্ডী নিজের সামর্থ্য স্বল্প বুঝে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে অশ্বীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে কাউকে কিছু না জানিয়ে একাকী পলায়ন করলেন। দণ্ডী প্রথমে গেলেন সমুদ্রের কাছে তারপর শিশুপালের কাছে। শিশুপাল প্রত্যাখ্যান করলে গেলেন হিমালয়ের কাছে। হিমালয় তাঁকে উপদেশ দিলেন প্রভুপদে শরণ নিতে। জরাসন্ধও আশ্রয় দিতে অস্বীকার করলেন। দেশে দেশে আশ্রয়ের আশায় ঘুরে বেড়ালেন দণ্ডী কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পেয়ে দণ্ডী এলেন হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের কাছে; দুর্যোধনও সাহস করলেন না দণ্ডীকে আশ্রয় দিতে। হতাশ্বাস দণ্ডী কোথাও আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে সঙ্কল্প করলেন— 'জাহ্নবী জীবনে গিয়া ত্যজিব জীবন।' যথাবিধি গঙ্গার পূজা করে দণ্ডী অশ্বিনীসহ গঙ্গায় নামলেন, নগরের লোক ভিড় করল গঙ্গার পাড়ে সে দৃশ্য দেখতে। সেই সময় গঙ্গাস্নানে এসেছেন অর্জুন জায়া সুভদ্রাও। দণ্ডী রাজার কাহিনী শুনে তাকে আশ্রয় দিতে রাজি হলেন তিনি। সুভদ্রা অর্জুনের শরণ নিলে অর্জুন অস্বীকার করলেন দায়িত্ব নিতে। তখন ভাসুর ভীমের সাহায্য চাইলেন সুভদ্রা। ভীম রাজি হলেন, কারণ—

নীতিশাস্ত্রে ধর্মমতে এই কয়।
প্রাণ দিয়া রাখিবে শরণ যেই লয়॥

ভীমের আশ্বাসে সুভদ্রা দণ্ডীকে আশ্রয় দিলেন।

অর্জুন অনুরোধ করলেন দণ্ডীকে পরিত্যাগ করতে কিন্তু সে অনুরোধ

ভীম প্রত্যাখ্যান করলেন। যুধিষ্ঠির বোঝাতে লাগলেন কিন্তু ভীম অটল অচল। তাঁর এক কথা—

ছাড়িতে দণ্ডীরে না পারিব কদাচিৎ।

এদিকে গোবিন্দের দূত সর্বত্র দণ্ডীকে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির। যুধিষ্ঠির দূতকে ভীমের আশ্রয়দানের কথা জানালেন। দূতের মুখে এই সংবাদ শুনে কৃষ্ণ নিজের ছেলে প্রদ্যুম্নকে হস্তিনায় পাঠালেন।

যুধিষ্ঠির প্রদ্যুম্নকে বললেন যে তিনি নিজেই কৃষ্ণের কাছে যেতে চেয়ে ছিলেন। কৃষ্ণকে তিনি জানাতে চান যে, "আমরা জানিয়াও শত অপরাধ করিলে পাণ্ডবৈক পরায়ণ মহামতি বাসুদেব অবশ্যই ক্ষমা করিবেন ইত্যাদি নানাপ্রকার পর্যালোচনা করিয়া দণ্ডীকে আমরা আশ্রয়দান করিয়াছি।" কৃষ্ণপুত্র —"যদি দণ্ডীকে আশ্রয় দিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে···পূর্বেই একবার পিতৃদেবকে বিদিত করা···কর্তব্য ছিল।" ইত্যাদি বলে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলে প্রদ্যুম্ন প্রস্থান করেন।

এদিকে বাসুদেব পুত্রকে দৌত্যে পাঠিয়েই যুদ্ধ সজ্জায় প্রস্তুত হলেন। যাদববীরদের সুসজ্জিত করে দেবতাদের কাছে দূত পাঠালেন। ব্রহ্মা, মহাদেব ও ইন্দ্র স্বগণে পরিবৃত হয়ে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হলেন। বরুণ, কুবের, ধর্মরাজ যম, জ্বর ও মহাজ্বর দুই প্রধান সেনাপতিসহ উপস্থিত হলেন। এলেন বাসুকি, বিভীষণ, হনুমান। সসৈন্যে কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন হস্তিনায়।

এদিকে পাণ্ডবেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। নকুলকে পাঠান হল দুর্যোধনের কাছে। শকুনি পাণ্ডব ধ্বংসের জন্য কৃষ্ণের পক্ষে যোগ দিতে বললেও বিদুরের পরামর্শে ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষার জন্য ভীষ্ম দ্রোণ সহ দুর্যোধন সসৈন্যে রওনা হলেন যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে। কুন্তী এলেন কৃষ্ণের কাছে। তিনি তাঁকে প্রবোধ দিয়ে জানালেন—'পাণ্ডবের মান বৃদ্ধি করিতে আমার প্রয়াস।'

বিদুরের দৌত্য ব্যর্থ হল। অতএব যুদ্ধ আরম্ভ হল। শিবের সঙ্গে ভীষ্মের, ভীমের সঙ্গে বলরামের, কন্দর্পের সঙ্গে কর্ণের, অর্জুনের সঙ্গে কার্তিকের, ইন্দ্রের সঙ্গে দুর্যোধনের এবং বাসুদেবের সঙ্গে দ্রোণের প্রবল যুদ্ধ চলল। দেবগণ মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। পদ্মার কাছে যুদ্ধের খবর

পেয়ে শিবের যুদ্ধ দেখতে কৌতূহলী হলেন দেবী দুর্গা। পদ্মা তাঁকে সাজিয়ে দিলেন।

পরাজিত হয়ে পিতামহ, মহাদেব প্রমুখ প্রধান দেবতারা পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য যাঁর যাঁর বিশেষ অস্ত্র বা বজ্র ধারণ করলেন। "তাহাতে শূল, শক্তি, চক্র, পাশ, অক্ষ, দণ্ড ও অশনি এই সপ্তবজ্র সমবেত হইল।" তখন দেবীও বাসুদেবের অভিপ্রায় সিদ্ধি ও উর্বশীর শাপ মোচনের মানসে যেমন পাণ্ডব বিনাশের জন্য আপন খড়্গ তুললেন তৎক্ষণাৎ অষ্টবজ্র দর্শনে উর্বশীর শাপমোচন হল।

উর্বশী চরিত্র চিত্রণে জৈমিনী রচিত বলে কথিত দণ্ডী পর্বের রোহিনীনন্দন সরকার ও কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের গদ্যানুবাদ সদৃশ কিন্তু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যানুবাদে খানিক স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। গদ্যানুবাদগুলিতে উর্বশীকে বিশ্ব সৌন্দর্যের সার রূপে উপস্থিত করা হয়েছে—যা এর আগের কোন লেখায় দেখা যায় না। পদ্যানুবাদটিতে উর্বশী হৃদয়ের যে প্রেম কাতরতা প্রদর্শিত তা ঋগ্বেদে এবং কালিদাসের নাটকে দেখা যায়।

গদ্যানুবাদে উর্বশীর রূপ বর্ণনায় যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণের সীমা অতিক্রম করে আধুনিক কালের রোমান্টিক নারী সৌন্দর্যের প্রশস্তির কেন্দ্রে পৌঁচেছে।

"এই উর্বশী অপ্সরাগণের প্রধান, গায়িকাগণের প্রধান, নর্ত্তকীগণের প্রধান, রমণীগণের প্রধান, অধিক কি বিধাতার রমণী সৃষ্টির প্রধান। তাহার রূপের তুলনা নাই, সৌন্দর্যের সীমা নাই, লাবণ্যের উপমা নাই ও কান্তির সাদৃশ্য নাই, তাহার, মুখে পদ্ম গন্ধ, দৃষ্টিতে পদ্ম বিকাশ, শরীরে পদ্ম সৌকুমার্য ও বাক্যে পদ্মমাধুর্য। অথবা তাহার বদনে চন্দ্রপ্রকাশ, শরীরে চন্দ্রকান্তি, দৃষ্টিতে চন্দ্র বিকাশ ও বাক্যে চন্দ্রমাধুর্য। এইরূপে তিনি যেন পদ্ম ও চন্দ্রের উপাদানে নির্মিত হইয়াছেন। বিধাতা যেন তাঁহাকেই প্রথমে নারী সৃষ্টির আদর্শ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। তুলনীয়—সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতু—মেঘদূত, কালিদাস তিনি লাবণ্যের আদি উৎস এবং সৌন্দর্যের প্রথম সৃষ্টি। এই কারণে তিনি সৃষ্টির এক অপূর্ব সামগ্রী।"[২১]

২১। দণ্ডিপর্ব। বাঙ্গালা গদ্য। শ্রীরোহিনী নন্দ সরকার। পৃঃ ৮৯-৯০

এই গ্রন্থেও উর্বশীকে স্বর্বেশ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি উর্বশীতে আদর্শ নারী সৌন্দর্যের প্রতিমা রচনার উৎসাহও শ্লাঘ্য। বর্ণনার এখানেই শেষ নয়, আরো আছে। সন্ধ্যা ঘনালে এই ঘোর অরণ্যে উর্বশী সেই ঘোটকী মূর্তি পরিহার করিয়া দিব্য রমণী মূর্তি ধারণ করলে তার সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হয়েছে।

"বোধ হইল যেন অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে পৌর্ণমাসী বিচিত্র কৌমুদী লীলার আবির্ভাব হইল অথবা যেন মহাপাপে মহাপুণ্য উদয় হইল। তাহার ঐ দিব্য রমণীয় মূর্তির তুলনা নাই, উপমা নাই এবং সাদৃশ্য নাই। উহা বিধাতার রচনা নহে। সুতরাং সংসারে উহার দ্বিতীয় থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? রাজন্। তুমি পদ্ম, কুমুদ ও শশাঙ্কাদির বিচিত্রতা দেখিয়াছ। আকাশে পৌর্ণমাসী নিশীথিনীতে অপূর্বভাব বৈচিত্র্যও দেখিয়াছ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ বৈচিত্র্য ও তোমার নয়ন গোচর হইয়াছে। অথবা, তুমি বসন্তকালীন বিচিত্রতা দর্শন করিয়াছ। উর্বশীর সেই রমণীয় মূর্তিতে ঐ সকল বিচিত্রতা একাধারে বিরাজ করিতেছে।

এই কারণে উহা সর্বজন শোভন ও সর্বজন সমাদরণীয়। রাজন্ ঐ মূর্তিতে অমৃতের অংশ আছে। পারিজাত মঞ্জরীর অপূর্ব মাধুর্য এবং কুবের সরসীর সার সর্বস্ব কনকপদ্মের সৌকুমার্য আছে। সেই জন্য সংসারে উহার তুলনা নাই। ঐ শান্তিময়ী দিব্যমূর্তি দর্শন করিলে কাম প্রবৃত্তির ক্ষয় এবং রতিভাবের ক্ষয় হইয়া থাকে। তৎকালে যে ভক্তিবিশেষের ও ভাববিশেষের আবির্ভাব হয় তাহাই এ বিষয়ে প্রমাণ। বাস্তবিক, বিধাতার সৃষ্টিতে কোন রচনা দর্শন করিয়া যাহার অন্তরে ভক্তিরসের সঞ্চার না হয় সেই যথার্থ পশু। প্রকৃত প্রেম রসিকগণ সর্বদাই ভক্তিযোগ ভোগ ও তজ্জন্য বিনির্মল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন। তাহা ঐ আনন্দেরই তুলনা। উহা হৃদয়ের পদ গ্রহণ করিবা মাত্র ভক্তের সমস্ত তাপ, সন্তাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ তৎক্ষণে ভাস্কর তাড়িত অন্ধকারবৎ পলায়ন করে। আমার হৃদয়ে অথবা লোকমাত্রেরই অন্তরে যেন জন্ম জন্ম ঐ প্রকার আনন্দযোগ সমুদ্ভূত হয়। ইহাই মাদৃশ জনের ঐকান্তিক প্রার্থনা।"

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে, বেদে পুরাণে রমণীরূপের যত বর্ণনা আছে তার

সার নির্যাস, তার প্রতীক রূপে এখানে উর্বশীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এমন কি রমণীরূপের আনন্দ প্রত্যয়কে ব্রহ্মানন্দের সদৃশরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। যে আনন্দ প্রত্যয় মানব মনকে কামবোধের সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণ করে বিশুদ্ধ আনন্দে। গ্যেটে এই রমণীর কথাই বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও। সুতরাং এই উপলব্ধি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক প্রত্যয়ের সংযোগ সূত্র বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ চিত্রার 'বিজয়িনী'তে এই বিশ্ব বন্দিতা রমণী সৌন্দর্যেরই প্রশস্তি রচনা করেছেন।

উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দণ্ডীপর্বের পদ্যানুবাদে উর্বশীর মধ্যে প্রেমিকা স্বরূপ ফোটানোর প্রয়াস। শাপান্তে উর্বশী রাজা দণ্ডীকে আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনার কথা বলে প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। প্রেমের বিচিত্র পরিণতির একই পরিণাম—বিচ্ছেদ ও দুঃখ

পুরুষ বিচ্ছেদ করে কখন বা নারী।
এরা যদি নাহি করে তবে দেব অরি॥
কোন মতে পীরিতি সুস্থ নাহি রয়।
যেন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত নাহি রয়॥

নরনারী বা বিধাতা 'যে-ই এই বিচ্ছেদের জন্য দায়ী হোক প্রেমের এই দুঃখান্তক পরিণতি জেনেও মন নিবারিত হয় না।

জানিয়ে বিচ্ছেদ হবে কেহ কারো নয়।
তবু মনে চিরস্থায়ী আপ্ত জ্ঞান হয়॥
দহিবে জীবন দিব্য চক্ষে দেখা যায়।
তবু মন পোড়ে যেন পতঙ্গের প্রায়॥

উর্বশীর এই আত্মগ্লানিতে 'বেশ্যার কপট' অন্তরে বিরক্ত তবু বাক্য সুধাময় ইত্যাদি আত্মধিক্কার জ্ঞাপন করে। পুরূরবাকে ছেড়ে যাবার সময় ঋগ্বেদের উর্বশীও আত্মধিক্কার জ্ঞাপন করেছিল—নবৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সালাবৃকাণাং হৃদয়াণ্যেতা—স্ত্রীলোকের সখ্য স্থায়ী হয় না, তাদের হৃদয় নেকড়ের মতো। কিন্তু এ হচ্ছে প্রণয়িনীর বিচ্ছেদ বেদনাকাতর খেদোক্তি। দণ্ডীপর্বের উর্বশী

হৃদয়হীনা অপ্সরা মাত্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে ছেড়ে যাবার সময় কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন। এখানে উর্বশী কাতর দণ্ডীকে আগেই এই পরিণামের কথা জানিয়েছিলেন বলে কিঞ্চিত সান্ত্বনাও জানান—

মোর সঙ্গ করি কষ্ট পাইলে অশেষ।
মোর সঙ্গে পিরীতি করিবে যেই জন।
শেষে এইরূপ রাজা হয় সেই জন।

দণ্ডীর প্রতি সহানুভূতিতে উর্বশী খানিকটা বাস্তব ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হলেও 'বলিতে বলিতে কান্দে কপটে উর্বশী।' ছত্রটিতে অপ্সরা সুলভ কাপট্যে সে স্বরূপের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে।

উর্বশী ও দণ্ডী উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির মধ্যে গিবিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরব' সর্বোত্তম। প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ বিরচিত 'দণ্ডিচবিত বা উর্বশীর অভিশাপ' বা বঙ্কুবিহারী ধর রচিত 'যাদব কলঙ্ক' নাটকীয়তা বর্জিত পৌরাণিক আখ্যায়িকার নাট্যরূপ মাত্র বলা চলে।• দ্বন্দ্ব সংঘাতহীন, চরিত্রায়নের প্রয়াস বিহীন অকিঞ্চিৎকর রচনা। বঙ্কুবিহারী ধরের রচনায় অজস্র বর্ণাশুদ্ধি অবশ্য উৎসর্গ পত্রে তিনি স্বীকার করেছেন 'করিয়াছি ছেলেখেলা'। তবে প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের থেকে তাঁর নাট্যরূপ সামান্য উন্নত। বঙ্কুবাবু নাটক আরম্ভ কবেছেন রাজা দণ্ডীর মৃগয়া দিয়ে। 'বনমধ্যে অপরূপ ঘোটকী সন্ধ্যায় (!) রমণীবেশ ধারণ' করল। প্রেমাতুর রাজার কাছে সেই রমণী উর্বশী তাঁর অভিশাপ বৃত্তান্ত জানায়। তিন বছর পরে লেখা গিরিশচন্দ্রের নাটকের আরম্ভ ও অনুরূপ। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ আবম্ভ করেছেন ইন্দ্রসভায় দুর্বাশার সামনে নৃত্যগীত দিয়ে। প্রাণকৃষ্ণ বাবু সম্ভবত নাট্যকাহিনী বাস্তব ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য দুটি মুসলমাম শ্রমিকের সংলাপ যোগ করেছেন। অযথা একজন ধীবরের প্রবেশ ও প্রস্থান। একজন গণকেরও আমদানী করেছেন প্রাণকৃষ্ণবাবু। বঙ্কুবাবুর নাটকে করুণ গানের মধ্য দিয়ে দণ্ডীমহিষী দৃষ্টিগোচর হয়েছেন। তিনি উর্বশী চরিত্রে খানিকটা প্রাণ ও ব্যক্তিত্বের সঞ্চার করতে তাঁকে প্রেম পিয়াসীরূপে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। খাঁটি প্রেমের অন্বেষণে কাতর, প্রেমই তাঁর সকল দুঃখের কারণ।

প্রেমের লাগিয়ে ভ্রমিতেছি ধরা মাঝে।
প্রেমের লাগিয়ে করিয়াছি শাপ উপার্জন।
প্রেম, প্রেম এ জগতের নহে। প্রেম ভিখারিনী মনমত (।)
প্রেম তোর হোল না ধরায়

প্রাণকৃষ্ণ তাঁর নাটকে একটু ফিচলেমি ঢুকিয়েছেন। শেষ দৃশ্যে মদন ফুল শর সন্ধান করলে শাপমুক্ত উর্বশীর রূপে ব্রহ্মা, মহাদেব, ভীষ্ম সকলেই তাকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। দুটিই তুচ্ছ রচনা অতএব অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

এই পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে মোটামুটি চলনসই নাটক লিখেছেন গিরিশচন্দ্র। নাটকটির নাম পাণ্ডবগৌরব, ১৯০০সালে প্রকাশিত। এখানেও গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকের সূত্র অনুযায়ী ভক্তি ফোটাবার জন্য কাহিনীর কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছেন। রাজা দণ্ডীর কৃষ্ণ ভক্ত বৃদ্ধ কঞ্চুকীর মধ্য দিয়ে অহেতুকী ভক্তিবাদের প্রচারক টাইপ চরিত্রের আমদানী করেছেন। ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানীর মধ্য দিয়ে খানিকটা লঘুরস ও বাস্তবতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকে কঞ্চুকী রাজা দণ্ডীকে উর্বশীর প্রভাব মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। তবে নাটকটি মাটি করেছে দণ্ডীর ভূমিকা। কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের মধ্যে বিরোধের কারণ অশ্বিনী সহ রাজা দণ্ডীকে আশ্রয় দান। কৃষ্ণের অনুরোধ সত্ত্বেও আশ্রিত রক্ষণের মহাব্রতে দণ্ডী বা অশ্বিনী প্রত্যার্পণে যুধিষ্ঠির অস্বীকার করেন। অপর নাটক দুটিতেই একা ভীম আশ্রিত রক্ষণে বদ্ধপরিকর। অপর পাণ্ডবেরা ভীমকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটকে সকল পাণ্ডবই আশ্রিত রক্ষণে একমত। কৃষ্ণের দূত সাত্যকিকে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই বলে দিয়েছেন :—

কিন্তু নারি আশ্রিত ত্যজিতে
তাহে যদি বাধে রণ
স্মরি শ্রীমধুসূদন
পঞ্চজন পশিব সমরে।[22]

২২। পাণ্ডব গৌরব ॥ গিরিশ রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড॥ সাক্ষরতা প্রকাশন

অন্য ভাইয়েরাও সমর্থন করলেন যুধিষ্ঠিরকে। কিন্তু এই রাজা দণ্ডীই যুদ্ধভয়ে পালাতে চাইলে উর্বশী অসম্মত হওয়ায়, সে অর্জুনের প্রতি আসক্ত মনে করে দণ্ডী দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বলে,

অর্জুনের আগে বধ প্রাণ
তবে জ্বালা হইবে নির্বাণ
নিল কাড়ি অশ্বিনী আমার, বুঝ আচরণ
অশ্বিনীর আশে মোরে দিয়েছে আশ্রয়। অতি দুরাশয়।
আমি দিব অশ্বিনী তোমায়।[২৩]

তবে এই প্রেমজ ঈর্ষার মধ্য দিয়ে দণ্ডী চরিত্রে খানিকটা বাস্তবতা এসেছে। কৃষ্ণের কাছ থেকে দণ্ডী আবার ফিরে এসেছেন সুভদ্রার অন্তঃপুরে। সুভদ্রার কাছে তাঁর হৃদয়ের জ্বালা প্রকাশ করেছেন।

হিতাহিত নাহিক বিচার
মরিমাতা পিশাচীর প্রেমের তৃষ্ণায়।[২৪]

সুভদ্রা তাঁকে বোঝালেন যে, উর্বশী ইন্দ্র সোহাগিনী স্বর্গের কুসুম পৃথিবীতে ফোটেনা, তাঁকে প্রেমে বাঁধা যায় না। তবু দণ্ডী অশান্ত প্রেমে আকুল।

উর্বশী চরিত্রে কিছুটা সংহতি এবং খানিকটা ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ লক্ষ্য হয়। প্রথম থেকেই তিনি স্বর্গ বিধুরা, শাপমোচনে আগ্রহী, কৃষ্ণভক্ত, প্রেমমুগ্ধ রাজা দণ্ডীকে বারে বারে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন, বুঝিয়েছেন তাঁকে নিয়ে—

নাহি হবে অন্তর শীতল
মানা করি ফিরে যাও ঘরে।

খিন্ন কণ্ঠে তাঁর স্বরূপ এবং পরাধীন অপ্সরী জীবনের গ্লানি ব্যাখ্যা করেছেন।

শুনেছ অপ্সরী নারী,
কিন্তু নাহি নারীর হৃদয়।

২৩। তদেব ৪ অঙ্ক ৪ গর্ভাঙ্ক পৃঃ ২৮৬

২৪। তদেব ৫ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য পৃঃ ২৯৪

অপরূপ বিধির সৃজন
রূপে ভুবন মোহিনী বিলাসিনী।[২৫]

যে স্বর্গ বাসে এসেছে তাকেই দিতে হয়েছে 'প্রেমহীন দেহের সঙ্গম।'

যে অর্জুন তাঁকে পায়ে ঠেলেছে তাঁরই প্রেয়সীর গৃহে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে। স্বর্গ বিধুরা উর্বশী মৃত্তিকার গৃহে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়।

শুধু মনে পড়ে স্বর্গের কথা—

হেরি উজ্জ্বল তারকা মালা
ভুবন মোহিনী বেশে ভ্রমিতাম যথা
হেরি ছায়াপথ।

দণ্ডী উপাখ্যান নিয়ে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরবেই' পুরূরবার নাম উল্লেখ আছে। তা মহাভারতেরই প্রতিধ্বনি। সুভদ্রা চিন্তিতা উর্বশীকে আশ্বাস দিয়েছেন।—

তুমি মম কুলের জননী
চন্দ্র বংশধর পুরূরবা বিমোহিনী।

এবং গিরিশচন্দ্রের উর্বশীই একমাত্র তাঁর পৌরাণিক উদ্ভব কাহিনী স্মরণ করেছেন—

শুনি হৃষিকেশ
তব ঊরুদেশে জন্ম দুঃখিনীর।

কিন্তু পৌরাণিক দণ্ডী উপাখ্যান নিয়ে রচিত কোন নাটকে উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানের উপর কোন নতুন আলোক সম্পাত করতে পারে নাই। বরং তার পৌরাণিক আখ্যায়িকা রূপের মধ্যেই উর্বশীকে যে নারীরূপের পরাকাষ্ঠা, বিশ্বসৌন্দর্যের কেন্দ্রবর্তিনীরূপে উপস্থাপনের পরবর্তী প্রয়াস তার এক পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ দেখা যায়।

তবে উর্বশী দিনে ঘোড়া এবং রাতে স্বরূপ লাভ—এর পিছনে বৈদিক প্রভাব অনুমান করা যায়। বৈদিক সাহিত্যে অশ্ব সূর্য বা সূর্যরশ্মির প্রতীক।

২৫। তদেব পৃঃ ২৯৫

বৃহদারণ্য উপনিষদে উষাকে অশ্ব মুণ্ড বলা হয়েছে। ভোর বেলা উষা সূর্য কর স্পর্শে বিলুপ্ত হয়, আকাশ পূর্ণ হয় আলোকে। আবার সন্ধ্যায় আলোকের অন্তর্ধানে উষার পুনরাবির্ভাব। উষাই যেহেতু উর্বশী তাই বোধহয় উর্বশীর অশ্বরূপ প্রাপ্তির কাহিনী গড়ে ওঠে।

॥ উর্বশী—একটি যাত্রা পালা ॥

যদিও অনেক পরবর্তীকালে লেখা তবু কেদারনাথ মালাকার বিরচিত 'উর্বশী'* নামক যাত্রা পালাটির আলোচনা এখানেই সেরে নেওয়া যায়। রচনাটি নাটক হিসেবে মূল্যহীন। যাত্রার সূত্র অনুযায়ী সঙ্গীত বাহুল্য (৪১টি গান), নীতি প্রচার—মাঝে মাঝেই জ্ঞান, ভক্তি, কর্মফল, লোভ, লালসা মানুষ বেশে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে অহেতুক উপদেশ দিয়েছে। স্বর্গ মর্ত একাকার, অলৌকিকতার ছড়াছড়ি, মৃতের পুনর্জীবন লাভ ইত্যাদি ইত্যাদি। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর কাহিনীর আদলের সঙ্গে দৈত্যরাজ কেশীর মর্তে স্বর্গ স্থাপনের সমান্তরাল কাহিনীর গোঁজামিল। প্রথমেই নারায়ণ ঋষির উরু থেকে উর্বশী অপ্সরার সৃষ্টি এবং ইন্দ্রকে দান।

দৈত্যরাজ কেশীধ্বজ স্বর্গের উর্বশীর কথা শুনে তাকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কুবের ভবন থেকে প্রত্যাবর্তন কালে কেশীধ্বজ তাকে হরণ করে এবং পুরূরবা এসে উদ্ধার করেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। নাট্যাভিনয় দেখাবার জন্য পুরূরবাকে স্বর্গে নিয়ে আসে অপ্সরীরা। লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর নাটকে উর্বশী পুরুষোত্তমের জায়গায় পুরূরবা বলায় ভরত মুনি অভিশাপ দেন—'মর্তলোকে কর গিয়া বাস।' উর্বশীর কাতর অনুনয়ে ভরত মুনি বলেন—

> "এই বর দিনু তোরে নারি।
> পুত্রমুখ করিলে দর্শন মুক্তি হবে তোর
> স্বর্গবাসে পুনঃ পাবি অধিকার। (২৮)

---

*উর্বশী—কেদারনাথ মালাকার বিরচিত, কানাইলাল শীল কর্তৃক ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত—১৩৩৮

উর্বশী যখণ দ্বিধাগ্রস্ত তখন পুরূরবা এসে আহ্বান জানালেন। উর্বশী স্বর্গে, মরণ বিহীন, অনন্তযৌবনা, ভোগের সামগ্রী হয়ে থাকা অপেক্ষা মর্তে মানব-জীবনে প্রণয়ের স্বাদ, সন্তান লাভ শ্লাঘ্য বিবেচনা করে পুরূরবার সঙ্গে যাত্রা করলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতার প্রভাব। রাজধানীতে ফিরে পুরূরবা উর্বশী প্রেমে উন্মত্ত হয়ে রাজকার্য ছেড়ে প্রমোদবনে আশ্রয় নিলেন। উর্বশীর একটি পুত্র হল, পুরূরবার প্রেমে অতৃপ্ত উর্বশী পুত্রকে পুলস্ত্য আশ্রমে রেখে এলেন। পুলস্ত্য কন্যা সুলক্ষণা শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। উর্বশীকে খোঁজ করতে পুরূরবা এলে সুলক্ষণা তাঁর প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হয়। পুত্রের জন্য ফিরে এসে উর্বশী দুজনকে আলাপ করতে দেখে পলায়ন করে ঈর্ষায়।

এদিকে কেশীধ্বজের সৈন্যদের অত্যাচারে গ্রাম জনপদ ছারখার। ঋষিদের প্রতি অত্যাচার আর সুন্দরী মেয়েদের ধরে তার মর্তের স্বর্গে অপ্সরী করা ছিল তাদের প্রধান কাজ। সুলক্ষণা উর্বশীর পুত্র আয়ুকে নিয়ে চলেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। কেশীর সৈন্যরা সব জলাশয়ে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। তৃষ্ণার্ত আয়ু সেই জলপানে মারা যায়। কৃষ্ণ এসে তাঁকে বাঁচিয়ে দেন। পালাতে পালাতে উর্বশী শুক্রাচার্যের আশ্রমে ঢুকে পড়ে। ইন্দ্রপ্রেরিত মনে করে শুক্রাচার্য তাকে শাপ দেন। উর্বশী লতা হয়ে যায়। উর্বশী বুঝতে পারলেন প্রেমে নয় তিনি মোহগ্রস্ত। সন্তান বিসর্জনের অপরাধে চিত্ত জর্জরিত হল তাঁর। দৈত্যরাজের সৈন্যহস্তে বন্দী আয়ু আর সুলক্ষণাকে দৈত্যরাজপুত্র শম্বর আর রাজকন্যা অপর্ণা বেশ পরিবর্তন করে মুক্ত করে দেয়। কেশীর আদেশেই ব্রাহ্মণবেশী রাজকুমারকে হত্যা করা হয়। রাজকন্যা অপর্ণার লাঞ্ছনা দেখে চৈতন্যোদয় হয় কেশীর।

শোকসন্তপ্ত কেশীর তপস্যাতুষ্ট মহাদেব তাঁকে সমন্তক মণি দিলেন যার দ্বারা "একটি মাত্র প্রার্থনা হইবে পূরণ।" যখন রাজদম্পতি তাদের পুত্রকে বাঁচাতে উদ্যত তখন লতাবেষ্টিত উর্বশীর প্রবেশ। উর্বশীর আকুল মিনতিতে রাজদম্পতি মৃত পুত্রের পুনরুজ্জীবনের বদলে উর্বশী উদ্ধার করলেন। তারপর যাত্রায় যা হয় সর্বশুভান্তক সকলের পুনর্মিলনের অন্তিমদৃশ্য। নাটক যাই

হোক প্রেম ও সন্তানের প্রশ্ন অস্পষ্ট হলেও আভাসিত এবং উর্বশী নিজেকে নিসর্গ সুন্দরী বলে পরিচয় দিয়েছেন।

॥ রবীন্দ্রসাহিত্যে উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যান ॥

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে নানা স্থানে উর্বশীর উল্লেখ আছে। এইসব উল্লেখই প্রধানত মহাভারত ও কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকানুযায়ী। মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ বেদ-ব্রাহ্মণের উর্বশী পুরূরবা বৃত্ত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রসাহিত্যে উর্বশী সম্পর্কে যে সব উল্লেখ আছে তার মধ্যে প্রথম পর্যায় হচ্ছে অর্জুনের উর্বশী প্রত্যাখ্যান। মহাভারতের বনপর্বে আছে অর্জুন অস্ত্রের জন্য স্বর্গে এলে ইন্দ্র তাঁর পরিতৃপ্তির জন্য উর্বশীকে পাঠিয়েছিলেন। রাতের বেলা উর্বশী এসে অর্জুনের কাছে প্রেম নিবেদন করলেন কিন্তু অর্জুন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন—"হে কল্যাণি আপনা হইতেই পৌরব বংশের উদ্ভব, অতএব আপনি আমার পরমগুরু…আপনি আমার মাতৃবৎ পূজনীয় ও আমি আপনার পুত্রবৎ রক্ষণীয়, অতএব এক্ষণে আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন।[২৬] এই কাহিনীর উল্লেখ আছে চিত্রার 'উর্বশী' কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (বার-এট-ল)-কে লেখা চিঠিতে।[২৭] দ্বিতীয় উল্লেখ আছে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'নাটক' কবিতায়। এখানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় বিধৃত মর্ত্যপ্রীতির প্রিয়তত্ত্ব তুলেছেন :

অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে
ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দন বনে।
উর্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে
তাঁকে বরণ করবেন বলে।

২৬। মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত। সাক্ষরতা প্রকাশনী সং ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯

২৭। ৬ই চৈত্র ১৩০২ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৯

অর্জুন বললেন, দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী
অতি সম্পূর্ণ তোমার মহিমা
অনিন্দিত তোমার মাধুরী
প্রণতি করি তোমাকে।
তোমার মালা দেবতার সেবার জন্যে

উর্বশী বললেন, কোন অভাব নেই দেবলোকের
নেই তার পিপাসা।
সে জানেই না চাইতে
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর।
তার মধ্যে মন্দ নেই
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে।

পুনশ্চে কবি মহাভারতের কাহিনী সূত্র গ্রহণ করলেও তাকে ব্যবহার করেছেন আলাদা ভাবে। রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁর মর্ত্যপ্রীতি,—মর্ত্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেছেন। এখানে অর্জুন পারিবারিক সম্পর্কের দোহাই না দিয়ে উর্বশীকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন—'তোমার মালা দেবতার সেবার জন্য। এখানে উর্বশী, প্রত্যাখ্যানের বেদনায় অর্জুনকে অভিশাপ দেননি ক্লীবত্বের। জানিয়েছেন তার মর্ত্যকামনা, চেয়েছেন দেবলোকের দুর্লভ প্রেম।

আমার মালার মূল্য নেই তার গলায়
মর্ত্যকে প্রয়োজন আমার,
আমাকে প্রয়োজন মর্ত্যের।
তাই এসেছি তোমার কাছে
তোমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কর আমাকে বরণ
দেবলোকে দুর্লভ সেই আকাঙ্ক্ষা
মর্ত্যের সেই অমৃত—অশ্রুর ধারা। (—পুনশ্চ)

এই ভাবধারার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই চিত্রার 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায়ও। স্বর্গ অভাবহীন পূর্ণতা, তাই সেখানে কোন আকাঙ্ক্ষা নেই,

নেই কোন কামনা, সেখানে নাই প্রেম বেদনা। যদি থাকত সেই আকুলতা তা হলে তালভঙ্গ হত নৃত্যপরা মেনকার। বেদনার সুর বাজত উর্বশীর বীণায়।

মাঝে মাঝে সুর পুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনক নূপুরে
তালভঙ্গ হত। হেলি উর্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝঙ্কারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্ছনা।

এখানে ইন্দ্রের আজ্ঞাধীন স্বর্বেশ্যা অপ্সরী উর্বশী মানবী হয়ে উঠেছেন মানবিক প্রেমাকাঙ্ক্ষার স্পর্শে।

রবীন্দ্র কাব্যে উর্বশীকে সমুদ্র মন্থন থেকে উত্থিত বলে চিত্রিত করা হয়েছে। এই কল্পনার পিছনে বোধ হয় রামায়ণের সমুদ্র মন্থনের কাহিনী আছে। "আয়ুর্বেদ ময় ধন্বন্তরি দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে সমুদ্র মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর শোভনকান্তি অপ্সরা সকল উত্থিত হইল। মন্থন-নিবন্ধন (অপ) ক্ষীররূপ নীরের সারভূত রস হইতে উত্থিত হইল বলিয়া তদবধি উহাদের নাম অপ্সরা হইল।......অপ্সরা সকল সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলে কি দেবতা কি দানব কেহই উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, সুতরাং তদবধি উহারা সাধারণ স্ত্রী বলিয়াই পরিগণিত হইল।"[২৮] সম্ভবত এই ধারণার সঙ্গে গ্রীক পুরাণের 'আফ্রোদিতি' বা রোমক পুরাণের ভেনাসের আবির্ভাব এবং তাদের প্রস্তর মূর্তির প্রভাব সক্রিয় ছিল।

বলাকার দুইনারী কবিতায় আছে—

কোন ক্ষণে সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি
একজনা উর্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনা রাজ্যে রানী
স্বর্গের অপ্সরী

২৮। বাল্মীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড ৪৫ম সর্গ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত, ভারবি সং

আবার চিত্রার সুবিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতায় এই চিত্র আরো সুন্দর আরো স্পষ্ট।

আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিল মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধা পাত্র বিষ ভাণ্ড লয়ে বাম করে
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।

উর্বশী স্বর্গের ইন্দ্র সভার নিপুণা নর্তকী। মহাভারতে পুরাণে প্রধানত উর্বশীর নৃত্য কুশলতার কথাই আছে। দণ্ডী উপাখ্যানে এবং মধুসূদনের কাব্যে তাঁর গীত কুশলতার[২৯] কথাও আছে। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বীণাবাদন কুশলতার[৩০] কথাও বলেছেন। এর সঙ্গে এই ধারণাও বিজড়িত যে স্বর্গের দেবসভার প্রমোদানুষ্ঠানে ক্রুটির জন্য উর্বশী এবং অন্য অপ্সরীদেরও শাস্তি পেতে হয়। এই ধারণা সম্ভবত কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের অভিশাপ কাহিনী থেকে এসেছে। সেখানে আছে দেবরাজ সভার নাট্য-অনুষ্ঠানে প্রমাদের জন্য উর্বশীকে নির্বাসন দণ্ড পেতে হয়। এই কাহিনীর উৎস বোধহয় মৎস পুরাণ। কালিদাস সেখান থেকে নিয়েছেন। অথবা অপর কোন কিম্বদন্তী মূলক উপাখ্যান থেকে উভয় গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে।

উর্বশীর নাচের কথা আছে পুনশ্চের 'শাপমোচন' কবিতায়—

সৌরসেনের মন ছিল উদাসী
অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে
উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা
ইন্দ্রানীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।[৩১]

২৯। মায়ার উর্বশী আসি স্বর্ণ বীণা করে। গায়ুক মধুর গীত—তিলোত্তমাসম্ভব ১ম সর্গ।

৩০। স্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা—রবীন্দ্র রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড

৩১। শাপমোচন—পুনশ্চ

চিত্রার 'উর্বশী' কবিতায়—

সুর সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,

অথবা—

সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে / যদি ক্ষণকালতরে
ক্লান্ত উর্বশীর / তালভঙ্গ হয় / দেবরাজ করে না মার্জনা
পূর্বার্জিত কীর্তি তার / অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত

রবীন্দ্র কল্পনার বিশেষত্ব হচ্ছে এই পৌরাণিক উর্বশীকে প্রতীক করে তোলায়। রবীন্দ্রনাথের হাতে উর্বশী যেমন মানবী মহিমা লাভ করেছে তেমনি নারী সৌন্দর্যের আদর্শ প্রতিমারূপে অতীন্দ্রিয় ভাব সৌন্দর্যের (abstract beauty) প্রতীক হয়ে উঠেছে, আবার আর একদিকে হয়ে উঠেছে—'বিশ্বের কামনা রাজ্যের রানী'—চিরন্তন নর্মসখী-প্রেয়সী। উদ্ধৃত বলাকার 'দুই নারী' কবিতায় নারীর এই কামনা সঙ্গী প্রিয়ারূপের প্রশস্তি—

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি—
দুহাতে ছড়ায়ে তারে বসন্তের পুষ্পিতপ্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

নারী তার রূপ যৌবনের ছলা-কলা, নৃত্য-গীতের মদির মোহে মুগ্ধকরে পুরুষ চিত্তকে নিয়ে যায় ভোগবাসনার উত্তপ্ত কামনা লোকে। উর্বশীকে কবি সেই ভোগ সহচরী প্রিয়ারূপে উপস্থিত করেছেন এই কবিতায়। তার পাশাপাশি রেখেছেন নারীর লক্ষ্মীরূপা কল্যাণীরূপ। উর্বশী তার থেকে স্বতন্ত্র। মধুসূদনের একটি চতুর্দশপদীতেও এই আভাস আছে। সেখানে তিনি উর্বশীকে বলেছেন—'কামের আকাশে বামা চিরপূর্ণশশী।'

তবে রবীন্দ্র কাব্যে উর্বশীরই অধিকার পুরূরবা উপেক্ষিত। একমাত্র চিত্রার 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাতে তাঁকে পাওয়া যায়।

পুরূরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে গীত স্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে।

এখানে কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীকে হারিয়ে বনে, পাহাড়ে, নদী তীরে উন্মাদের মতো পুরূরবার অন্বেষণের কথাই স্মরণ করা হয়েছে।

উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যান নিয়ে যেসব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতা তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তবে এতে পুরূরবার কোন উল্লেখ নাই। এখানে উর্বশীকে নারী সৌন্দর্যের প্রতীক প্রতিমা করে তোলা হয়েছে। তথাপি এই কবিতায় উর্বশীকে 'নন্দন বাসিনী', 'উঠেছিলে মন্থিত সাগরে', 'মুনিজন ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,' 'সুর সভাতলে যবে নৃত্য কর' 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী' ইত্যাদি বলার মধ্য দিয়ে উর্বশীর পৌরাণিক ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে মূর্তিটির ব্যঞ্জনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এমন কি তার উষা রূপের আভাসও রয়েছে। দুটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে উর্বশীর পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক পরিচয় তুলে ধরেছেন।

'অর্জুন তাহার সহিত পূর্বপুরুষগত সম্পর্ক পাতাইতে গিয়াছিল সেটা অর্জুনের ভ্রম[৩২]—তাহার সহিত কাহারো কোন বন্ধন নাই।[৩৩] পুরূরবা প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন।

'মানুষের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ অ্যাবস্ট্রাক্ট নয় বাস্তব। যথা পুরূরবার সঙ্গে তার সম্বন্ধ।'[৩৪]

৩২। মহা, বনপর্ব, ৪৬ অধ্যায়

৩৩। চিত্রার 'উর্বশী' কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (বার-অ্যাট-ল)-কে লেখা চিঠি। ৬ই চৈত্র ১৩০২। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৯

৩৪। চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩। রবিরশ্মি

রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞ সমালোচক বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে প্রেম ও সৌন্দর্যানুরাগ আদর্শ কল্পনা অনুরঞ্জিত হইযা সঞ্চিত হইতে ছিল, তাহাই মন্ময়তামুক্ত হইয়া স্বর্গের অপ্সরী উর্বশীর পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয়ে এক সার্বভৌম রূপ-চেতনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রকল্পনার সমস্ত উপাদান—তাঁহার বিশ্বচেতনা, অসীমানুভব, রূপমুগ্ধতা ও প্রণয়াবেশ—সবই আছে। কিন্তু কবির মনোলোক হইতে দূরবর্তিনী, সত্তাবৈশিষ্ট্য সম্পন্না এক স্বর্গ-নারীকে অবলম্বন করিয়া ইহার এক অভিনব মূর্তিতে সংহত হইয়াছে। উর্বশীর জীবন ইতিহাস ও উহার বন্ধনহীন সৌন্দর্য বিলাস বিভিন্ন পুবাণ ও কালিদাসের নাটক 'বিক্রমোর্বশী' হইতে আমাদের নিকট সুপরিচিত। সে সমস্ত কল্যাণ-বোধও নীতি-আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন, মোহময় রূপ চমকের মূর্ত বিগ্রহ।[৩৫]

'রবীন্দ্রনাথের উর্বশী-কল্পনা এই সর্ববন্ধনহীন, সর্বকামনা-মুক্ত, সমস্ত কর্তব্য অসহিষ্ণু উদাসীন সৌন্দর্যের অপরূপ বিস্ময়রস পুষ্ট। তাহার উর্বশীর কোন লৌকিক কর্ম-অভ্যাস নাই, কোন নবোদ্ভিন্ন প্রণয়-সৌকুমার্য নাই, কোন অর্ধবিকশিত সৌন্দর্যের প্রত্যাশাচকিত, স্বপ্ন মধুর সম্ভাবনা নাই। সাধারণতঃ রূপমুগ্ধ মানুষ সৌন্দর্যকে যে কর্তব্য ও অধিকার বোধে সুরক্ষিত, দান প্রতিদানে পরস্পর নির্ভর, গার্হস্থ্য আবেষ্টনে দেখিতে অভ্যস্ত, উর্বশী সম্পূর্ণরূপে, সেই চিহ্নিত সীমার বহির্ভূত। এমন কি এই চির যৌবনা রূপসীর নিজ জীবনও ক্রম বিকাশের ছন্দাতীত। তাহার বাল্য ও কৈশোর কবি কল্পনার কৌতূহল উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু কোন তথ্য বন্ধনে ধরা দেয় না। এই উর্বশী মানব দৃষ্টিতে রূপের একটি চির প্রজ্বলন্ত বহ্নি প্রহেলিকা'[৩৬]

রবীন্দ্রনাথের উর্বশী অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ বিদেহী সৌন্দর্যের প্রতীক নয়। শেলীর Hymn to Intellectual Beauty কবিতার সংস্কার বশত কেউ কেউ উর্বশী কবিতার ভাববস্তুর তদনুকূল বিচার করতে চেয়েছেন। শেলীর

৩৫। রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোং ২য় সং, ১৩৭৮ পৃঃ ১০৬-১০৭

৩৬। তদেব পৃঃ ১০৭-৮

কবিতায় অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ আদর্শের বিদেহীরূপের সঙ্গে প্রেম-চেতনা মিশে অখণ্ড ঐক্য লাভ করেছে এক সর্বসঞ্চারী বিশুদ্ধ নন্দন চেতনায়। রবীন্দ্র কাব্যের উর্বশী কিন্তু তেমন কোন অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবমাত্র নয়। যে নারীরূপ সকল যুগে সকল কালে মানুষের প্রেমবাসনাকে আকর্ষণ করে সেই চিরন্তনী নারীর দেহী বাস্তবরূপই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উর্বশীব মধ্যে।' বলাকার 'দুই নারী' কবিতার উর্বশী স্বরূপের মধ্যে এর কথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

"পৌরাণিক উর্বশীর নাম অবলম্বনে আমি যাহাকে কমপ্লিমেণ্ট দিয়াছি তাহাকে অনেকদিন হইতে অনেক কবি কমপ্লিমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন। গ্যেটে যাহাকে বলেন The Eternal Women—Ewige Weibliche, আমি তাহাকে উর্বশীর মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি। সে আমাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, বধূ নহে, মাতা নহে, কন্যা নহে, সে রমণী—সে আমাদের হৃদয় হরণ করে, সে দিব্যরূপে আমাদের স্বর্গে বিরাজ করে, সে আমাদের ভুলায়, সে আমাদের পৌত্রদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিবে —অর্জুন তাহার সহিত পূর্বপুরুষ গত সম্পর্ক পাতাইতে গিয়াছিলেন সেটা অর্জুনের ভ্রম—তাহার সহিত কাহারও কোনো বন্ধন নাই, যে আদিম রহস্য সমুদ্র হইতে দেবতারা সংসারের সমস্ত সুধা ও বিষ উন্মথিত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন,সেই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন অতল হইতে এই চির যৌবনা অপ্সরী উঠিয়া আজ পর্যন্ত মুনিদের ধ্যানভঙ্গ, কবিদের কবিত্ব উদ্রেক এবং দেবতাদের চিত্ত বিনোদন করিয়া আসিতেছে। সে নৃত্য করে, গান করে আনন্দ দান করে, এবং আমাদের বাসনার চরমতীর্থ স্বর্গলোকে বাস করে।

"আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিয়া দেখিলে এক ভাগে The beautiful, এক ভাগে The good পড়ে। উর্বশী কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে।"[৩৭]

৩৭। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (বার-অ্যাট-ল)-কে লিখিত পত্র, ৬ই চৈত্র ১৩০২ প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪৯। রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড ৪২৯ পৃঃ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন—[৩৮]

"এক হিসেবে সৌন্দর্য মাত্রই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ উর্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য —সেইজন্য কোন কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল অ্যাবস্ট্রাক্ট সৌন্দর্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য সেই জন্যে তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলি যাকে ইনটেলেকচুয়াল বিউটি বলেছেন, উর্বশীর সঙ্গে তাকেই অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে তবে সেজন্যে আমি দায়ী নই। গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণা করেছি সে ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়, চাঁদও নয়, গানের সুরও নয়—সে নিছক নারী—মাতা কন্যা বা গৃহিনী সে নয়—সে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত মোহিনী, সেই।

মনে রাখতে হবে উর্বশী কে? সে ইন্দ্রের ইন্দ্রানী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃত পান সভার সখী।

দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। হোকনা সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এইরূপ সৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানব রূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্বশীতে সেই দেহ সৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েছে। সে যেন চির যৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত, তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।…

…সৌন্দর্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তবুও তা অনির্বচনীয়। উর্বশীতে সেই অনির্বচনীয়তা দেহ ধারণ করেছে, সুতরাং তা অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়, মানুষ সত্যযুগ এবং স্বর্গ কল্পনা করেছে। প্রতিদিনের সংসারে অসমাপ্তভাবে খণ্ডভাবে যে পূর্ণতার সে আভাস পায়, সে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবে কেবলমাত্র ধ্যানেই আছে, কোনোখানেই তা বিষয়ীকৃত

৩৮। রবিরশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড বিশ্বভারতী ১৯৫৭ পৃঃ ৫৫৯-৫৫৫

হয়নি, একথা মানতে তার ভালো লাগে না। তাই তার পুরাণে স্বর্গলোকের অবতারণা। যা আমাদের ভাবে রয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট, স্বর্গে তাই পেয়েছে রূপ।...নারী রূপের যে অনিন্দনীয় পূর্ণতা আমাদের মন খোঁজে তা অবাস্তব নয়, স্বর্গে তার প্রকাশ উর্বশী-মেনকা-তিলোত্তমায়। সেই বিগ্রহিণী নারী মূর্তির বিস্ময় ও আনন্দ উর্বশী কবিতায় বলা হয়েছে।...আজ তার ভাঙাচোরা পরিচয় ছড়িয়ে আছে অনেক মোহিনীর মধ্যে, কিন্তু সেই পূর্ণতার প্রতিমা কোথায় গেল।"[৩৯]

প্রকৃতি তার শত সহস্র সৌন্দর্যের উপচারে মানব হৃদয়ে যে আনন্দের সৃষ্টি করে সেই অনির্বচনীয় আনন্দের প্রত্যয়েই উপলব্ধি জাগে সুন্দরের। যৌবন কামনা হৃদয়ের অন্তস্থলে আবাল্য সঞ্চিত সেই সমস্ত সুন্দরের উপাদান নিয়ে রচনা করে প্রিয়া প্রতিমূর্তি—যে তার হৃদয়ের আনন্দ, যা তার সৃজন-শক্তি, শিল্পশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে। বিশ্বজগতের পিছনে যে সদসৎ নিরপেক্ষ সৃষ্টিশক্তি মানুষের মধ্যে তাই আনন্দরূপা কাম। যাকে নারী উদ্দীপ্ত করে তার রূপের মধ্য দিয়ে। এই অব্যক্ত শক্তি নারীরূপের অনির্বচনীয়তা দিয়ে পুরুষচিত্ত সৃষ্টির আনন্দে পূর্ণ করে। তারই দেহী পূর্ণ প্রতীক রবীন্দ্রনাথের উর্বশী।

॥ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান ॥

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানের সামগ্রিক রূপের পরিচয় ক্রমশঃ উপেক্ষিত হয়েছে। এ কালে উর্বশীর উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। উর্বশী এখানে প্রতীক রূপে বা নারীরূপের পরাকাষ্ঠার নিদর্শনরূপে উপস্থাপনের ঝোঁকই বেশি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে উর্বশী এসেছে কখনো সৌন্দর্যের সার রূপে, কখনো বা উদ্বেল যৌবন কামনার প্রতিমা রূপে—পুরুষচিত্তের সৌন্দর্য কামনার চিরন্তন নারীরূপে। নারী সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতার উপমান হিসেবে মৌখিক বাচনেও সর্বত্র লঘুগুরু উভয় ভাবেই নিত্য ব্যবহৃত। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি পঙ্কের

৩৯। রবিরশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যতম বিষ্ণু দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামকরণই করেছেন 'উর্বশী ও আর্টেমিস'। আর্তেমিস গ্রীক দেবী। অ্যাপোলোর যমজ বোন। ইনি চির কুমারী, বলবতী যুবতীর আদর্শ। ইনি চন্দ্রমা, শিকারীদের ইষ্ট দেবী, দাম্পত্য সম্পর্কের দেবী, প্রসূতির রক্ষয়িত্রী। গ্রীক শিল্প ও সাহিত্যে সতীত্বের মহিমা ও কামনা মুক্ত সংযত জীবনাদর্শের ধারক। আর উর্বশী বোধহয় রবীন্দ্র কাব্যের ভাষায় 'বিশ্বের কামনা রাজ্যে রানী' সৌন্দর্য রূপিনী। বিষ্ণু দে ক্ষণিকের মর অলকায় ইন্দ্রিয়ের হর্ষে গঠিত ভুবনে তার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আমি নহি পুরূরবা। হে উর্বশী
ক্ষণিকের মর অলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে জানো গড়ে তুলি আমার ভুবন
এসো তুমি সে-ভুবনে কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে।
ক্ষণিক সেখানে থাকো
তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণ বীথি
ঘুরি যে সময় নেই—শুধু তুমি থাক ক্ষণকাল
ক্ষণিকের আনন্দ আলোয়
অন্ধকার আকাশ সভায়
নগ্নতায় দীপ্ত তনু জ্বালিয়ে—জ্বালিয়ে যাও
নৃত্যময় দীপ্ত দেয়ালিতে

—বিষ্ণু দে

রঙিন ইন্দ্রধনুর মতো ক্ষণিক ইন্দ্রিয় হর্ষের রোমাঞ্চই পার্থিব প্রেম তাই এই মর পৃথিবীর কবি পুরূরবার মতো আমরণ আসঙ্গ লোলুপ নন। কবি তাঁর মর্ম বীথিতে ব্যাকুল আহ্বান জানিয়েছেন উর্বশীকে।

আর রাত্রি রবে কি উর্বশী,
আকাশের নক্ষত্র আভায় রজনীর শব্দহীনতায়
রাহুগ্রস্ত হয়ে রবে বাহু বন্ধে পৃথিবীর নারী
পরশ কম্পিত দেহ সলজ্জ উৎসুক?

আমি নহি পুরূরবা, হে উর্বশী
আমরণ আসঙ্গ লোলুপ
আমি জানি আকাশ পৃথিবী
আমি জানি ইন্দ্র ধনু প্রেম আমাদের ॥

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর প্রথম কবিতায় তরুণ কবি তাঁর প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন—

দেখি মুহূর্ত-বিম্বে চিরন্তনেরই ছবি
উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে ॥ (পলায়ন)

একজন সমালোচক এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'এতে উর্বশীর লাস্য ও উমার স্থৈর্যকে কবি বিচ্ছিন্ন করলেন না। দেহ আর মনের প্রয়োজনকে ভিন্ন ভিন্ন করে পুরুষের কল্পনায় মেয়েদের দুই জাতি, (উর্বশী ও উমা) দু'জাতি চিন্তার কল্পনাই যেন কবি মানতে পারছেন না। তরুণ কবি মন লাস্য আর স্থৈর্যের সংহতিতে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সমগ্রতা দিতে চায়, যা রোমান্টিক আবেগে উর্বশী আর উমার মধ্যে দোলাচলে আগ্রহী নয়। —আরম্ভ ও তারপরে ॥ অশোক সেন, পরিচয় বৈশাখ, ১৩৮৬ পৃঃ ৪৮

কবি তার তাঁর ক্ষণ উপলব্ধিতে অনুভব করেছেন যৌবন কামনার আসঙ্গ উল্লাস আবার প্রেমের চিরন্তন সৌন্দর্যে উত্তরণের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র 'দুই নারী' কবিতায় নারী স্বরূপের যে দ্বিরূপ তুলে ধরেছেন এ কবিতায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় :

'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্য গ্রন্থের নাম কবিতায় শুধু উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানের প্রাকৃতিক তাৎপর্য ব্যঞ্জিত। এ কবিতায় উর্বশী এবং আর্টেমিস উভয়েই অখণ্ড সৌন্দর্যের, নারী রূপের আদর্শ মহিমা রূপে অঙ্কিত—যা আজ মানুষের অপ্রাপনীয় হলেও—

প্রিয়ার শরীর/পুরুষের মনে আজো বোনে নিদ্রাহীন ইন্দ্রজাল। শীর্ষ নামের পরেই ইংরেজি উদ্ধৃতি—Glory and lovliness have passed away—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

ফিরিবেনা ফিরিবেনা অস্ত গেছে সে গৌরবশশী
অস্তাচল বাসিনী উর্বশী ।[৪০]

কবিতাটির প্রথমার্ধে আছে—

'সন্ধ্যার বর্ণের ছটা রয়েছে তো তবু'
তবু তো আকাশে
ছুটে চলে শব্দময়ী অপ্সর রমণী
ঝঞ্চা মদরসে মত্ত শত শত বলাকার ধ্বনি ।
পুরূরবা নেই আর—
ক্লান্ত স্থির আকাশের বুকে
দূরগামী সূর্য আজো ঢেলে দেয় তবু
গলন্ত তোমার দীপ্ত রক্তিম চুম্বন ।

সূর্যাস্তের প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে উর্বশী পুরূরবার এই উল্লেখ ম্যাক্সম্যুলার কথিত সূর্য উষার প্রণয়ের ব্যঞ্জনাগর্ভ বর্ণনা বলে মনে হয় ।

বিষ্ণুদের 'পূর্বলেখ'-এর পদধ্বনি কবিতাতেও উর্বশীর উল্লেখ পাই । হৃত শক্তি বুর্জোয়ার উপমান বিগত যৌবন অর্জুনের জবানীতে—

ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে ঘনিষ্ঠ নিভৃতে
হে ভদ্রা, এ কার পদধ্বনি ?
ছড়ায় অমনি নক্ষত্রের মণি সে কোন অধরা
উন্মত্ত অপ্সরা
সুর সভাতলে বুঝি নৃত্যরত সুন্দরী রূপসী
বিভ্রান্ত উর্বশী ।
আকস্মিক কামনার উদ্বেল আবেগে
পদক্ষেপ মাত্রারিক্ত, বহু ভূগ্নিতার
মুদ্রালোল উচ্ছ্বাসের বেগে ।

---

৪০ । উর্বশী—চিত্রা

সে আতিশয্যের ভার
বিড়ম্বিত করে দেয় পার্থের যৌবন,
মুহূর্তের আত্মদানে সঙ্কুচিত এ পার্থিব মন।

এখানে সম্ভবত ভিন্ন তাৎপর্যে মহাভারতের বনপর্বের অর্জুন উর্বশী আখ্যানের অনুস্মৃতি।

কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যেও উর্বশীকে একবার দেখেছি। তাঁর ১৩৫০ সালে প্রকাশিত 'অভিজ্ঞান বসন্ত' সংকলনে। এই সংকলনে 'উর্বশী' কবিতায় বিকেলের লণ্ডনকে উর্বশীর উপমানে পণ্যাঙ্গনা রূপে চিত্রিত করেছেন —

ককনি খবর আর চিৎকার
গির্জের গম্ভীর, থিয়েটারে লক্ষ আলোর শীৎকার
লম্বা নীলাভ বিকেলের পথে পথে মন্থন—
কয়লার রাঙা আগুনে হাত দিয়ে ছিলে বসি
কুয়াশায় পুরানো লণ্ডন
এক পেনির লোভে হল উর্বশী।

কবি সমর সেন ও উর্বশীকে এঁকেছেন পুরুষের চির অন্বিষ্ট নারী সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে। তাই তাঁর সন্দেহ, আমাদের আর্থিক সমস্যাক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত জীবনে সেই সৌন্দর্যেরও আবির্ভাব সম্ভব কি না। কবি প্রশ্ন করেছেন,—

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো।
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে
হে ক্লান্ত উর্বশী।

কেননা আমাদের মধ্যবিত্তদের প্রণয়িনীরা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে বিষণ্ণ মুখে যাতায়াতে ক্লান্ত। তিক্ততায় পরিপূর্ণ তাদের রাত, সকাল দীর্ঘশ্বাসে দীর্ণ। সেখানে সৌন্দর্য স্বরূপিনী উর্বশীর আবির্ভাবের অবকাশ কোথায়?

এখানে উর্বশী সম্ভবত নারীর মধ্যে যে প্রেমিকা রূপ, তাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় ১৯৫৩ সালের শনিবারের চিঠির শারদীয়া সংখ্যায় 'উর্বশী নিরুদ্দেশ' নামে একটি কল্প নাটক প্রকাশ করেন। এই নাটকে তিনি প্রধানত রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের সুবিখ্যাত 'উর্বশী' ও 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতা দুটির ভাবধারা অবলম্বন করেছেন। কাহিনীটি এই রকম—

দার্জিলিং-এ রেশম পশমের ধনী বস্ত্র ব্যবসায়ী গৌতম গুহের কার্ট রোডের ভিলায় তার বন্ধু বিখ্যাত ভাস্কর মৃণ্ময় রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতাকে মাটির মূর্তিতে রূপায়িত করতে সচেষ্ট। সে রক্তের উচ্চ চাপে ভুগছে। তার বালবিধবা বোন কৃপা তাকে দেখাশোনা করে। মূর্তি নির্মাণ করতে করতে রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতা আবৃত্তি করে। মূর্তি প্রায় শেষ।

> বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
> কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।

ইত্যাদি আবৃত্তি করতে করতে মূর্তির চক্ষুদান করতে থাকে। তখন মূর্তির পিছন থেকে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং উর্বশী। বিস্ময়াবিষ্ট মৃণ্ময়কে জানালেন যে তাঁর কামনার টানে সে চলে এসেছে দেবসভা থেকে। যেমন একদিন মর্ত্যমানুষ পুরূরবার কাছে, অর্জুনের কাছে এসেছিলেন। রেকর্ডের বাজনার সঙ্গে চলতে থাকে উর্বশীর নৃত্য। মৃণ্ময় আবৃত্তি করে চলে—

> সুর সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
> হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী। ইত্যাদি

দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনে উর্বশীকে নিচে দোকান ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল আত্মগোপনের জন্য। গৌতম আর কৃপা ঘরে ঢুকল। তারা মৃণ্ময়ের উর্বশীর গল্প বিশ্বাস করল না। এমন সময় দোকান ঘর থেকে শাড়ি পরিহিতা উর্বশী উঠে এলেন। পরিচয় দিলেন—'আমি ওঁর স্ত্রী' উর্বশী নই মানসী। ঘটনাটা ঘটেছিল যখন আপনি বিলেতে ছিলেন তখন আমি ওর মডেল ছিলাম। বিয়েটা গোপন রাখার কারণ ছিল এই, আমার পিতৃপরিচয় ছিল না। কোথা

থেকে কেমন করে কোনদিন যে এ জগতে এসেছিলাম আমি বলতে পারি না, আর তা ছাড়া আমি শুধু একজনের প্রেয়সী ছিলাম না।...আমি গোত্রহীন, আমি বারাঙ্গনা...সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে চুপি চুপি ঢুকি।' গৌতম আর কৃপা চলে গেলে দরজা বন্ধ করে উর্বশী মৃন্ময়ের সামনে দাঁড়ালেন। মৃন্ময় আবৃত্তি করে—

'যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী।' ইত্যাদি

দরজায় পুনরায় করাঘাত। এবারে প্রবেশ করলেন উর্বশীর অষ্ট সখী আর বাদক চতুষ্টয়, গন্ধর্ব চিত্র সেন, সুষেণ, ঈশান ও বিষাণ। তাঁরা জানালেন যে উর্বশীর নিরুদ্দেশে স্বর্গরাজ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। দেবরাজ চটে গেছেন, দেবতারা সব বুক চাপড়াচ্ছেন। তাঁরা উর্বশীকে স্বর্গে ফিরে যেতে বললেন কিন্তু উর্বশী অসম্মত। মৃণ্ময় আবৃত্তি করে—

'কোন কালে ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকা বয়সী...ইত্যাদি

পরদিন সন্ধ্যায় প্যারাডাইস হোটেলের ম্যানেজার এসে জানালেন যে ৮ সখী ৪ বাদ্যকর সেই যে হোটেল থেকে বেরিয়েছেন তখনও ফেরেন নি। কৃপা এসে ওষুধ খাবার কথা মনে করিয়ে দেয়। গৌতম জানায় মানসী যে শাড়ী পরে বেরিয়েছিল তার ১২ খানার অর্ডার এসেছে। টি পার্টির আয়োজন করে গৌতম। ভরতনাট্য সংসদের গন্ধর্ব আর সখীদের কারো আর স্বর্গরাজ্যে ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই। ৫।৬ জন সখী কলকাতার লক্ষ-পতিদের সঙ্গে বিশ্ব ভ্রমণের কথা দিয়েছে। প্রোডিউসার ধনপতি আগরওয়ালা এবং সিনেমা •পরিচালক ত্রিভঙ্গ পাকড়াশি উর্বশীকে নিয়ে সিনেমা করার পরিকল্পনা করে।

সকলে চলে গেলে মৃণ্ময়ের প্রশ্নের উত্তরে উর্বশী জানায় কেবল তাঁর চাওয়ার জন্য নয় নিজেরও আর স্বর্গ ভালো লাগে না উর্বশীর। তিনি বলেন—

"আমি বলছি ভালো লাগে না। আমার জীবন, আমার যৌবন, আমার ঐশ্বর্য, এ যেন মানস সরোবরের অবরুদ্ধ জল। ক্ষয় নেই সত্য, কিন্তু ক্ষয় নেই বলেই তাতে প্রাণ নেই, জীবন হয়েছে স্তব্ধ, অনুভূতিতে আজ আমি

বৃদ্ধ, মহাকালের মতো বৃদ্ধ। লোকে বলে—উর্বশী, কিন্তু জানে না আমি আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি।···সে যা চায় সে তা পায় না। পাই না বলেই যুগে যুগে ছুটে গিয়েছি মানুষের কাছে। এসেছি তোমার কাছে, মৃত্যুর রূপটি দেখতে, মরণশীল মানুষের কাছে মৃত্যুর রহস্য বুঝতে।···মানুষকে বেশি ভালোবাসি। সত্য বটে আছে তার জরা, আছে তার ব্যাধি, আছে তার দুর্গতি, কিন্তু সব কিছু শোধন হয় ঐ মৃত্যুতে—বৃদ্ধ যায় শিশু আসে নবজন্ম নিয়ে, নবরূপে, নবরসে, নবছন্দে। মাটির বুকে চলেছে জীবন যৌবনের এই চির জয়যাত্রা। মাটিকে তাই ভালোবাসি, মানুষকে তাই বরণ করি বিধাতার কাছে আর্তকণ্ঠে কাঁদি—ফিরিয়ে নাও আমার এই অমর জীবন, আমাকে মানবী কর মানুষের ঘরে কল্যাণী বধূ হয়ে সন্ধ্যার মঙ্গল দীপটি জ্বালতে দাও। দুঃখ দাও, ব্যথা দাও, বেদনা দাও, অশ্রু দাও।"

উর্বশী আরো জানাল যে মৃণ্ময় যেদিন সুদীর্ঘ সাধনান্তে মূর্তি গঠন করে তাতে প্রাণদান করেছে সেদিনই তার হাতে উর্বশী ধরা দিয়েছেন। যতক্ষণ ঐ মূর্তি মৃণ্ময়ের কাছে থাকবে ততদিন উর্বশীও তার—দেবতাদের নয়। মৃণ্ময় আবৃত্তি করে—

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,······

গন্ধর্ব আর অষ্ট সখীরা ফিরে এলেন। পরিচালক ত্রিভঙ্গ আর প্রয়োজক ধনপতি প্রবেশ করলেন। মদনভস্মের রিহার্সাল হল। মৃণ্ময় ধ্যানরত শিব আর উর্বশী উমা। মৃণ্ময় মূর্ছার ভান করলে সবাই চলে গেলেন। দুজন লোক ঘরে রয়ে গেলেন—তাঁরা চন্দ্র আর সূর্য। চন্দ্র উর্বশীকে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুরোধ জানালেন। স্বর্গের অণু পরমাণু তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় কাতর। মৃণ্ময় আবৃত্তি করে—

ওই শোন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী।···

কিন্তু উর্বশী অস্বীকার করলেন স্বর্গে ফিরে যেতে কারণ উর্বশীর জন্য দেবতাদের হাহাকার, তার বিরহে বিলাপ ক্ষণিকের। সেখানে কারো জন্য কারো অশ্রু নেই। মৃণ্ময়ের আবৃত্তি—এবারে 'স্বর্গ হইতে বিদায়'—থেকে

শোকহীন/হৃদিহীন সুখ স্বর্গ ভূমি, উদাসীন/চেয়ে আছে

চন্দ্রের আহ্বানেও সূর্য ফিরে গেলেন না। সূর্য ব্যাখ্যা করেছেন উর্বশীর স্বরূপ—সে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতারই ভাষ্য। "এতদিন জানতাম উর্বশী ছিল অপ্সরা। তাঁকে হারিয়ে আজ বুঝেছি, অপ্সরা তাঁর সত্যকারের পরিচয় নয়। উর্বশী হচ্ছে সৃষ্টির আনন্দ। কর্মের উৎসব—উৎস। সে কারো মাতা নয়, সে কারো কন্যা নয়, কারো বধূ নয়, সে আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার জীবন দেবতা, যাকে আমরা কামনা করি কিন্তু পাই না বলেই আরো বেশি করে চাই। কর্ম করি তারই আনন্দের জন্য। কর্তব্য করে যাই তারই প্রশংসা পেতে। সার্থক হই তার প্রেমে। ধন্য হই তার প্রীতিতে।"[৪১]

ইন্দ্র এসে জানালেন তিনি তা বুঝতে পেরেছেন বলেই উর্বশীকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। উর্বশীর ভালোবাসা পেয়েছে দেবতা নয় মরণশীল মানুষ। রাত্রি শেষে মৃণ্ময়ের মৃত্যু সুতরাং সেজন্যও তাঁকে ফিরে যেতে হবে। মৃণ্ময় জানাল যতক্ষণ উর্বশী আছে ততক্ষণ তার মৃত্যু নেই—"আমার দেহের প্রতি রক্তকণা তোমার স্পর্শে প্রতি মুহূর্তে নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে। আমার প্রত্যেকটি অনুভূতি তোমার প্রেমে প্রতি মুহূর্তে নব চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে।"...

কৃপার নিয়োজ্রিত বাহাদুর মূর্তিটি নিচে ফেলে দিলে সেটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। উর্বশীর সদলে প্রস্থান। মৃণ্ময়ের আবৃত্তি—

> ফিরিবে না ফিরিবে না,—অস্ত গেছে সে গৌরব শশী /
> অস্তাচল বাসিনী উর্বশী।

মন্মথবাবু শেষ পর্যন্ত উর্বশীকে সৃষ্টির মুল আনন্দ প্রেরণা শক্তি রূপে স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ উর্বশীকে প্রধানত অমূর্ত সৌন্দর্য স্বরূপিণী বিশেষত পুরুষের নারী কামনার সারভূতা রূপে উপস্থিত করেছেন—তবু তার ব্যঞ্জনাও বিস্তৃত হয়েছে সৃষ্টির অন্তর্লীন আনন্দ প্রেরণা পর্যন্ত বলেই মনে হয়। দণ্ডী উপাখ্যানে উর্বশীকে ব্রহ্মানন্দ সমতুল্য বর্ণনা করা হয়েছে।

৪১। উর্বশী নিরুদ্দেশ পৃঃ ৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্য সাহিত্যে উপাখ্যান

শ্রীঅরবিন্দের কবিখ্যাতি সর্বজন বিদিত। তিনি কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকটির সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর কালিদাস[১] সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থেও এই নাটকের উর্বশী, পুরূরবা ও অন্যান্য গৌণ চরিত্রের বিশ্লেষণও করেছেন। 'উর্বশী' নামক তাঁর চার সর্গের ইংরেজি রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য এক অনবদ্য কাব্যকৃতি। সুতরাং এই উপাখ্যান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামত বিশেষভাবে আলোচ্য।

শ্রীঅরবিন্দের মতে কালিদাসের পুরূরবা বীর রাজা মাত্র নন, তিনি কবি এবং প্রেমিকও। বিক্রমোর্বশী নাটকের সংলাপ অনুধাবন করলেই দেখা যাবে তাঁর কবিকল্পনা এবং ভাষা বোধ কত গভীর। উর্বশীর মধ্যে যে বিশ্বলীন সৃজনাত্মক সৌন্দর্য-প্রেরণা মূর্ত তাকে লাভ করতে পারে একমাত্র সেই পুরুষ, কাব্য আর ভাব যার মধ্যে একাত্মতা লাভ করেছে —সমগ্র জীবনটাই যার কাছে হয়ে উঠেছে কাব্য। শ্রীঅরবিন্দ পুরূরবা শব্দের অর্থ করেছেন পুরুরব অর্থাৎ বিস্তৃত শব্দ—'The noise of whom has gone far and wide' এ ব্যাখ্যা নিরুক্ত অনুযায়ী।[২] তিনি পুরূরবার জন্ম বৃত্তান্তের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন,—"তাঁর মা ইলা হচ্ছে দৈব আকাঙ্ক্ষা (divine aspiration) যিনি মনু কন্যা বা মানব মনের সৃষ্টি। যে একবার নারী একবার পুরুষ হয়। তাঁর পিতা বুধ—উদ্বুদ্ধ রহস্যময় জ্ঞান। তাঁর পূর্ব পুরুষ সূর্য ও চাঁদ।

উর্বশীর জন্য তিনি ত্যাগ করেছেন তাঁর মানবী স্ত্রী, পার্থিব খ্যাতি এবং বাসনা। তাঁকে দিয়েছেন কামহীন প্রেম যা ছিল তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে এক

১। Kalidas, First Printed in 1909 in the Karmayogin later published in Book form in 1929 after some revision। অবশ্য তাঁর Urvasie কাব্যের রচনাকাল 1896 অর্থাৎ তাঁর সাধকজীবনের পূর্বে।

২। বহুধা রোরুয়তে তস্মৈবাভর্বাত। ১০।৪।৯ পৃঃ 463

সঃ বহুধা রোরুয়তে স্তনয়তি তেনাসৌ পুরূরবাঃ।

দৈব ভাবে। সে প্রেম ও তাঁর নির্বাধ ছিল না। উর্বশীকে নিয়ে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন কুমার বনে—যেখানে পার্থিব সৌন্দর্য বা আনন্দ প্রবেশ করতে পারে না। যেখানে কেবল সন্ন্যাসোচিত আত্মপ্রবঞ্চনা বা তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধিরই প্রবেশাধিকার। তারপর অবশ্য তাঁর আত্মা সমস্ত প্রকৃতি পরিভ্রমণ করে খুঁজেছেন তাঁকে। যা কিছু দেখেছেন তার মধ্যেই পেয়েছেন তাঁর আভাস। তারপর প্রকৃতির পশ্চাদ্বর্তী শক্তিমাতা পার্বতী উমার অলক্তক থেকে জাত সঙ্গম মণির স্পর্শে পুনরায় লাভ করেছেন উর্বশীকে। তাঁদের সন্তান আয়ু হচ্ছে মানব জীবন ও কর্মের মহিমান্বিত রূপ।[৩] অর্থাৎ তিনি কালিদাসের নাট্য কাহিনী বিশেষত উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যান একটি রূপক হিসেবে দেখেছেন যার মূল কথা—মানব মনের দৈব আকাঙ্ক্ষা আর রহস্য জ্ঞানের সঙ্গে মিলিত হলে তবে উপলব্ধি ঘটে বিশ্বলীন সৌন্দর্য চেতনা ও আনন্দ। যার নামান্তর উর্বশী।

অপ্সরারা সমুদ্রমন্থন জাত। সমুদ্র মন্থনেরও শ্রীঅরবিন্দ এক প্রতীকী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানব সভ্যতার শৈশবে মহাকাশে উজ্জ্বল দেবতা আর অতিকায় দানবদের সংঘর্ষে রূপ নিচ্ছিল মহাবিশ্ব। একবার তাঁরা দুই বিরোধী শক্তি ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে একত্র হয়েছিলেন এক সাধারণ কর্মে, যে কাজে প্রয়োজন ছিল দুই বিপরীত শক্তির সহযোগিতা। সৎ এবং অসৎ, আদর্শ এবং বাস্তব, আত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গতি, পাপ এবং পুণ্যের, স্বর্গ এবং মর্ত্যের সহযোগিতা। উদ্দেশ্য ছিল জীবনের যা কিছু সুন্দর, মধুর আর অবিশ্বাস্য তাকে পরিস্ফুট করা যা জীবনকে নিছক অস্তিত্ব থেকে মহত্তর করে তোলে অমরত্ব লাভের জন্য—যে সুন্দর অবিশ্বাসীকেও অভিভূত করে। মানুষকে আকৃষ্ট করে উচ্চতর, উন্নততর লোকে আরোহণ করতে যতক্ষণ না সে পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে স্বর্গাভিমুখী করতে পারে নিজেকে।

'ক্ষীর সমুদ্র হচ্ছে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা, কল্পনা আর উচ্চাশার সমুদ্র—অর্থাৎ মানুষের যা কিছু দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত তারই সমুদ্র। বাসুকীনাগ হচ্ছে কামনায় সর্প। যুগের পর যুগ মন্থনের ফলে উৎপীড়িত বাসুকী

৩। Kalidas—Sri Aurovinda, Karmayogin 1909. Sri Aurobindo Birth Centenary Library, vol III, p 270

বিষোদ্গার করল। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বেদনার সঙ্গে মিশে কালানল হয়ে উঠল সে বিষ। বিষ আর কোনদিন এত ভয়ঙ্কর ছিল না। কারণ তার মধ্যে ছিল সকল যুগের ভয়ঙ্করতা, যন্ত্রণা এবং জীবনের সকল ব্যথা। তার অশ্রু, নিষ্ঠুরতা. হতাশা এবং ক্রোধ আর উন্মত্ততা, অবিশ্বাসের অন্ধকার এবং মোহমুক্তির ধূসর বেদনা, মানুষের অন্তর্নিহিত পশু, তার কামনা, অত্যাচার এবং সঙ্গীদের দুর্ভোগের দুষ্ট আনন্দ।

কালিদাস উর্বশীকে বলেছেন নারায়ণ ঋষির উরু থেকে উদ্ভূত। শ্রীঅরবিন্দ কালিদাসের উর্বশীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার প্রতীকী স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন —যা অতিরিক্ত।

উর্বশী সূর্যালোকের ঔজ্জ্বল্য, উষার রক্তিম ছটা, সমুদ্রের কলহাস্য, আকাশের মহিমা, বিদ্যুতের ঝলক, এই পৃথিবীর যা কিছু উজ্জ্বল সুদূর অনায়ত্ত, প্রবল আকর্ষণ ; যা কিছু সুন্দর মধুর, মানবরূপের যা উন্মাদনাকারী, মানুষের বাসনা আর কামনার আনন্দ, যা কিছু শিল্পী ও সাহিত্যিককে আবিষ্ট করে রাখে কাব্যে শিল্পে রূপায়িত করে রাখতে—সে সব কিছু বিজড়িত এই একটি নাম উর্বশীর মধ্যে।[৪] কালিদাসের উর্বশীতে অবশ্য এই সব বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে নাই। তিনি উর্বশীকে এঁকেছেন একজন সুন্দরী উজ্জ্বলা রমণীরূপে যে গভীর প্রেমে আবিষ্ট। অবশ্য দিব্য মহিমা, সুদূর ঔজ্জ্বল্য, বাতাসের স্বাধীন নিশ্বাস রয়েছে তার চারপাশে কিন্তু তা কিছু তাঁর সত্তার অংশ নয়। প্রেমিক পুরূরবার প্রেম কাতর চিত্তে উর্বশী আভাষিত হয়েছে বিশ্বচরাচরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্তর্লীন সত্তারূপে। প্রসঙ্গত শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের চিত্রার উর্বশী কবিতার উর্বশী স্বরূপের বিশ্ব জগতের কল্পনা সৌন্দর্যের অনায়ত্ত আদর্শ সত্তার কথাও উল্লেখ করেছেন।[৫]

৪। Kalidas by Sri Aurobindo, Birth Centenary Library, vol III p 278-79

৫। The Urvasie of the myth as has heen splendidly seen and expressed by a recent Bengali poet (Urvasie 1895 by Tagore) is the spirit of imaginative beauty in the universe the unattainable ideal…তদেব পৃ 270।

শ্রীঅরবিন্দের মতে কালিদাসের উর্বশী চরিত্রের মাধুর্য তাঁর কাম ও স্নেহের আন্তরিকতায়। কঠিন পরিস্থিতিতে পুত্র আয়ুকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাঁকে, কারণ আয়ুকে কাছে রাখলে হারাতে হবে পুরূরবাকে তাই সুশিক্ষা আর পালনের জন্য আয়ুকে চ্যবনাশ্রমে সুকন্যার কাছে গচ্ছিত রাখতে হয়েছে। উর্বশী পুরূরবার সম্পর্ক শ্রীঅরবিন্দ দেখেছেন মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বরূপে সৌন্দর্য আর লাবণ্যের পূর্ণ প্রতিমা রূপে প্রেমিক কবি পুরূরবার মনের মাধুরী দিয়ে কামনার উত্তাপে কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়ে গড়ে তোলে যা তাঁর মনেরই প্রকাশ।[৬]

শ্রীঅরবিন্দ উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যান নিয়ে চার সর্গে রচিত উর্বশী নামে ইংরেজিতে একটি অনবদ্য রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেছেন। বৈদিক আখ্যায়িকা ও কালিদাসের নাটক অনুসরণে তাঁর কাব্যবৃত্ত গড়ে তুললেও আপন অধ্যাত্ম উপলব্ধির আরোপে তা গভীর মৌলিক তাৎপর্য লাভ করেছে।

কাহিনীটি নিম্নরূপ—

পুরূরবা দেবদানবের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে পৃথিবীর সীমান্তে হিমালয়ের পার্বত্য চূড়ায় প্রাচীতে দেখতে পেলেন এক নবীন উষার অভ্যুদয়। ক্রমে সেই উষার বিস্তৃত মহিমায় আবির্ভূত হল এক অপরূপ মুখচ্ছবি। নীরব মাধুর্যে অনবগুণ্ঠিতা নববধূর স্মিত হাস্যে, আরক্ত গোলাপী গণ্ড পুষ্পিত বক্ষ উর্বশী।

> Out of the widening glory move a face
> Of dawn, a body fresh from mystery
> Enveloped with a prophecy of light,
> More rich than perfect splendours. It was she
> The golden virgin, Usha, mother of life
> Yet virgin.[৭]

৬। Urvasie by Sri Aurobindo। Sri Aurobindo Birth Centenary Library, vol 5, Collected poems। পঞ্চম খণ্ডের শেষে রচনাকাল দেওয়া আছে 1896। সুতরাং সন্ন্যাসের পূর্ববর্তী বড়োদা যুগের।

৭। তদেব—পৃঃ 189, ছত্র 33—37।

শ্রীঅরবিন্দ উর্বশী কাব্যের প্রথম সর্গটি বৈদিক অনুষঙ্গে প্রাকৃতিক রূপকে রচনা করেছেন। প্রাচী-র আকাশ অনুরঞ্জিত করে আবির্ভূত হয় ঊষা। ঘনকৃষ্ণ মেঘ ত্রস্তপদে আবৃত করে ঊষাকে। প্রবল বর্ষণে ঢেকে যায় তার আরক্তিম ছটা। তারপর সূর্য এসে মেঘকে দূর করে উদ্ধার করে ঊষাকে। সমস্ত আকাশ আবার হেসে ওঠে উজ্জ্বল আলোকে। কেশীর কবল থেকে উর্বশী উদ্ধারের এই প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা কবি অরবিন্দের কাব্যে।

স্বর্ণ কুমারী, জীবন জননী ঊষার এইসব অভিধা সম্ভবত ঋগ্বেদের প্রেরণা জাত।[৮] ঋগ্বেদের উর্বশী পুরূরবা সূক্তকে ম্যাক্সমূ্যলর ঊষা আর সূর্যের প্রেম কাহিনী বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[৯] দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে দৈত্য কেশীকর্তৃক উর্বশী হরণ শ্রীঅরবিন্দ ঝড়ের মেঘ কর্তৃক ঊষার আলোকের আবরণ রূপে বর্ণনা করেছেন।

বৃষ্টির গর্জনে, ঝড়ের প্রবল পক্ষ বিধূননে, বজ্রের বিপুল ধ্বনিতে দিগন্ত আচ্ছন্ন করে আকাশে কালো বিরাট ঈগলের মতো নিচের হিমানী থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ঊষাকে।[১০]

সম্ভবত এর ইঙ্গিতও তিনি নিয়েছেন কালিদাসের নাটক থেকে। বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কে উর্বশী হারা পুরূরবা খুঁজতে খুঁজতে ধারাবর্ষণকারী একখণ্ড মেঘকে মনে করেছেন কোন দৈত্য উর্বশীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন এ তাঁর ভ্রম। রাক্ষস নয় নবীন মেঘ, শরাসন নয় ইন্দ্র ধনু, বাণ নয় নবজলধারাপাত।[১১]

৮। দ্রঃ হিরণ্যবর্ণা সুদৃর্শক সংসদৃগৃগবাং মাতা ঋ ৭।৭৭।২
রুশদ্বৎসা রুশতি শ্বেত্যাগাদারৈস্থ ঋ ১।১১৩।২
এষা দিবো দুবিতা প্রত্যদর্শি ব্যুচ্ছন্তী যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ ১।১১৩।২ ইত্যাদি।

৯। Comparative Mythology by Max Muller, p 161।

১০। Urvasie ১ম সর্গ, ছত্র 161-167।

১১। বিক্রমোর্বশীয়ম্—কালিদাস, চতুর্থ অঙ্ক।

নবজলধর সন্নদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্ত নিশাচরঃ
সুর ধনুরিদং দূরাকৃষ্টং ন নাম শরাসনম্।
অয়মপি পটুর্ধারা সারো ন বাণ পরম্পরা
কণক নিকষ স্নিগ্ধা বিদ্যুৎ প্রিয়া মম নোর্বশী।
(এ হচ্ছে ঘন সন্নিবদ্ধ নব মেঘমালা নিচয়, দৃপ্ত নিশাচর নয়
এ হচ্ছে সুদূর আকর্ষিত ইন্দ্রধনু, শরাসন নয়
এও বৃষ্টিধারা, বাণ পরম্পরা নয়
স্বর্ণবর্ণা স্নিগ্ধবিদ্যুৎ, আমার প্রিয়া উর্বশী নয়।)

দ্রুত রথে এসে উর্বশীকে উদ্ধার করলেন পুরূরবা। এখানে অবশ্য কালিদাসীয় নায়ক পুরূরবাকেই পাই। পুরূববার স্বরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। রথে করে উর্বশীকে নিয়ে যাবার সময় মেনকা এসে উর্বশীকে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানালেন। প্রত্যর্পণের পর তিলোত্তমা জানালেন পুরূরবার প্রশস্তি। দেবতাদের থেকে অধিকতর শক্তিমান পুরূরবা কারণ দেবতাদের ক্ষমতা অপরিবর্তনীয়। আর মর্ত্য মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে কামনাকে বিতাড়িত করে বড় হয়ে উঠতে পারে ঈশ্বরের মতো।

Man, by experience of passion purged,
His myriad faculty perfecting, widens
His nature as it rises till it grows With God
conterminous.[১২]

এই মনুষ্যত্বের মহিমাও এই কাব্যের উৎকর্ষের অন্যতম কারণ। পুরূরবার মহত্ত্ব বারত্ব প্রশংসা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত মেনকা উর্বশীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁকে পুরূরবা বাঁচিয়েছেন যাকে ছাড়া সারা পৃথিবী হয়ে ওঠে কালো। মৃত্যু ঘটে পৃথিবীর।[১৩]

এখানে স্পষ্টত উর্বশীকে বিশ্বের সৌন্দর্য সার এবং প্রাণের প্রেরণাদাত্রী, সৃষ্টিশক্তি রূপে চিত্রিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

১২। Urvasie ১ম সর্গ, পৃঃ 196, ছত্র 277-80।

১৩। তদেব ছত্র 290-291।

প্রথম সর্গে উর্বশীকে প্রাকৃত সৌন্দর্যের সার, জগৎ জীবনের প্রেরণাদাত্রী রূপে ফুটিয়ে তোলা হলেও অপূর্ব কাব্য কুশলতায় শ্রীঅরবিন্দ উর্বশীর নায়িকা রূপও চমৎকার চিত্রিত করেছেন। প্রথমে এঁকেছেন তাঁকে নারী সৌন্দর্যের অপরূপ প্রতিমা রূপে। কেশী এসে যখন তাঁকে হরণ করল তখনকার বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ যেন এক ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত পদ্মফুল (As the storm lifts a lily)। তারপর পরাজিত কেশী সৌন্দর্য যাদুকরী উর্বশীকে ফেলে দিয়ে পালাল। সে পড়ে রইল শুভ্র তুষার স্তূপে দলিত পুষ্পের মতো···উজ্জ্বল দলিত পদ্মের মতো আপনার বিপুল কেশরাশির উপর শায়িত পড়েছিল উর্বশী। বিস্রস্ত বেশ বাস থেকে উঁকি দিচ্ছিল নগ্ন স্কন্ধ আর স্বর্ণ বক্ষ। উত্তোলিত এক স্বর্ণ বাহু পড়েছিল শুভ্র তুষারকে ম্লান করে। মুখখানি যেন তুষার রাশির উপর পতিত এক পূর্ণচন্দ্র।[১৪]

আপন বাহুতে ধৃতা মূর্ছিতা উর্বশীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন প্রেম পূর্ণ পুরূরবা। হৃদয় স্পন্দনে অনুভব করেন আত্মার গোপন মাধুর্য। নড়েচড়ে উঠলেন উর্বশী। সেই সুন্দর আয়ত চোখের তারা যেন স্বপ্নের মতো উদিত হল পুরূরবার হৃদয়ে। সুন্দর বিস্ময় এক দেখা দিল উভয়ের মনে। তারপর ধীরে ধীরে উন্মীলিত হল তার উজ্জ্বল নয়ন যুগল। সানন্দে এক পরিবর্তিত পৃথিবীতে জাগল উর্বশী—প্রেমে। চোখে চোখে মিলন হল তাঁদের মধুর হাস্যে।[১৫] মূর্ছাভঙ্গে প্রাপ্ত চৈতন্য কালিদাসের উর্বশী অপেক্ষা এ সৌন্দর্য কোন অংশে কম নয়।[১৬]

১৪। Urvasie, Canto I, lines 210-217।

১৫। Urvasie, Canto I, lines 317-326।

১৬। তুলনীয় কালিদাসের মূর্ছিতা উর্বশী

মুঞ্চতি ন তাবদস্যা ভয়কম্পঃ কুসুম কোমলং হৃদয়ম্।
সিচয়ান্তেন কথংচিৎস্তন-মধ্যোচ্ছ্বাসিনা কথিতঃ।

চৈতন্য প্রাপ্তির পর—

আবির্ভূতেনশশিনি তমসারিচ্যমানেব,
রাত্রির্নৈশস্যার্চির্হুত ভুজ ইবচ্ছিন্নভূয়িষ্ঠধূমা।
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা
গঙ্গারোধঃ পতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম।

প্রথম সর্গে শ্রীঅরবিন্দ উর্বশীর মুখে একটিও কথা দেন নি তবু তার স্বল্প চাল চলনে রোমান্টিক নায়িকার প্রতিকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় সর্গে উর্বশী উন্মনা, প্রেমাবিষ্ট রোমান্টিক নায়িকা, প্রিয়তমের চিন্তায় বিভোর। যন্ত্রের মতো সম্পাদন করে চলে আপন কর্তব্য। সে স্বর্গ সভায় নাচে, বীণা বাজায়, মন্দাকিনীতে স্নান করে শুভ্র উষায়, ঘুরে বেড়ায় নন্দন কাননে, স্বর্ণ সন্ধ্যায় বসে থাকে বৃক্ষতলে। একদিন স্বর্গ নাট্যশালায় লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয়কালে ভুল করে উচ্চারণ করে পুরুষোত্তমের স্থানে পুরূরবার নাম। ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন ভরতমুনি। ইন্দ্রের অনুরোধে ভরত ব্যবস্থা দিলেন অভিশাপ খণ্ডনের। কিন্তু উর্বশী একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না, নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন হাস্যমুখর দেবতাদের সামনে। ভরতের ক্রোধ প্রশমনের জন্য ইন্দ্র তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন উর্বশীর গুরুত্ব। তাঁকে স্বর্গ থেকে নির্বাসন ঠিক হবে না কারণ উর্বশী স্বর্গের অঙ্গ, এখানকার কুঞ্জ, স্রোতস্বতী, উদ্যান হবে আনন্দ সৌন্দর্য চ্যুত—তাঁর বিহনে। উর্বশী নীরবে ধীরে ধীরে চলে এলেন স্বর্গ সীমানায়, সেখানে তিলোত্তমার হাত ধরে স্বর্গ নদী পার হয়ে চলে এলেন মর্তের দিকে—এগিয়ে গেলেন বদ্রিকেশ্বর পার হয়ে পুরূরবার দিকে।

প্রেমাকুল পুরূরবার কাছেও অসহ্য হয়ে উঠেছিল রাজকার্য। রাজকার্য ত্যাগ করে এলেন হিমালয় অঞ্চলে। চলে গেলেন বদ্রিকেশ্বর ছাড়িয়ে আরো উত্তরে। ৬ মাসে এলেন এক নির্জন স্থানে। সেখানে ৭ মাস অনাহারে অনিদ্রায় তপস্যার পর সপ্তম দিনে এলেন তিলোত্তমা উর্বশীকে সঙ্গে নিয়ে। পুরূরবা মনে করলেন স্বপ্ন তাই নীরবে বসে রইলেন পাছে স্বপ্ন ভেঙে যায়। তিলোত্তমা বললেন—"পুরূরবা তুমি বিজয়ী হয়েছ, আমি উর্বশীকে নিয়ে এসেছি, এ কোন স্বপ্ন নয়।' প্রিয় নামটির উচ্চারণ শুনে পুরূরবা উঠে দাঁড়ালেন মহৎ ভাবনায় চকিতে উদ্দীপ্ত কবির মতো। তিলোত্তমা বলে চললেন—'হে ঐল, একজন মানুষ আর একজন স্বর্গের অপ্সরা,—সাগর কন্যা সমুদ্রের মতো, অসীম সত্তা। তাঁরা কখনো একজন স্বামীর কাছে আত্ম সমর্পণ করে না, বিশ্বকে সীমিত করে না একরূপে, তাঁরা সুরভিত বায়ুর মতো,

অনধিকৃত জলের মতো সুন্দর সর্বজনীন আলোর মতো—অসংযত আত্ম-সমর্পণেও থাকে পবিত্র। পৃথিবীর পরে প্রকৃতির ধৈর্যশীল পথে আর শ্রমশীল তারাদের আমরা ভরে দিই পবিত্র আবেগে, উচ্চ উদ্দীপ্ত প্রেরণায় এবং ছুঁয়ে দিই আনন্দে তাই তারা চলে প্রবল সৃজনশীল বেদনায়। আমরা স্বর্গে উজ্জ্বল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করি দেবতাদের, মানবাত্মাদের। তবু স্বাধীন—বাতাসের মতো, ফুলের গন্ধের মতো। তুমিও কি ধরে রাখবে না তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠতা। জাতি গঠনের মানবিক কর্মে নিযুক্ত থেকেও কর্মের দ্বারা অস্পৃষ্ট থেকেও সেই অমর উচ্চতায় আরোহণ করবে নাকি?"

তিলোত্তমার কথার উত্তরে পুরূরবা বললেন—"একদিন আমাতে ছিল পবিত্রতা, শুভ্রতা, ঈশ্বরের অংশ মানবাত্মার ভাবনা। কিন্তু এখন দেখছি স্বর্ণশিশু বসন্ত, কম্পিত শস্যক্ষেত্র, সব কিছু সুন্দর বস্তু এগিয়ে আসে আমার কাছে। আমি স্বপ্ন দেখি এক রমণীর উজ্জ্বল বক্ষের। তাকিয়ে দেখি শিশির বিন্দু, আনন্দিত পাখিদের গানে; ভালো লাগে সাপের নির্দোষ কুণ্ডলী। কামনার তটাভিমুখী এক তরঙ্গের মতো এই সব সহ তাঁর বুকেব দিকে এগিয়ে যাই, তার রহস্যাবৃত চোখের দিকে যেখানে সব কিছু একাকার হয়ে যায়।'

তিলোত্তমা তারপর বললেন নরঅপ্সরীর দুর্লভ প্রেমের কথা। "একবছর তুমি তাকে পাবে তুষারাবৃত নির্জনে, একবছর সবুজ অরণ্যে ঝরণার তীরে মুক্ত জীবনে। আর একবছর জনপদে। হে রাজন্, মানুষ অপ্সরার সঙ্গে বাস করতে পারে না যদি না অপ্সরা হয় এক অদৃশ্য পরমানন্দ আর পুরুষ এক রহস্যময় সত্তা। অতএব কখনো তোমার নগ্নসত্তা রাখবে না তার দৃষ্টিতে আলোকে। তিরোহিত হলেন তিলোত্তমা। পুরূরবা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নীরবে। সারা অঙ্গ উদ্দীপ্ত হল সৌন্দর্য আর জীবন আর পার্থিব উষ্ণতা। আনন্দিত চীৎকারে পুরূরবা কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন ভীত কম্পিতা উর্বশীকে।

'দ্বিতীয় সর্গের শেষে এইখানে উর্বশী আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে একটিমাত্র বাক্য অস্ফুট উচ্চারণ করেছে পুরূরবার ব্যাকুল অনুরোধে। "স্বামী, প্রিয়তম আমার।"

শ্রীঅরবিন্দের উর্বশী কাব্যের তৃতীয় সর্গের সঙ্গে কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর কোন মিল নাই। এখানে তিনি শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনীর অনুসরণ করেছেন। প্রথম মিলনের পর উর্বশী আর পুরূরবা একবছর যাপন করলেন তুষারাবৃত পর্বত শিখরে, একবছর কাটালেন রৌদ্রালোকিত সবুজ অরণ্যে। তৃতীয় কুসুমের মাসে উর্বশীর এক পুত্র জন্ম নিল। তিনি তখন ফিরে যেতে চাইলেন লোকালয়ে। তারা ফিরে এলেন ইলানগরে গঙ্গাতীরে। নগরবাসীরা বিপুল সম্বর্ধনা জানাল রাজদম্পতিকে। সাত বছর কাটল এইভাবে। পুরূরবার বংশে উর্বশীর গর্ভে জন্ম নিল গৌরবান্বিত সন্ততি।

এদিকে উর্বশীর বিচ্ছেদে কাতর দেবতারা মিলিত হলেন সভাগৃহে। উর্বশী যাঁকে সবচেয়ে ভালোবাসতেন সেই মেনকাকে তাঁরা বললেন—'মেনকা, আর কতকাল স্বর্গ বঞ্চিত রাখবে তাঁর সাহচর্য থেকে, যাও মর্তে গিয়ে তাঁকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।" মেনকা নেমে এলেন মর্তে ইলানগরে। সেখানে তখন সন্ধ্যা, সিংহাসনে উপবিষ্ট উর্বশী ও পুরূরবা। তরুণ কবি গাইছেন বন্দনা গীতি—

"আনন্দ কর, পুরূরবা পেয়েছেন উর্বশীকে
পুরূরবা আর উর্বশী যজ্ঞের জনক-জননী
তাঁদের মিলনে জন্ম নেয় আগুন
পিতাবিহীন কুমারীর সন্তান পুরূরবা
মাতাহীন উর্বশী।
আকাশ এবং পৃথিবীর সন্তান ভালোবেসেছিল পরস্পরকে।
তোমরা কি আগুন আনোনি মর্তে
হে পুরূরবা তুমি কি স্বর্গ থেকে যজ্ঞকে আনোনি?
আনোনি সানন্দা উর্বশীকে।
যজ্ঞের আগুন সতত ঊর্ধ্বগামী
হারানো স্বর্গের প্রতি সতত পিয়াসী
শিখা তাদের মানব প্রার্থনায় ভারী
প্রেমের আত্মাও ওঠে ঊর্ধ্বে আকাশের পানে।

রাত বাড়ল। চলে গেল সকলে। স্তব্ধ হল কোলাহল। তারাভরা আকাশ আচ্ছন্ন করল পৃথিবী। শুতে গেলেন তাঁরা দুজনে। তাঁদের মহার্ঘ্য পালঙ্কের পাশেই বাধা থাকত গন্ধর্বদের দেওয়া দুটি মেষ। সব সময়েই তারা থাকত উর্বশীর কাছে। নিজের শিশুদের থেকেও উর্বশী তাদের বেশি ভালোবাসতেন। রাত গভীর হল। মেঘেরা জড়ো হল আকাশে। মেঘ থেকে চমকাল বজ্রহীন বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুতের আলোয় চোরের মতো প্রবেশ করল গন্ধর্বরা। মেষ দুটিকে হরণ করল তারা। উর্বশী কেঁদে উঠলেন। ডাকলেন পুরূরবাকে। 'পৌরুষে দীপ্ত পুরূরবা উঠে গেলেন ধনুর্বাণের কাছে। আবার চমকাল বিদ্যুৎ। সেই আলোকে দেখা গেল পুরূরবা দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন। সর্ত ভঙ্গের জন্য তিরোহিত হলেন উর্বশী। কাব্যের এই অংশ স্পষ্টত শতপথ ব্রাহ্মণের[১৭] অনুযায়ী।

পুরূরবা ভেবেছিলেন উর্বশী বোধহয় পাশের ঘরে গেছে তার মেষদের জন্য জল আনতে। হয়ত দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখবে রাতের শোভা তারপর ওদের জল খাইয়ে পাশে এসে শুয়ে পড়বে। তাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন পুরূরবা। ভোর হল। দেখলেন শয্যা শূন্য। এক্ষুণি ফিরে আসবে হয়ত। কিন্তু উর্বশী আর ফিরলেন না। সব জায়গায় তাঁর স্মৃতি জড়িত। বেদনার অশ্রুজলে কাটে তার দিন রাত। প্রজারাও দুঃখী রাজদুঃখে। আবার এল বসন্ত। ব্যাকুল রাজা ঠিক করলেন হতাশার শিকার না হয়ে তিনি বেরোবেন তাঁকে খুঁজে আনতে। দরকার হলে সুদূর স্বর্গলোক থেকে ছিনিয়ে আনবেন তাঁর প্রিয়াকে। রাজ্যের সব লোককে আহ্বান করে উর্বশীর পুত্র আয়ুকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে উদ্যত আয়ুধ সৈন্যদের মধ্য দিয়ে রাজপুরী ত্যাগ করে চলে গেলেন তিনি সূর্যাস্তের ঘনায়মান অন্ধকারে মাঠের মধ্য দিয়ে ইলানগরী ছাড়িয়ে।

শ্রীঅরবিন্দের উর্বশী কাব্যের চতুর্থ স্বর্গের প্রথমাংশে কালিদাসের কিঞ্চিৎ প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও এর গঠন ও পরিণতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বকীয়। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আছে রাজপুরীতে উর্বশীর সঙ্গে

১৭। Urvasie, Canto II, p 211, lines 503-513।

মিলনের পর পুরূরবা উর্বশীর প্রেরণায় রাজ্যভার অমাত্যদের হাতে দিয়ে কৈলাস পর্বতের গন্ধমাদন বনে বিহার করতে গিয়েছিলেন। এই অঙ্কটি বিক্রমোর্বশীর শ্রেষ্ঠ অংশ। এখানে কালিদাস প্রকৃতি প্রীতি ও প্রেমের বিরহ বেদনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যেও উর্বশীকে হারিয়ে পুরূরবা রাজ্য ত্যাগ করে চলে এলেন শত স্মৃতি বিজড়িত জনস্থান অরণ্যে। যেখানে তিনি উর্বশীকে নিয়ে বিহার করেছিলেন। মধুর কলনাদী নদী, উজ্জ্বল মাঠ, বিরাট বটগাছ—যেখানে উর্বশী বসেছিল, শুয়েছিল, বিশ্রাম করেছিল সর্বত্র উর্বশীকে খুঁজে বেড়ালেন তিনি। একদা সে ছিল এইসব নিসর্গ সৌন্দর্যের আত্মা স্বরূপা কিন্তু আজ সবকিছু মনে হচ্ছে যেন উর্বশীর পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ। কিন্তু এই পর্যন্তই বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কের সঙ্গে মিল। বাকিটা সম্পূর্ণ ই শ্রীঅরবিন্দের মৌলিক কল্পনা। তবে মাঝে মাঝে তিনি ঋগ্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণের আভাস ইঙ্গিত কিছু কিছু গ্রহণ করেছেন।

খুঁজতে খুঁজতে পুরূরবা শিবালিক পর্বতের দ্বারদেশ দিয়ে এসে পৌছলেন হিমালয়ের পাদদেশে। সেখানে উচু পাহাড়ের শিখর আর স্বর্গ নীরব স্তব্ধতায় বিশ্বের আত্মাকে অনুভব করছে সৃষ্টির ধ্যানে। সেখানে তিনি কাতর প্রার্থনা জানালেন পাহাড়ের কাছে উর্বশীকে ফিরে পাবার জন্য। সেখানে দীর্ঘকাল তিনি মগ্ন রইলেন ধ্যানে, উর্বশীব ভাবনায় নিজেকে নিমগ্ন করে। নীরবে তুষার ঝড়ে পড়ল তাঁর মুখে, মাথায় কেশে। মাসের পর মাস পার হয়ে গেল তবু উঠলেন না তিনি। অবশেষে স্বর্গ হতে ভেসে এল এক কণ্ঠস্বর, উঠলেন তিনি বাধ্য হয়ে। বিরাট গিরিশিরা পার হয়ে চলে এলেন এক আশ্চর্য দেশে, যেখানে বাস করে উত্তরকুরুরা। এলেন পিতৃপুরুষের বিচরণ ভূমি উচ্চ উপত্যকায়। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন সিংহাসনারূঢ় ইন্দিরা—সাগরতনয়া সাম্রাজ্যের দাত্রী, যিনি সৌন্দর্যের সার।

দেবী জানালেন 'যদিও তার পিতৃপুরুষের পাপ রয়েছে পুরূরবার উপর তথাপি তার মহৎ প্রেমের জন্য—যার জন্য সাম্রাজ্য ছেড়ে সে চলে এসেছে—

সে পাবে তার সম্পূর্ণ কামনা। ভবিষ্যৎ বাণী করলেন তিনি, ইলার পুত্ররা বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করবে হস্তিনা আর ইন্দ্রপ্রস্থে। পরে তা চলে যাবে বর্বরের হাতে।' সেখান থেকে সুপ্তোত্থিত মানুষের মতো তিনি হেঁটে চললেন পুবদিকে। এসে পৌঁছলেন দেবগিরি কৈলাসের স্বর্ণশিখর মৈনাক পাহাড়ের এক বন্য পরীস্থানে। যেখানে এক পাহাড়ী ঝরণা ঝক্‌ঝক্ করে বয়ে গিয়ে মিশেছে এক হ্রদে। এক দঙ্গল গাছের জড়াজড়ি আর শ্যাওলা ধবা বিশৃঙ্খল পাথরের মাঝে সেই হ্রদ। জল তার ঢেকে গেছে পদ্ম ফুলে আর পাতায় পাতায়। সেখানে বসে আর্যমাতা শুভ্রা। নিবিড় কেশজালের নিচে সুগম্ভীর ম্লানতা, সৃজনশীল চিন্তায় কুটিল ভ্রূ। সুন্দর পরিচ্ছদ, বদ্ধকবরী পুষ্পগ্রথিত। সারিবদ্ধ রাজহাঁসের পাশে জলে ডোবান পদযুগল। একহাতে শিথিল ধৃত রহস্যময় পদ্ম। তিনি জানালেন—তিনি অনন্ত সৌন্দর্যের উৎস। তাঁর বক্ষ থেকে ঝলকিত সতীত্বের শক্তির দীপ্তি পৃথিবীতে রূপ নেয় সৌন্দর্যরূপে। সেই একই সৌন্দর্যের প্রেরণাজাত পুরূরবাও। সেই বিপুল সৌন্দর্যেব অনন্ত অমৃত আবৃত রয়েছে বাহ্য রূপের পাত্রে। বসন্ত ফুল, উজ্জ্বল আলো, সোমরস, সোনার আনন্দ, জীবন্ত আবেগ আর অমর অশ্রুজল। এই সব হচ্ছে সেই আবরণ। সেই উদ্দীপ্ত দিব্যবোধের উচ্চ আকাশ থেকে পতিত হন তিনি।

পুরূরবা জানালেন যে অন্তহীন কামনা যা তাঁর আত্মাকে বিনাশ করে তার অন্ত পাওয়া যায় না। দেবী তখন সরোবর থেকে একগণ্ডুষ জল দিলেন তাঁকে। পান করে পুরূরবা অনুভব করলেন যেন অনন্তকে দেখতে পেলেন। তারাদের মধ্যে কাল রয়েছে সাপের মতো কুণ্ডলী করে। মর্তের দিনরাত তাঁর কাছে মনে হল যেন মুহূর্ত। তখন দেবভূত বীরের কাছে দেবী বললেন,—হে বীর অমর, আপন আনন্দকে কর অনুসরণ। তার আগে কৈলাশ শিখরে আরোহণ কর যেখানে বসে আছেন মাতা শক্তি যাঁর আজ্ঞা অনুমোদন করবে তোমার ভবিষ্যৎ। এই বলে দেবী শুভ্রা চুম্বন করলেন তাঁর ভ্রূযুগলের মাঝে। তিনি আরোহণ কবলেন রুদ্ধশ্বাস পর্বতের উচ্চ শিখরে। সেখানে মহিমান্বিত গুপ্ত গুহা থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর ভবিষ্যৎ বাণীর মতো। পুরূরবা জানলেন পক্ষপাতহীন ঈশ্বর পরাজিতকে অপরাধী করেন না। সকল পরিশ্রমী আত্মাকেই তিনি দেন যোগ্য পুরস্কার। সে কাজ যত ক্ষুদ্র হোক, নিয়োজিত

শক্তি যত ক্ষুদ্র হোক কখনো তা উপযুক্ত ফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয় নাই। ভবিষ্যৎবাণী হল—'পুরূরবার বংশে সাম্রাজ্য এবং মেধা থাকবে, আবির্ভূত হবে যোদ্ধা, বীর, শাসক, সব যোগ্য লোক। তাঁর বংশে স্বয়ং পরমাত্মা মথুরায় জন্ম নেবেন সসীম সত্তায়। তাঁর বংশের সন্তান হবে স্তোতা, মহৎ স্বর্ণোজ্জ্বল কাব্যের স্বচ্ছ বিরাট কবি। কিন্তু সব কিছু ধ্বংস হবে অদম্য কামনার স্বেচ্ছাচারে অথবা হিংস্রতায়। কিন্তু হে ঐল আনন্দ কর কারণ তোমার জন্য মধুর গন্ধর্ব লোকের পরমানন্দ এবং উর্বশীর আলিঙ্গন রবে প্রলয় পর্যন্ত যখন দেবতারা পড়বেন ঘুমিয়ে।' থামল কণ্ঠস্বর। পুরূরবা কঠিন মূল্যে ক্রীত এই পুরস্কার লাভের জন্য আনন্দিত মনে অগ্রসর হলেন। সুন্দর হ্রদের পাড়ে তিনি দেখলেন রৌদ্রালোকিত এক রমণীয় পথ আর গন্ধর্ব গৃহের তোরণ। দ্রুত এগিয়ে গেলেন তিনি তোরণের দিকে। দ্বারে দণ্ডায়মান দেবদূতের মত উজ্জ্বল মুখশ্রী একজন চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি পুরূরবা।'

মধুর শব্দে খুলে গেল দরজা। স্বর্গীয় বাদ্যের সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। পরীর মতো পরিচ্ছদ, সুভ্র একজন এগিয়ে এসে স্বাগত জানান পুরূরবাকে। "হে ঐল, সুবিখ্যাত পুরূরবা, ভাগ্যে তোমার মর্ত্য জনের আশার অতীত আনন্দ। এগিয়ে যাও নক্ষত্রের মত, তোমার পবিত্র মহিমার নির্ধারিত গন্তব্যে।"

"সবুজতর পৃথিবীর মতো এখানেও উজ্জ্বল হও।" সেই সঙ্গীত মুখরিত পথ দিয়ে স্তুতি গান করতে করতে তাঁকে নিয়ে চললেন তাঁরা। পুরূরবা সর্বক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন উর্বশীকে। বিরাট সব গাছের প্রাচীরের ধারে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে স্বাগত জানাতে। উর্বশীর দুই উজ্জ্বল সখী এগিয়ে এলেন। একজন গম্ভীর হাস্যে কোমল হাতের শক্ত বন্ধনে ধরে তাঁকে নিয়ে এলেন একটি স্থানে। পরীর রাজ্যের মতো ছায়া ছায়া গাছ, রহস্যময় হ্রদের মনোরম নিচু পাহাড়। সেখানে সব কিছু মায়া মাখানো, রৌদ্রালোকিত, বয়ে গেছে এক কলনাদী নদী। সেখানে এক সবুজ নিচু শাখার আচ্ছাদনের নিচে দাঁড়িয়ে —উর্বশী। নীরবে শান্ত আয়ত চোখে এগিয়ে এলেন তিনি পুরূরবার কাছে। তাঁদের দুজনের দৃষ্টিতে ছিল এক গভীর ভাব যা আনন্দ থেকেও পবিত্রতর—

সেই ভাব যা এক পরিপূর্ণ মুহূর্ত, অনন্তকাল যার অনুসরণ করবে। তখন সেই জ্যোতির্ময় সখী গম্ভীর হাসিতে বললেন—"দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলন হল যাদের, পরমব্রহ্মের মহা নিদ্রা পর্যন্ত তাঁদের আর বিচ্ছেদ হবে না। কঠিন হোক তোমাদের আত্মা অপরিবর্তনীয় আনন্দ সহ্য করার মতো। শক্তিমান তোমরা ধৈর্য দিয়ে বাধ্য করেছ দেবতাদের।" তাঁদের দুজনকে রেখে চলে গেল তাঁরা। তারপর পুরূরবা আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন তাঁকে, প্রচণ্ড উল্লাসে অনুভব করলেন উর্বশীর স্বর্ণবক্ষ। প্রেম তৃপ্ত হল তার মধুর স্বর্গে।

উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যান নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ বিরচিত ইংরেজি কাব্য 'উর্বশী'-ই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বলা যায়। জায়া জননীত্বের দ্বন্দ্ব সমস্যার যে সম্ভাবনা এই উপাখ্যানে আছে একমাত্র তাই বাদ পড়েছে এই কাব্যে। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর 'কালিদাস' নামক ইংরেজি আলোচনা গ্রন্থে বিক্রমোর্বশী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—Urvasie's finest character however is her sincerity in passion and affection[১৮] 'আয়ুকে নিজের কাছে রাখলে শিশু এবং পুরূরবা উভয়কেই হারাতে হত।' রাজসভায় আয়ুকে দেখে তাঁর মাতৃ স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়েছিল স্তনের নীরব দুগ্ধ ক্ষরণে[১৯] ইত্যাদি। এই বিষয়টি হিন্দী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি রামধারী সিং দিনকর তাঁর 'উর্বশী' নামক কাব্যনাট্যে আশ্রয় করেছেন।

এখানে যেমন ঋগ্বেদের প্রাকৃতোদ্ভব আখ্যানের আভাস আছে তেমনি যজুর্বেদের যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালক অরণিদ্বয় ও তাদের মন্থন জাত অগ্নির নাম মূলক আখ্যানাভাসও আছে।

যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণে ইত্যাদি বৈদিক সাহিত্যে এবং কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়মে এই কাহিনীর যে রূপ পাওয়া যায় সে সব স্বীকরণ করে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাব্য কাহিনীটি গড়ে তুলেছেন। কিন্তু চতুর্থ সর্গে শ্রীঅরবিন্দের মৌলিক প্রতিভা ব্যক্ত হয়েছে অপূর্ব কাব্য সুষমায়। পুরূরবা কেবল বীর নৃপতি

১৮। Kalidas by Sri Aurobindo. British Centenary Library, vol 3, p 280।

১৯। তদেব p 236।

নন তিনি কবি অবশেষে সাধক। সেই সাধক চিত্তের চির অম্বিষ্ট যে নৈর্ব্যক্তিক জ্যোতির্ময় প্রেমের দিব্যানুভূতি, উর্বশী তারই প্রতীক। চিরকালের জন্য সেই প্রতীতিকে আপন হৃদয়ে লাভই পুরূরবার চির আলিঙ্গণাবদ্ধ উর্বশী। এখানে কাব্যের সমাপ্তি। অপূর্ব কাব্য নির্মাণ প্রতিভায় সুচিত্রিত। এই অব্যক্ত ভাবাদর্শ নায়ক নায়িকা রূপে উর্বশী ও পুরূরবা এই দুই প্রতীক চরিত্রের মধ্য ব্যক্ত এবং তাঁদের মানবিকতার আবেদন শেষ পর্যন্ত কাব্যটিতে থেকেই যায় এবং বোধ হয় এখানেই কাব্যটির শ্রেষ্ঠতা। যদিও তিলোত্তমা আগেই জানিয়েছেন—নারী বিদেহী (অদৃশ্য) পরমানন্দ না হলে এবং পুরুষ রহস্যময় না হলে নর অপ্সরীর প্রেম সম্ভব নয়। প্রেম মানেই দিব্য চেতনা—স্বর্গের অপ্সরী রহস্যময় পুরুষ বিদেহ উপলব্ধিতেই তাকে লাভ করতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ উর্বশী কাব্যের প্রথম সর্গে তাঁর প্রাকৃতিক স্বরূপ উপস্থিত করেছেন। সেখানে তিনি মূর্তিমতী উষা—জীবন জননী তথাপি কুমারী। তাঁর মধ্যে মানবীত্ব যতই প্রস্ফুটিত হোক পুরূরবা তাঁকে অনুভব করেছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সার রূপে। কোমল সন্ধ্যার মতো, মেঘে, জ্যোৎস্নায় তারার আলোয় প্রত্যক্ষ ক'রেছেন তাঁর সৌন্দর্য।[২০]

দ্বিতীয় সর্গে তিলোত্তমা পুরূরবাকে বলেছেন—অপ্সরারা সমুদ্রের মতো অসীম সত্তা, সুরভিত বায়ুর মতো. সুন্দর আলোর মতো, জলের মতো অনায়ত্ত। অসংযত আত্মসমর্পণেও থাকে পবিত্র। পৃথিবীর পরে প্রকৃতির ধৈর্যশীল পথে তারকাদের পরিশ্রমী পথে আমরা ভরে দিই পবিত্র কামনায়, ছুঁয়ে দিই আনন্দে তাই তারা চলে প্রভূত সৃষ্টিশীল বেদনায়।[২১]

গভীর প্রেমে আবিষ্ট পুরূরবা দান্তের ভাষায় বলেছেন—কে তুমি শক্তিশালী দেব আবদ্ধ করেছ আমারে আগ্নেয় বাহুতে।[২২] এই গভীর প্রেমে এসে মিলে

২০। Urvasie, Cento I, ll 36, p 190।

২১। তদেব Canto II, ll 250-260।

২২। Oh thou strong god,

Who art thou graspest me with thy hands of fire,

Canto I, ll 76-77।

গেছে পুরূরবার সৌন্দর্য বোধ, পবিত্রতা, অধ্যাত্ম চেতনা—বসন্ত কম্পিত শস্যক্ষেত্র সব কিছু সুন্দর এসে এক হয়ে যায় তাঁর বক্ষে তাঁর আয়ত দৃষ্টিতে।[২৩]

তৃতীয় সর্গে রাজসভায় কবিদের বন্দনাগীতে উর্বশী ও পুরূরবার অরণি স্বরূপের অনুসরণ। যজ্ঞের আগুনের প্রজ্বালক তাই তারা যজ্ঞের জনক জননী। তরুণ কবি গেয়েছেন—

পুরূরবা পৃথিবীকে করেছে স্বর্গ
স্বর্গ হয়েছে পৃথিবী উর্বশী বিনে ইত্যাদি

একজন অপ্সরী আকাশ কন্যা আর একজন পৃথিবী পুত্র। পুরূরবার পিতা নাই মাতা নাই উর্বশীর। এখানে পাই পৌরাণিক আখ্যান।

চতুর্থ সর্গে উর্বশীর তিরোভাবের পর তাঁয় অনুসন্ধানে পুরূরবা স্তব্ধ হিমালয়ের উচ্চ শিখরে দীর্ঘকাল রইলেন ধ্যানমগ্ন—উর্বশীর চিন্তায় বিলীন। উর্বশীকে ফিরে পাবার জন্য পুরূরবার এই দুশ্চর সাধনা অধ্যাত্ম সাধনাই। রাজ্যপাট ছেড়ে তুষারাবৃত হিমালয় শিখরে ধ্যান নিমগ্নতা আর যাই হোক বাসনা ক্লিষ্ট দেহজ প্রেমের জন্য হতে পারে না। তপস্যাপূত কামনা-বাসনা রিক্ত এই পুরূরবা দেবী সরস্বতীর—যিনি বিশ্ব সৌন্দর্যের উৎস—হাত থেকে জ্ঞানবাপীর এক গণ্ডুষ জল পান করে হলেন শ্রদ্ধাত্মা, লাভ করলেন পার্থিবতা মুক্ত জ্যোতির্ময় অমরত্ব। এবং বাঞ্ছিত লোকে চিরকালের জন্য লাভ করলেন সেই জ্যোতির্ময় নৈর্বাক্তিক ভূমানন্দ প্রেম—উর্বশীর চির আলিঙ্গন। দণ্ডী উপাখ্যানে যেমন উর্বশীকে ব্রহ্মানন্দের সমতুল্য বিবেচনা করা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের কাব্যেও তেমনি দিব্যপ্রেমের বিভা ব্রহ্মানন্দ রূপে উর্বশীকে উপস্থিত করা হয়েছে।

২৩। তদেব Canto II, ll 290-293।

॥ কবি রামধারীসিং 'দিনকর' বিরচিত উর্বশী নাট্যকাব্য ॥

বিহারের বিখ্যাত হিন্দী কবি রামধারী সিংহ 'দিনকর' 'উর্বশী' নামে একটি নাট্যকাব্য লিখে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। এটিও কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের আদলে রচিত। শ্রীঅরবিন্দের মতো তিনিও উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানের বিবিধ বৈদিক অবৈদিক রূপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই উপাখ্যানকে তিনি রূপকাখ্যান রূপে গ্রহণ করেছেন। দিনকরজী তাঁর নাটকে পুরূরবাকে সনাতন পুরুষের এবং উর্বশীকে সনাতন নারীর প্রতীক রূপে উপস্থিত করেছেন। "মেরী দৃষ্টিমে পুরূরবা সনাতন নরকা প্রতীক হ্যায় ঔর উর্বশী সনাতন নারীকা।" নর ও নারীর শাশ্বত আকর্ষণের মধ্যে যে অনির্বচনীয় প্রেমের জন্ম নেয় এই নাটকে সেই ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের রহস্যানুসন্ধান। কবি গ্রন্থের ভূমিকায় এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।—'নারীকে ভিতর এক ঔর নারী হ্যায়। ইস নারীকা সন্ধান পুরুষ তব পাতা হ্যায় জব্, শরীরকে ধারা উছালতে উছালতে উসে মনকে সমুদ্রমেঁ ফেঁক দেতী হ্যায় জব দৈহিক চেতনাসে পর ওহ্, প্রেমকা দুর্গম সমাধি সে পঁহুচ কর নিস্পন্দ হো জাতা হ্যায়।' আবার পুরুষের ভিতরও আর এক পুরুষ আছে যে শারীর অস্তিত্বের মধ্যে নিবদ্ধ নয়, যার সঙ্গে মিলনের আকুলতায় নারী দেহ চেতনার পরপারে পৌঁছতে চায়। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয় লোকের স্পর্শই হচ্ছে প্রেমের এই আধ্যাত্মিক মহিমা। দেশ আর কালের বন্ধন থেকে বাইরে বেরোবার এক পথ হচ্ছে যোগ। আর দ্বিতীয় পথ উপলব্ধ হয় নরনারীর প্রেমের ভিতর দিয়ে। দিনকরজী বলেছেন যে—'মানুষের এই ধারণা অত্যন্ত প্রাচীন। তন্ত্র সাধনার মূলে সম্ভবত এইরূপ কোন না কোন বিশ্বাস আছে।' দিনকরজীর মতে মনু ও শ্রদ্ধার সন্তান কন্যারূপে জন্ম নেয় কিন্তু মনুর পুত্রাকাঙ্ক্ষার জন্য বসিষ্ঠ তাঁকে পুত্রে রূপান্তর করেছেন। তাঁর নাম হয় সুদ্যুম্ন। একবার শিকার করতে গিয়ে এক অভিশপ্ত বনে ঢুকে পড়ে তিনি যুবতী নারীতে পরিণত হন, নাম হয় ইলা। এই ইলার পুত্র পুরূরবা। আর উর্বশী সমুদ্র মন্থনজাত। আবার উর্বশী নারায়ণ ঋষির উরু থেকে জাত এই পরিচয়ও দিনকরজী উল্লেখ করেছেন। ভগীরথের জানুর উপর উপবেশনের কামনার জন্য গঙ্গারও এক নাম উর্বশী।

বদরীধামে যে দেবীপীঠ আছে তার নামও উর্বশীতীর্থ। কিন্তু দিনকরজী পুরূরবা ও উর্বশীকে শাশ্বত নর ও নারীর প্রতীক রূপেই গ্রহণ করেছেন। আমরা যজুর্বেদে উত্তরারণি ও অধরারণির নাম হিসেবে এই দুটি নামকে আদি পুরুষ ও নারীর নাম বলেই সিদ্ধান্ত করেছি।[২৪] অবশ্য তিনি এর নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। দিনকরজী মনু এবং ইড়া, পুরূরবা এবং উর্বশী এবং উভয় আখ্যানকেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কর্তব্য পক্ষ ও ভাবনা পক্ষ বলে অভিহিত করেছেন।[২৫] তিনি স্যার উইলিয়াম উইলসনের অনুমানের কথাও উল্লেখ করেছেন—ইস কথা কা বাস্তবিক নায়ক ঔর নায়িকা সূর্য উষা হ্যায় ইন দোনো কা মিলন কুছহি কালকে লিয়ে হোতা হ্যায়, বাদমেঁ ওয়ে বিছুড় জাতে হ্যায়।[২৬]—(এই কাহিনীর বাস্তবিক নায়ক সূর্য আর নায়িকা উষা। এদের দুজনের মিলন কিছুক্ষণের জন্য হয় তার পর তারা বিচ্ছিন্ন হয়।) দিনকরজীর উর্বশী নাটকের আখ্যানও কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'র কাহিনীর উপর স্থাপিত।

নটী ও সূত্রধর প্রতিষ্ঠানপুরে রাজা পুরূরবার উদ্যান থেকে দেখছে স্বর্গ থেকে অপ্সরাদের অবতরণ। জ্যোৎস্নালোকে অপ্সরাদের নৃত্যগীতান্তে আলাপন। সহজন্যা জানালেন কুবেরের বাড়ি থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে এক দৈত্য অপহরণ করে নিয়ে যায় উর্বশীকে। চিৎকার শুনে এক পরমসুন্দর বীর রাজা এসে তাকে উদ্ধার করেন। তাঁর দুর্লভ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছে উর্বশী—যিনি নন্দন বনের উষা, সুরপুরের কৌমুদী, ইন্দ্রের মনের কামনা, সিদ্ধ সাধক চিত্তের আকর্ষক, দেব শোণিতে কামানল, রতির প্রতিমূর্তি, লক্ষ্মীর প্রতিমা, বিশ্বময় মানবমনের তৃষ্ণা। তার দুর্নিবার প্রেমের টানে উর্বশা স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে যাবার জন্য ব্যাকুল। উর্বশী কি তা হলে মর্ত্যের সহস্র ব্যথা সয়ে থাকবে। মর্ত্যের প্রেম তো অপ্সরীর জন্য নয়। এখানে যে প্রেম করে তাকে যে মা হতে হয়। এখানে যে রোগ, শোক, জরা, সন্তাপ আছে। এমন সময়

২৪। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৫। উর্বশী—ভূমিকা খ। রামধারী সিং দিনকর। উদয়াচল, আর্যকুমার 1961।

২৬। তদেব।

চিত্রলেখা প্রবেশ করে জানালো যে, সে ব্যাকুলা উর্বশীকে সাজিয়ে পুরূরবার উপবনে রেখে এসেছে। সেখানে রানী ঔশীনরী ব্রত সমাপন করে গেলেই পুরূরবা মিলিত হবেন উর্বশীর সঙ্গে। মেনকা সংশয় প্রকাশ করেন যদি রাজা তরলচিত্ত হন? চিত্রলেখা জানালেন যে, সে শঙ্কা নেই কারণ রাজাও গভীর প্রেমে নিমগ্ন। তিনি রাজাকে স্বগতোক্তি করতে শুনেছেন—নীতি, ভীতি, সংকোচ, শীল, বিবেচনার মানে নেই—উর্বশীকে ফেলে আসা ঠিক হয় নাই। "উর্বশী হচ্ছে সেই দর্পন যাতে প্রকৃতি আপন রূপ দেখে, সে সেই সৌন্দর্য, শিল্প যার স্বপ্ন দেখে। উর্বশী তো নারী নয় নিখিল ভুবনের আভা, রূপ নয় স্রষ্টার মনের নিষ্কলুষ কল্পনা।"

দ্বিতীয় অঙ্কের গোড়াতে মহারানী ঔশীনরীকে সহচরী নিপুণিকা বিজ্ঞাপন করে যে ব্রতান্তে সেদিন আশ্বস্ত হৃদয়ে মহারানী চলে আসবার পরই স্বর্গের অপ্সরী উর্বশী রাজ সমীপে উপস্থিত হন। পুরূরবা উর্বশীকে নিয়ে গেছেন প্রমোদবন গন্ধমাদনে। মন্ত্রীকে বলে গেছেন এক বছর পর ফিরে এসে নৈমিষেয় যজ্ঞ করবেন।

তৃতীয় অঙ্কে গন্ধমাদনে পুরূরবা আর উর্বশীর প্রেমালাপ, পুরূরবার প্রেম-কামনা জ্ঞাপনের উত্তরে উর্বশী বলেন—'আমি কি অন্ধকারের প্রতিমা? যতক্ষণ তোমার হৃদয় তিমিরাচ্ছন্ন ততক্ষণই সেখানে আমার রাজত্ব? আর যেদিন তোমার হৃদয়ের প্রদীপ নিভে যাবে সেদিন তুমি আমাকে ত্যাগ করবে, প্রভাতে যেমন ফেলে দেয় রজনীর মালা? এ কেমন দ্বিধা ফুলের দেহ ত্যাগ করে দেহধর্মী পুরুষ আকাশে উড়ে যাওয়া গন্ধের জন্য লোলুপ হয়? শারীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে মন তোমার কোথায় উড়ে যেতে চায়?'

পুরূরবা জানালেন যা দৃষ্টির পেয় তা রক্তের ভোজ্য নয়। মনের গহনে গুহ্য লোকে—যেখানে রূপের লিপি অরূপের ছবি আঁকে, আর পুরুষ নারীর মুখমণ্ডলে কোন দিব্য অব্যক্ত কমলকে নমস্কার করে। উর্বশী বললেন—আমরা ত্রিলোকবাসী ত্রিকালের একাকার এক অর্ণব সম্পৃক্ত সব ঢেউ, কণা, অণুতে সাঁতরাচ্ছি। কাল-রন্ধ্র ভরা রয়েছে আমাদের শ্বাসের সৌরভে। অন্তর্ণভের এই প্রাণের প্রসার, এই পরিধিভঙ্গ সুখের, এই অপার মহিমার আশ্রয় কোথায়?

পুরূরবা জানালেন—মহাশূন্যের অন্তর্গৃহে অদ্বৈত ভবনে পৌঁছালে দিন কাল সব এক হয়, কোন ভেদ থাকে না। যাঁর ইচ্ছার প্রসার ভূতল, পাতাল গগন। যাঁর লীলায় আকাশে ছুটছে অনন্ত গোলোক, যাঁর ইচ্ছায় অগণিত সূর্য, সোম, অপরিমিত গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে নারী হয়ে যিনি নিজেই পুরুষকে উদ্বেলিত করেন, আর সেই বিধাতা যিনি নারীহৃদয়ের পুষ্পে কান্তিমান হয়ে ওঠেন।

বিস্মিত উর্বশী প্রশ্ন করেন—কে তুমি পুরুষ ?

—যে বহু কল্প ধরে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বারে বারে মরণ সাগর পার হয়।

—আমি কে ? পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন উর্বশী।

—তা বলতে পারব না, তবে তুমি যখন এসেছ তখন সব কিছু সুন্দর বলে মনে হয়েছে।[২৭]

চতুর্থ অঙ্কে চ্যবন মুনির আশ্রমে মহর্ষির স্ত্রী সুকন্যার কোলে উর্বশীর নবজাত পুত্র—স্বর্গ আর মর্তের পরিণয় ফল। চিত্রলেখার সঙ্গে কথোপকথন থেকে জানা গেল যে উর্বশী মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে এসেছিলেন সন্তান প্রসবের জন্য, তখন মহর্ষি দেখেছিলেন তাঁর কত মমতা। নারী হচ্ছে সেই সেতু যার উপর দিয়ে অদৃশ্য জগৎ থেকে সব মানবসন্তান, সব প্রাণের আগমন হয় পৃথিবীতে। সত্য কথা বলতে প্রজাসৃষ্টিতে পুরুষের কতটুকু ভাগ ?

এতো নারীই যে সমস্ত যজ্ঞ পূর্ণ করে, অস্তিত্বের ভার বহন করে, সন্তানের জন্ম দেয়। আর সেই শিশুকে নিয়ে যায় উচ্চমনের নিলয়ে যেখানে আছে নিরাপদ সুখদ কক্ষ—শৈশবের দোলা।[২৮]

উর্বশী মাঝে মাঝে এসে পুত্রমুখ দেখে যায়। পরদিন থেকেই সে আর আসতে পারবে না কারণ স্বামী আর তাকে মুহূর্তের জন্য দূরে যেতে দেবেন না। উর্বশী খেদ করে পুত্রের মুখ দেখাতে পারছেন না আবার পুত্রের জন্য

২৭। উর্বশী পৃঃ 71।

২৮। তদেব পৃঃ 116।

পারছেন না স্বামীপ্রেম ত্যাগ করতে।[২৯]

যেই স্বামীর দৃষ্টি পড়বে আপন গর্ভজাত পুত্রের উপর অমনি ভরতের অভিশাপ নেমে আসবে। উর্বশীকে চিরতরে চলে যেতে হবে স্বর্গে। চিত্রলেখা বলেন—ভরতের অভিশাপের শঙ্কা বুকে নিয়ে বাস করে লাভ কী? আর অপ্সরা কবে সন্তান পালন করে? কিন্তু মর্ত্যভূমির প্রেমে আবদ্ধ উর্বশী রাজী নয় তখনই তা ছেড়ে যেতে। তাঁর খেদ—পুত্র এবং পতি নয়, পুত্র অথবা কেবল পতি--কি দুঃসহ, দারুণ অভিশাপ?

পঞ্চম অঙ্কে উপসংহার। রাজসভায় আসীন বিষণ্ণ পুরূরবা তাঁর স্বপ্নের কাহিনী বিবৃত করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন কোথা থেকে লোক এসে প্রতিষ্ঠানপুরে এক বটগাছ লাগিয়ে তাতে জল সেচন করছে। রাজাও তাতে সেচন করছেন দুধ। তার পর এক হাতী চড়ে প্রতিষ্ঠানপুর ছেড়ে রাজা প্রবেশ করেছেন এক বনে। দেখলেন চারদিক শূন্য, হাতীও ছেড়ে চলে গেছে। রাজা গিয়ে পৌঁছলেন চ্যবন আশ্রমে। চ্যবনাশ্রমের কথা শুনে চমকে ওঠেন উর্বশী। পুরূরবা সেই আশ্রমে ধনুর্ধারী এক বীর ঋষি কুমারকে দেখতে পান। ব্যাকুল হৃদয়ে তার কাছে যেতেই সব কিছু শূন্যে মিলিয়ে গেল। এদিকে ওদিকে সর্বত্র দেখলেন প্রিয়া উর্বশীর মুখ—ডালে, পাতায়, ফুলে—অথচ ছুঁতে গেলেই মিলিয়ে যায়। চকিত বিস্ময়ে তিনি যেন হঠাৎ উড়ে গেলেন আকাশে, ভাসতে লাগলেন খণ্ড মেঘের মতো।

রাজজ্যোতিষী বিশ্বমনা গণনা করে বললেন—'হে রাজন্ আজ সন্ধ্যার মধ্যে আপনি আপনার বীরপুত্রকে রাজ্যপাট রাজমুকুট দিয়ে প্রব্রজিত হবেন, কিন্তু কোথায় আপনার পুত্র?'

উর্বশী তখন আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বললেন অভিশাপের কথা। আয়ুকে নিয়ে তখন প্রবেশ করলেন সুকন্যা। রাজা কুশল প্রশ্ন করলেন। সুকন্যা প্রত্যভিবাদন করে উর্বশীকে বললেন—'ঋষি হঠাৎ আজই দিন থাকতে থাকতে কুমারকে পিতামাতার কাছে পৌঁছে দেবার আজ্ঞা করেছেন তাই আগে

২৯। ননো পুত্রকে লিয়ে স্নেহ স্বামী কা ত্যাজসকৃতি হুঁ
কৌন পুরন্ধ্রী ত্যাজ সকতী হ্যায় পতিকে লিয়ে তনয়কো।

খবর না দিয়েই আসতে হল। ষোল বছর আগে যাকে তুমি রেখে এসেছিলে আজ তাকে ফিরিয়ে দিলাম।'

আয়ুকে বলতে সে প্রথমে উর্বশী ও পরে পুরূরবাকে প্রণাম করল। পুরূরবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দিত রাজা রাজকোষ খুলে দেবার আজ্ঞা দিয়ে উর্বশীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কবে জন্মাল? একে লুকিয়েই বা রেখেছিলে কেন?

উত্তর দিলেন উর্বশী—দেব আজ থেকে ষোল বছর আগে আপনি যখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য যজ্ঞীয় জীবন যাপন করছিলেন তখন চ্যবনাশ্রমে আয়ু জন্মগ্রহণ করেছে।

পুরূরবা সভাসদদের বললেন যে এই পুত্রকেই তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন করতেই উর্বশী অদৃশ্য হলেন। মহামাত্যের চিৎকারে রাজা বললেন—কোথায় আর যাবে হয়ত গেছে উপবনে।

সুকন্যা বললেন—অন্বেষণ বৃথা, স্বর্গ-কন্যা উর্বশী স্বর্গে ফিরে গেছেন। যখন তিনি আপনার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন তখন মহর্ষি ভরত এই শাপ দিয়েছিলেন—'যার চিন্তায় লীন হয়ে নিজ কর্ম ভুলে গেছ, যাও সেই মর্ত্য-মানবের প্রেয়সী হয়ে ভূতলে থাক গিয়ে। কিন্তু গৃহস্থ নারীর সব সুখ তোমার সুলভ হবে না। পুত্র আর পতি নয়, পুত্র বা কেবল পতিই তুমি পাবে তাও ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ রে অহংকারিনী তোর স্বামী তোর গর্ভজাত সন্তানের মুখ না দেখবে।'

পুরূরবা ধনুর্বাণ নিয়ে উদ্যত হলেন স্বর্গ থেকে উর্বশীকে উদ্ধারের জন্য। এমন সময় দৈববাণী হল—'এ বিষ তোমাকে পান করতে হবে। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে কোন কল্যাণ হবে না।'

পুরূরবা পুরোহিত আহ্বান করে আয়ুর রাজ্যাভিষেক করিয়ে বিদায় নিয়ে বনে চলে গেলেন সন্ন্যাসজীবনে।

বিখ্যাত কবি রামধারীসিংহ 'দিনকর' রচিত 'উর্বশী' নাটকটিকে ঠিক প্রতীকি বা রূপক নাটক বলা যায় না। উপাখ্যানও মৌলিক নয়। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী অবলম্বনে রচিত নাট্যকাব্য বলাই সঙ্গত যদিও এই

নাটকের সর্বত্র সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা বা প্রতীকাভাস দৃষ্টিগোচর হয়। দিনকরজী বিভিন্ন বৈদিক অবৈদিক পুরাণাদি থেকে যে সমস্ত উদ্ধৃতি উদ্ধার করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, এ বিষয়ে তিনি তাবৎ কাহিনীর সঙ্গে সুপরিচিত। কিন্তু সে সব কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা নয় এক নতুন তাৎপর্যবহ নাটক রচনাই তাঁর উদ্দেশ্য। উর্বশীকে তিনি সমুদ্রমন্থন-জাতা অপ্সরীদের অন্যতমা যেমন বলেছেন তেমনি তাকে নারায়ণ ঋষির উরু জাত বলেও উল্লেখ করেছেন। আবার তিনি উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানকে বৈদিক তাৎপর্য অনুযায়ী সূর্য-উষা প্রণয় কাহিনী বলেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার জন্য সাক্ষী মেনেছেন উইলিয়াম উইলসনকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তাৎপর্যের প্রথম বক্তা আচার্য ম্যাক্স ম্যূলর এমনকি প্রাচীন ভারতের ভাষ্যকারেরাও এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এবশ্য এই বৈদিক তাৎপর্য তিনি তাঁর কাহিনীর জন্য গ্রহণ করেন নি। বলেছেন—'কিন্তু ইস কথা লেনে সে ম্যায় বৈদিক আখ্যান কা পুনরাবৃত্তি অথবা বৈদিক প্রসঙ্গ কা প্রত্যাবর্তন মেরা ধ্যেয় নহী।'

আবার তিনি উর্বশী পুরূরবার নতুন তাৎপর্যও খ্যাপন করেছেন। তার মতে 'উর্বশী শব্দ কা কোষগত অর্থ উৎকট অভিলাষ, অপরিমিত বাসনা, ইচ্ছা অথবা কামনা।' এই অর্থ তিনি কোন কোষকারের থেকে পেয়েছেন জানি না। শব্দকল্পদ্রুমের মতো অর্বাচীন কোষেও কিন্তু এই অর্থ নেই। তিনি আরো বলেছেন—'উর্বশী, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, ত্বক তথা শ্রোত্র কো কামনায়োঁ কা প্রতীক হ্যায়। পুরূরবা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ঔর শব্দ মে মিলনেবালে সুখোঁ সে উদ্বেলিত মনুষ্য।' এই প্রতীকী ব্যাখ্যা তাঁর কাব্যের পক্ষেও কতটা প্রযোজ্য তা বিবেচনার বিষয়। কেননা উর্বশী ও পুরূরবা একমাত্র তৃতীয় অঙ্কের সংলাপে ছাড়া অন্যত্র পৌরাণিক বিশেষত কালিদাসীয় রূপ অতিক্রম করে চিরন্তন প্রেমিক প্রেমিকা রূপ লাভ করতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

অপ্সরীরা উর্বশীর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন—

উর্বশী উষা নন্দনবন কী
সুরপুর কী কৌমুদী কলিত কামনা ইন্দ্রকে মন কী
সিদ্ধ বিরাগী কী সমাধি মেঁ রাগ জগানে বালী

দেবোঁ কে শোণিত মেঁ মধুময় আগ লগানেওয়ালী
রতি কী মূর্তি, রমা কী প্রতিমা, তৃষা বিশ্বময় নর কী
বিধুকী প্রাণেশ্বরী আরতি শিখা কামকে কর কী ?

এই উক্তি এবং প্রারম্ভের কামমাহাত্ম্য মূলক ঋগ্বেদ, মনু মহাভারত, পদ্ম, শিব পুরাণের উদ্ধৃতি থেকে একথা মনে করা স্বাভাবিক তিনি রবীন্দ্রভাবনানুযায়ী উর্বশীকে পুরুষের কামবাসনার প্রেরণাদায়িনী নারী রূপের মাধুর্য রূপে চিত্রিত করেছেন যা শেষ পর্যন্ত প্রেমে পরিণতি লাভ করে। উর্বশী সেই নারীরূপের পরাকাষ্ঠা, যে দর্পণে প্রকৃতি আপন রূপ প্রত্যক্ষ করে—

দর্পণ জিসমেঁ প্রকৃতি রূপ অপনা দেখা করতী হ্যায়।
ওহ সৌন্দর্য, কলা জিসকা সপনা দেখা করতী হ্যায়।
নহী উর্বশী নারী নহীঁ আভাহৈ নিখিল ভুবন কী।

সে রূপসী নারী যা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ চিত্র—

রূপসী নারী প্রকৃতি কা চিত্র হ্যায় সবসে মনোহর।

দেহ প্রেমের জন্মভূমি কিন্তু তার একমাত্র লীলাভূমি নয়, নয় তা সীমিত রক্ত মাংস পর্যন্ত। 'নিধি মেঁ জল, বনমে হরীতিমা জিসকা ঘনাবরণ হ্যায়। রক্ত মাংস বিগ্রহ ভঙ্গুর ইয়ে উসী বিভাকে পট হ্যায়।'

তারপর উপসংহারে তিনি উর্বশীর মধ্য দিয়ে নারীহৃদয়েয় প্রিয়া ও জননীর শাশ্বত দ্বন্দ্বকে সুন্দর তুলে ধরেছেন। নারীই ত বিশ্বপ্রাণের ধাত্রী। অথচ তার সমস্যা—

পুত্র আর পতি নয় পুত্র বা কেবল 'পতিপাযোগী'

কিন্তু—

ননো পুত্র কে লিয়ে স্নেহ স্বামীকা ত্যজ সকতী হুঁ
কৌন পুরস্ত্রী ত্যজ সকতী হ্যায় পতিকে লিয়ে তনয়কো।

পুরুষ তার কামনায় প্রিয়তমা নারীর মধ্যে খুঁজে পায় স্বর্গের অপ্সরা কিন্তু সন্তানের মুখ দেখলে দেখতে পায় জননীর, সুন্দরী প্রিয়ার স্বর্গসুষমা পলায়ন করে কোন দূর লোকে। রমণীহৃদয়ের এই শাশ্বত বেদনা উর্বশীতে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন দিনকরজী যা সর্বজনীন নারীচিত্তের বেদনাকে স্পর্শ করেছে।

॥ উপসংহার ॥

সুদীর্ঘ প্রায় চার হাজার বছর ধরে উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানের উদ্ভব ও বিকাশের এই ইতিহাস পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট রীতি অনুষ্ঠান ও রচনাবলী বিশ্লেষণ করে আমরা যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তার আভাস বিভিন্ন অধ্যায়ে দেওয়া হলেও স্বতন্ত্র ভাবে সেই সব নিষ্কর্ষ এখানে সন্নিবিষ্ট হল।

আদিম মানব সমাজে অস্তিত্বের প্রয়োজনে যে সব অনুষ্ঠান ক্রিয়া গড়ে উঠেছিল এই উপাখ্যানের সূত্রপাত সেখানে। আগুনের ব্যবহার প্রচলনের কিছু পরেই সম্ভবত অরণি মন্থনে অগ্নি উৎপাদনের কৃত্যাদি উদ্ভূত হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আদিম সমাজে এই কৃত্যাদি প্রচলিত ছিল। সর্বত্রই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠ খণ্ডদ্বয় বা অরণিদ্বয় পুরুষ ও নারী রূপে অভিহিত হত এবং অরণি মন্থণকে তুলনা করা হত মৈথুনের সঙ্গে। আর মন্থন জাত আগুনকে বলা হত তাদের সন্তান বা শিশু। মনে হয় তার থেকে এদের সম্পর্কের কল্পনাও করা হত। ভারতীয় আর্যরা এই দুই অরণির উপরেরটিকে নাম দিয়েছিলেন উত্তরারণি, পুরুষ বা পুরূরবা এবং নিচেরটি বা অধরারণির নাম নারী বা উর্বশী এবং তাদের সন্তান বা জাত অগ্নির নাম ছিল আয়ু। দেখা যাচ্ছে যজুর্বেদের কোন মন্ত্রে কেবল অরণিদের নাম পুরূরবা ও উর্বশী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারা জাত অগ্নিকে আয়ু বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং মন্থন করার অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের সঙ্গে সম্পর্কের কোন উল্লেখ নাই[৩০]। পক্ষান্তরে কাঠক সংহিতায় সংকলিত মন্ত্রে উর্বশীকে মা বা আয়ুর গর্ভধারিণী এবং পুরূরবা পিতা বলে এবং আয়ুর বা অগ্নির জন্মের জন্য মন্থনের অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।[৩১]

বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রে এই নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্যই উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানটির অবতারণা করা হয়েছে। মৈথুন থেকে সন্তান জন্মায় এই ঘটনাকে আদিম মানুষের অলৌকিক বলে মনে হত। অরণি মন্থন থেকে যেহেতু আগুন জ্বলে সুতরাং সেই আগুনেও নিশ্চয় এই অলৌকিক শক্তি

৩০। শুক্লযজুর্বেদ, বাজসনেয়িসংহিতা, মাধ্যন্দিনশাখা ৫।২।

৩১। কাঠক সংহিতা ৬।৭।২।

আছে। তাই পবিত্র অগ্নি মন্থন ক্রিয়া দ্বারা প্রজ্বলিত আগুনে আহুতি দিয়ে বাঞ্ছিত ফল লাভের জন্য অভীষ্ট দেবতাকে আহ্বান করে বাধ্য করা হত। তাই যজ্ঞ। পশু বৃদ্ধি এবং মানুষ বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ ছিল তাদের কৃত্য যা সদৃশ যাদুর অন্তর্গত। আগুন ছিল স্বর্গে, তাকে মর্তে এনেছেন পুরূরবা কারণ পুরূরবাই উত্তরারণি। মহাভারতে আছে যে তিনি যজ্ঞ কার্য নির্বাহের জন্য স্বর্গ থেকে ত্রিতাগ্নি ও উর্বশীকে এনেছিলেন।[৩২] সম্ভবত সমকালে যাদু ও প্রাণবাদী ধারা গড়ে ওঠে সৃষ্টির তাবৎ বস্তু এবং প্রাকৃতিক ঘটনা ও বস্তুর পিছনে প্রাণের অস্তিত্ব ও তদনুকূল ক্রিয়ার কল্পনাই এই ভাবধারার মূল কথা। এই প্রেরণাতেই গড়ে উঠে দেববাদ। বৈদিক দেব-দেবীর প্রাকৃত স্বরূপ খুব অস্পষ্ট নয়। সারা পৃথিবীতে যেখানে আদিম মানব সমাজের অগ্রগতি ঘটেছে সেখানেই আমরা প্রাকৃতিক দেব কল্পনা এবং প্রাকৃতিক ঘটনার দেব কাহিনীর প্রচলন দেখতে পাই। তৃতীয় অধ্যায়ে অতিকথা মূলক ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে আদিম মানুষের সবচেয়ে বড় বিস্ময় এবং বড় ঘটনা সূর্যের উদয় ও অস্ত—দিন ও রাত। তাই এই ঘটনা নিয়ে কাহিনী অধিকাংশ প্রাচীন জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এই ধারা অনুযায়ী সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হবার আগেই ভারতোরোপীয় আর্য ভাষীদের মধ্যে সূর্য উষা প্রণয় কাহিনী গড়ে উঠেছিল। অগ্নি প্রজ্বালক অরণি দুটির নাম নিয়ে অথবা স্বতন্ত্রভাবে সূর্য উষাকে পুরূরবা ও উর্বশী নামে অভিহিত করা হয়/ কিংবা মনে হয় পুরূরবা এবং উর্বশী মূলত আদি নর এবং নারী হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। অগ্নি প্রজ্বালক অরণি দ্বয়ের সম্পর্কে এবং সূর্য উষা প্রণয় কাহিনী মিলে গড়ে ওঠে উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যান যার পূর্ণাঙ্গ রূপ আছে শতপথ ব্রাহ্মণে। এই কাহিনীতে মানবিক রূপারোপে সমকালীন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পরিবর্তিত হয়েছে যুগ থেকে যুগান্তরে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের উর্বশী-পুরূরবা নাট্য কাব্যটি এই রকম একটি মানবিক রূপ।

৩২। মহা 1।70।21।
বিষ্ণুপুরাণেও আছে

বৈদিক যুগের শেষভাগ থেকে পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত দেখা যায়। কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রে বা বৃহদ্দেবতায় অর্থাৎ সূত্রযুগের রচনায় তাই বংশ পরিচয়ের প্রয়াস দেখা যায়। এই সব সূত্র সাহিত্য খৃঃপূ ৩।৪ শতকে রচিত হয় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সুস্থিত রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। সেখানে পিতৃ পরিচয়ের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। তাই পুরূরবার জন্ম সম্পর্কে ইলাবুধের কাহিনী এসেছে। বৈদিক যজ্ঞ ও তদনুকূল কাহিনী সমূহের তাৎপর্য এবং অর্থের বিস্মৃতি ঘটেছিল অনেক আগেই। সূত্র সাহিত্যের গোড়াতে লেখা যাস্ক-এর নিরুক্তে তাই শব্দের একাধিক অর্থের নির্দেশ দেখা যায়। ফলে যে সব ক্রিয়া তাদের গুরুত্ব হারিয়েও অভ্যস্ত কৃত্যরূপে প্রচলিত ছিল তাদের যুগানুকূল ব্যাখ্যার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক উপাখ্যান ও মন্ত্রের ব্যাখ্যার যে প্রয়াস দেখা যায় তা প্রধানত শব্দের ব্যুৎপত্তি, ঐতিহ্যা-গত কিম্বদন্তী এবং সমকালীন রীতির নীতি আশ্রয়ী। কাত্যায়নের সর্বানু-ক্রমণী এবং তার ষটগুরু শিষ্যের ভাষ্যে উর্বশীর নারায়ণের উরু থেকে উদ্ভবের কাহিনী আছে। উর্বশীর সঙ্গে উরুর শব্দসাম্য থেকে এই কাহিনী কল্পনা করা হয়েছে।

বৈদিক উপাখ্যানের আদিম কৃত্য বা প্রাকৃত উৎস বিস্মৃত হলেও কাহিনী রয়ে গেছে। মানবিক কাহিনী হিসেবে পুরাণগুলিতে সেগুলি রক্ষিত হয়েছে এবং সেখান থেকে তার বিকাশ ঘটেছে সাহিত্য হিসেবে। পণ্ডিতেরা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে অতিকথা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ। পুরাণ এবং সাহিত্যের মিশ্র রচনা রামায়ণ মহাভারত। পুরাণগুলিতে দেবব্রাহ্মণ ও রাজার মাহাত্ম্য প্রচার। পুরাণে এই কাহিনী সেই প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে আশাকরি আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে। এই কাহিনী পরবর্তী কালে বিশেষত সাহিত্য ক্ষেত্রে নারী রূপের এবং নারীস্বরূপের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে এবং প্রেম রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখিয়েছি যে নারীর দেহ সৌন্দর্য বর্ণনার সূচনা রামায়ণ মহাভারত থেকে। পুরাণে তার সূচনা মাত্র। বিষ্ণু পুরাণে উর্বশীর রূপ অতিশায়িত—'সকললোক স্ত্রীকান্তি-সৌকুমার্য—লাবণ্যাতিবিলাস হাসাদিগুণম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্ম পুরাণে তাঁকে 'স্বর্গলোক বিভূষণ'

বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহাভারতে উর্বশীকে নারীরূপের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে উপস্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়।[৩৩] মহাভারতে, সত্যবতী, দ্রৌপদী, তপতী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অঙ্গনাদের রূপ বর্ণনায় অঙ্গ সৌষ্ঠবের কথা বলা হয়েছে। এই সুন্দরী কুলের মধ্যে উর্বশীও একজন—"তখন সেই পৃথুনিতম্বিনী স্বীয় নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া পার্থ ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সেই লাবণ্যবতী ললনার সুকোমল কুঞ্চিত, কুসুমগুচ্ছ শোভিত, সুদীর্ঘ কেশ-পাশ, ভ্রূবিক্ষেপ, আলাপমাধুর্য ও সৌম্যাকৃতি অনির্বচনীয় সুষমা সম্পাদন করিয়াছিল। তাহার বদন সুধাকর সন্দর্শনে শশধর লজ্জিত হইলেন। সেই সর্বাঙ্গ সুন্দরী দিব্য চন্দনচর্চিত, বিলোল হারাবলি ললিত পীনোন্নত পয়োধর যুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাঙ্গী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাঁহার ত্রিবলী দাম মনোহর কটিদেশের কি অনির্বচনীয় শোভা, তাহার গিরিবর বিস্তীর্ণ রজত রশনা রঞ্জিত নিতম্ব যেন মন্মথের আবাসস্থান ; সূক্ষ্ম বসনাবৃত অনিন্দনীয় তদীয় জঘন নিরীক্ষণে ঋষিগণেরও চিত্তবিকার জন্মে ; কিঙ্কিনীলাঞ্ছিত পাদদ্বয় কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত ; গূঢ়গ্রন্থি অঙ্গুলি সকল তাম্রবর্ণ ও আয়ততল।"[৩৪]

রামায়ণে উর্বশীকে বরুণের মনে হয়েছিল 'পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণচন্দ্রাননা।'[৩৫]

রামায়ণ মহাভারতে রমণী রূপ বর্ণনায় মুগ্ধ পুরুষচিত্তের অবধারণাত্মক যে সৌন্দর্য তা কামভাবনা জাত। তদনুযায়ী রমণীদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সৌষ্ঠব যেমন অঙ্কিত তেমনি চিত্তের আনন্দের প্রকাশ প্রকৃতির ভাণ্ডার উজাড় করে উপস্থিত করা হয়েছে। সাহিত্যে এই ধারাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। শেষ

৩৩। মহাভারতের আদিপর্বের ৭১ অধ্যায়ে ইন্দ্র মেনকাকে অপ্সরাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান বলে আহ্বান করেছেন।

৩৪। মহা—সাক্ষরতা॥ কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত দ্বিতীয় খণ্ড। বনপর্ব ৪৬ অধ্যায়, পৃঃ ৪৯-৫০।

৩৫। রামায়ণ—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুবাদিত। ভারবি ২য় খণ্ড, ৫৬ সর্গ, পৃঃ ৯৯৭।

পর্যন্ত রমণীরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমার্থক হয়ে উঠেছে। কালিদাসের কাব্যে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীরূপের এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট।

বিক্রমোর্বশী প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [৩৬] লিখেছেন—উর্বশী বিদায় কালে পুরূরবাকে বলেন 'আপনি যখন যেখানে যাইয়া স্বভাবের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন, সেইখানে উর্বশী বলিয়া ডাকিবেন—আমি পরাধীন হইয়াও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার পাশে গিয়া দাঁড়াইব। দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া স্বভাবের সৌন্দর্যের সৌন্দর্য বাড়াইয়া দিব।'

'মহারাজ পুরূরবা অনেকদিন গত হইয়াছেন, তাহার পর কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও যে স্বভাব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া উর্বশী উর্বশী বলিয়া ডাকে সে সত্য সত্যই তাহাকে দেখিতে পায়। উর্বশী কল্পনার প্রধান সঙ্গিনী, সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, কবিরা যাহাকে রস বলেন সেই রসের খর প্রস্রবণ।'

উর্বশী রূপের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণাঙ্গ প্রশস্তি ও অবধারণা পাই জৈমিনী রচিত বলে পরিচিত মহাভারতের দণ্ডী পর্বে। এই রচনা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমরা উনিশ শতকের শেষ ভাগে এর যে বাংলা অনুবাদ তার থেকে এই রূপ প্রশস্তির বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছি। এখানে পৌরাণিক রূপ-প্রশস্তির সঙ্গে আধুনিক তাত্ত্বিক অবধারণার মিলন ঘটেছে। এখানে উর্বশী একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সার সুষমা। অমৃতের অংশ সংযুক্ত বিধাতার আদর্শ সৃষ্টি আর একদিকে 'ঐ শান্তিময়ী দিব্যমূর্তি দর্শন করিলে, কাম প্রবৃত্তির ক্ষয় এবং রতিভাবের ক্ষয় হইয়া থাকে মাত্র নয় তদ্দর্শন জাত আনন্দকে ব্রহ্মানন্দ অনুভব বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৭] মধুসূদন উর্বশীকে একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সার 'ত্রিদিবের শোভা' আর একদিকে 'যথায় উর্বশী/কামের আকাশে বামা চিরপূর্ণশশী'—রূপে উপস্থিত করেছেন।

৩৬। হরপ্রসাদ রচনাবলী প্রথম সম্ভার, পৃঃ ৫৩৪।

৩৭। দণ্ডিপর্ব—শ্রীরোহিনীনন্দন সরকার বিরচিত চৌধুরি কোং ১২৯৩ পৃঃ ১১০-১১২। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় দ্রঃ।

রবীন্দ্রনাথ উর্বশীকে পুরুষচিত্তবিমোহিনী নারী রূপের বিশুদ্ধ প্রতীক রূপে উপস্থিত করেছেন। আবার মর্ত্যপ্রেমাকাঙ্ক্ষী রূপও কোথাও কোথাও ফুটেছে। উর্বশী প্রসঙ্গে না হলেও নারীরূপের নগ্নসৌন্দর্যের বেদীমূলে কামও যে পরাভব স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী'[৩৮] কবিতায় সে বর্ণনা আছে। শ্রীঅরবিন্দ উর্বশী রূপের পরাকাষ্ঠা স্থাপন করেছেন তাঁর 'উর্বশী' কাব্যে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, রোমান্টিক নায়িকা, বিশুদ্ধ প্রেম ও অবশেষে সম্ভবত ব্রহ্মানন্দের মূর্ত প্রতিমা রূপে অঙ্কিত করেছেন। এই হচ্ছে নারীরূপের চূড়ান্ত স্বরূপ। বিশ্বের অন্তরালবর্তী সৃষ্টিশক্তির আনন্দ প্রেরণাই নারী—উর্বশী। সুন্দরম্। 'উর্বশী হচ্ছে সৃষ্টির আনন্দ কর্মের উৎসব।'[৩৯] সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্যে তারই ক্ষণিক অনুভবকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। 'যাকে আমরা কামনা করি অথচ পাই না। আর পাই না বলেই তাকে আরো বেশি করে চাই। কর্ম করি তারই আনন্দের জন্য। কর্তব্য করে যাই তারই প্রশংসা পেতে। সার্থক হই তার প্রেমে। ধন্য হই তার প্রীতিতে।'[৪০] উর্বশী হচ্ছে সেই দর্পণ যাতে প্রকৃতি আপন রূপ দেখে, সে সেই সৌন্দর্য, শিল্প যার স্বপ্ন দেখে। উর্বশী তো নারী নয় নিখিল ভুবনের আভা, রূপ নয় স্রষ্টার মনের নিষ্কলুষ কল্পনা।[৪১] ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার পদসঞ্চার উপন্যাসে উর্বশীকে বলেছেন 'বিষ্ণুমানসী।'[৪২]

উর্বশী উপাখ্যান নিয়ে মানবমানবী প্রেমের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা হয়েছে। তার আরম্ভ যথার্থভাবে বলতে গেলে সাহিত্যযুগে কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটক থেকে হলেও তার আভাস প্রাচীনতম কাব্য ঋগ্বেদেও দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্যে এবং পৌরাণিক সাহিত্যেও তার ইঙ্গিত কিছু আছে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক কেননা কাহিনীগুলির উপ-

---

৩৮। বিজয়িনী—চিত্রা-র, ৪র্থ খণ্ড

৩৯। উর্বশী নিরুদ্দেশ—মন্মথরায় শনিবারের চিঠি শারদীয়া ১৯৫৩ পৃঃ ৪৯

৪০। তদেব।

৪১। উর্বশী—রামধারী সিংহ 'দিনকর' দ্বিতীয় অঙ্ক

৪২। পদসঞ্চার—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্থাপনের মধ্য দিয়ে পাঠক সে সম্পর্কে বুঝে নিতে পারবেন। শুধু পূর্বে ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদের প্রেমাভাষ পুনরুপস্থাপন করছি। মানুষ যাকে ভালবাসে সে দেহী মানব বা মানবী নয় সে এক দিব্য চেতনা মর্ত্যমানবের বাহু বন্ধন থেকে সে দূরে চলে যায়। উর্বশী তাই পুরূরবার কাতর অনুরোধে জানিয়েছে—'দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি'—আমি দূর অপ্রাপনীয়া বায়ুর মতো আমাকে পাবে না, তুমি ঘরে চলে যাও। কিন্তু 'পিয়া বিনা ঘরে শুনা' সে শূন্য গৃহে কে বাস করতে পারে? মৃত্যুই তার কাছে শ্লাঘ্য। অথচ তৃষ্ণা জেগে রয়/, সেই অতৃপ্ত প্রেম তৃষ্ণায় পুরূরবার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—ফিরে এসো, উর্বশী ফিরে এসো আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে—

'তিষ্ঠাগ্নিবর্তস্য হৃদয়ং তপ্যতে মে'।

কালিদাসের নাটকে দেখা যাবে মিলনে নয় বিরহেই প্রেমের চূড়ান্ত প্রশস্তি। কেননা মিলনে ত প্রিয়া একা কিন্তু বিরহে সে ত্রিভুবনময়—'সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনময়ী তন্ময়ং বিরহে।' রক্তমাংসের দেহী সত্তা আমাদের হৃদয় কুট্টিমে জাগিয়ে তোলে সেই অমৃতানুভব প্রেম কিন্তু তাই বলে সসীম দেহের মধ্যে তাকে খোঁজা বৃথা কেন না সে সেখানে নাই।

আসলে প্রেম সৃষ্টির অন্তরালবর্তী আনন্দময় ব্রহ্মের অনুভব যা ব্যক্তি চিত্তের সম্বিতানন্দে অনুভূত হয়। আমরা বুঝি না বলে অনির্বচনীয়কে খুঁজি বচনে, সেই অরূপকে খুঁজি রূপে, সেই অসীমকে খুঁজি সীমার মধ্যে। এই খোঁজার মধ্যে সকল শিল্পের সৃষ্টি প্রেরণা। শ্রীঅরবিন্দ তাই তার ইংরেজি উর্বশী কাব্যে বোধহয় এই ব্রহ্মানন্দকেই প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপে আভাষিত করেছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস শুদ্ধ প্রেমের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন—

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান

সৃষ্টির পশ্চাদ্বর্তী যে মূল প্রেরণা তার প্রধান বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ হচ্ছে আনন্দ। এই আনন্দের প্রকাশ দ্বিবিধ—সৌন্দর্য আর প্রেম। প্রকৃতির মধ্য দিয়া তা মানব মনে সৌন্দর্য রূপে উদ্ভাসিত হয় আর মানুষের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে প্রেম রূপে। বন্ধুর প্রতি, সন্তানের প্রতি, প্রিয় প্রিয়ার প্রতি

যে ভালোবাসা তার মধ্যে এই প্রেমের আংশিক প্রকাশ ঘটে। এই প্রেমের সৃষ্টি ব্যক্তি রূপকে আশ্রয় করে সত্য কিন্তু যখন তা বিশিষ্ট ব্যক্তি আশ্রয় অতিক্রম করে সর্বজনীন বোধে উত্তীর্ণ হয় তখনই কেবল এই বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদ পাওয়া যায়। উপলব্ধির গভীরতায় এর দ্বৈত ভিত্তি বিলুপ্ত হয়ে এক অখণ্ড আনন্দ চৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়। রায়রামানন্দ তাই বলেছেন—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যে পুরূরবা যখন সংসার সীমা ছাড়িয়ে কামনা বাসনার আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ আত্মা হলেন তখনি তিনি লাভ করলেন শাশ্বত উর্বশী প্রেম।

But thou, O Ila's son, take up thy joy
For thee in sweet Gundhurva world eternal
Rapture and clasp unloosed of Urvasie
Till the long night when God asleep shall fall.
Urvasie, canto IV lines 300-304

উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যানের আর একটি তাৎপর্য ছিল রমণী প্রেমের বেদনার্ত সীমা। সে চির প্রিয়া হয়ে থাকতে পারে না তাকে জননী হতে হয়। জননীত্ব প্রাপ্তিতে অবসান ঘটে প্রেয়সী স্বরূপের। পুত্রমুখ দেখলে মর্ত্য বন্ধন থেকে উর্বশীর মুক্তি—কালিদাসের কাব্যের এই বিবরণে নিহিত ছিল এই তাৎপর্যের সম্ভাবনা। রামধারী সিংহ দিনকর তাঁর কাব্য নাট্য উর্বশীতে এই তাৎপর্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। উর্বশী সেখানে সখেদে বলেছেন—পুত্র ঔর পতি নহী পুত্র ইয়া কেবল পতি পায়োগী/ইয়ে বিকল্প দারুণ, দুরন্ত, দুস্সহ হ্যায়।

সংক্ষেপ সূচী

অ—অথর্ববেদ
আ—আরণ্যক
উ—উপনিষদ
ঋ—ঋগ্বেদ
ঐ, আ—ঐতরেয়, আরণ্যক
ঐ, ব্রা—ঐতরেয়, ব্রাহ্মণ
ক—কল্পসূত্র
কা, শ্রৌ—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র
গৃ—গৃহ্য সূত্র
গো—গোপথ ব্রাহ্মণ
গো, গৃ—গোভিল গৃহ্য সূত্র
জৈ, ব্রা—জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ
ছা, উ—ছান্দোগ্য উপনিষদ
তু—তুলনীয়
দ্র :—দ্রষ্টব্য
নি—নিরুক্ত
প—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ
পদ্ম—পদ্ম পুরাণ
পা—পাদটীকা
পৃঃ—পৃষ্ঠা
বায়ু—বায়ুপুরাণ
বৃ, উ—বৃহদারণ্যক উপনিষদ
বৃঃ দে—বৃহদ্দেবতা
বৌ, শ্রৌ—বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র
ভা—ভাগবত পুরাণ
মৎস্য—মৎস্য পুরাণ
মহা—মহাভারত
শু, য—শুক্ল যজুর্বেদ
রা, র—রামেন্দ্রসুন্দর রচনাবলী
শ, ব্রা, / শত—শতপথ ব্রাহ্মণ
সং—সংস্করণ
G, B—Golden Bough
pp/p—Pages

শুদ্ধিপত্র

১৯ পৃষ্ঠার ২৭ নং পাদটীকায় পর পৃষ্ঠার ৩০ নং পাদটীকার উল্লেখটুকু বসবে।

২০ „ ৩০ „ পূর্ব „ ২৭ „ „ „

২৯ „ ২৪ „ ঋক উদ্ধারে ভুল আছে স্ত্য (স্থ্য নয়)

বৃধে (বৃত্বে নয়) অয (অর্থ : নয়)

৪৫ „ ১০৩ নং পাদটীকায়—মহীধরভাষ্য, তদেব। বসবে

৪৬ „ ১০৪ „ পূর্বপৃষ্ঠার ১০৩ এ মুদ্রিত উল্লেখ বসবে

৪৭ „ ১০৫ „ „ ১০৪ „ „ „

„ „ ১০৬ „ „ ১০৫ নং „ „ „

„ „ ১০৬ „ জায়গায় ১০৭ বসবে

„ „ ১০৭ „ পাদটীকা অপ্রয়োজনীয়

৬২ „ ৩য় ছত্রের শেষে ৩৮ বসবে না

„ „ ৮ম „ „ ৩৯ স্থানে ৩৮ বসবে

„ „ ১৩ „ „ ৩৯ বসবে